তৃতীয় অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ

তৃতীয় অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ

আধুনিক সাহিত্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প হল – ছোটগল্প। এই সাহিত্য প্রকরণটি অনেক বেশী জীবন সম্পৃক্ত তথা জীবনের স্বভাব-জাত। অর্থাৎ এতে বাস্তব মানুষ ও মাটির গন্ধ আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। তাই 'ছোটগল্প'কে বলা হয় – 'Most Natural Form'। জীবনের স্বভাবের মধ্যে আছে সুরের বিচিত্রতা, আছে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি। স্থাবরতা-অস্থাবরতা, স্থায়িত্ব-পরিবর্তনশীলতা, চিরন্তনতা-সাময়িকতা, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ সমস্ত কিছুর সমষ্টি হল এই মানবজীবন। সেই জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি লেখকের লেখনী কৌশলে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ছোটগল্পে; অবশ্যই তা দেশ-কাল-সময়ের প্রেক্ষাপটে। অর্থাৎ যে মননকে উপলব্ধি করতে হয় মননের দ্বারা সেই মননের গহন-গভীরে সাময়িকভাবে সৃষ্টি হওয়া অনুভূতিগুলির আলো-আঁধারী খেলা এবং তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েনের স্পষ্ট ও স্থায়ী রূপ প্রতিফলিত হয় এক একটি ছোটগল্পে। তাই এক একটি ছোটগল্প যেন এক একটি অনুভূতি ও ভাবের আধার। এই মানব-অনুভূতি, অভিজ্ঞতাকে ছোটগল্পে প্রস্ফুটিত করার বিষয়টি লেখকের ব্যক্তিত্ব, জীবনবোধ ও জীবনকে দেখার বিশেষ ভঙ্গির উপর নির্ভর করে। আর লেখকের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূলে কাজ করে সমাজজীবন ও সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোষ্টমাস্টার'-এ এক বিশেষ অনুভূতির স্ফুরণ ঘটে। অপরদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ'-এ প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা; আবার সুবোধ ঘোষের 'ফসিল'-এ শ্রেণী দ্বন্দ্বের আলোড়ন, সেই সঙ্গে বিমল করের 'আত্মজা'-তে মানসিক রোগের বিকৃত প্রতিক্রিয়া। কাজেই বলা যায়, কবিগুরুর হাতে একদিন যে বাংলা ছোটগল্পের জন্ম হয়েছিল সময়-কাল-পরিস্থিতির স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে নিজের রূপ, আঙ্গিক, ভাব-এর অনেকটা পরিবর্তন করেছে এবং আজও করে চলেছে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী সময়পর্ব থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত বাঙালীর সমাজজীবনে কতগুলি বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে; যথা - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা-পরবর্তী কমিউনিষ্ট আন্দোলন এবং নক্‌শাল আন্দোলন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফল বাঙালীর জীবনকাঠামো-এর পরিবর্তন আনে। পরিবর্তিত হয় জীবনবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসা।

সময়কালীন পরিস্থিতির কষাঘাতের বৈপরীত্যে অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের ফলে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিমূল আলোড়িত এবং ক্রমশ অবনমিত হতে থাকে, যার প্রভাবে একটি রোগ মহামারীর আকার নেয়, তা হল মানসিক রোগ। যে রোগের প্রতিক্রিয়া আরও বেশী বিকৃত ও আরও বেশী ভয়াবহ। যেহেতু ছোটগল্প হল সর্বাপেক্ষা জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প তথা মাধ্যম, সেহেতু এই পরিবর্তমান জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপ খুব স্বাভাবিক ভাবে তাতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কাজেই জীবন চলমানতার এই ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়ার প্রকৃতি ছোটগল্পের ভাবনা, রূপ-নির্মিতি, বিষয়-আঙ্গিকেরও পটপরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। তাই এই কয়েক দশকের ছোটগল্পে, গল্পহীন গল্প লেখার প্রবণতা, কাব্যময়তা - সাংকেতিকতা, মানসিক অসুখের বিচিত্র রূপ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিশেষ রীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

জীবন জিজ্ঞাসার এই জটিলপর্বেই কথা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫ খ্রীঃ) সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। চল্লিশের দশকের সূচনাপর্ব থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা অক্ষুন্ন ছিল। এই বিস্তৃত সময়পর্বে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা সাহিত্যের জগতে স্বমহিমায় এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অভিজ্ঞতালব্ধ চেনা জগতের চেনা মানুষগুলির সাধারণ জীবনযাত্রা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল উপাদান ছিল। যেহেতু এই চেনা গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত নানা বিত্তের ও বৃত্তির মানুষগুলির জীবনযাত্রা, মানসিকতা ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু তাদের জীবন সম্পৃক্ত সম্পর্কের রসায়নও যে পৃথক পৃথক হবে তা খুব স্বাভাবিক। এই সাধারণ মানুষগুলির আপাত দৃশ্য নিস্তরঙ্গ জীবনের বহুমাত্রিক সম্পর্কের ওঠা-পড়া, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাওয়া-না পাওয়ার যন্ত্রণাকে লেখক তাঁর কলমের সাহায্যে নিখুঁত ভাবে তুলেছেন।

জন্মের শুভক্ষণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার জীবনকে চালিত করে। এই সম্পর্কগুলির কিছু সম্পর্ককে সমাজ অনুমোদন করে, আবার কিছু কিছু সম্পর্কে অনুমোদন করে না। তবে সম্পর্ককে অনুমোদিত করা বা না-করা বিষয়টি নির্ভর করে বিশেষ সময়কালের প্রেক্ষাপটের উপর। সমাজ একটি চলমান সত্তা। কাজেই পরিবর্তনশীল ব্যবস্থার সাপেক্ষেই অনুমোদনযুক্ত ও অনুমোদনহীন সম্পর্কের শ্রেণীকরণ নির্ভর করে থাকে। কাজেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সময়কালে যে সম্পর্কগুলি অনুমোদনযুক্ত বা অনুমোদনহীন – যাই হোক না কেন, আজকের একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তা পরিবর্তনশীল। তাই যখন আমরা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের সম্পর্কের সমীকরণকে বিশ্লেষণ করব তখন তাঁর

সমকালীন প্রেক্ষাপটেই ফিরে যেতে হবে। তবে সমাজ স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির সামগ্রিক অংশ নিয়েই নর-নারীর সম্পর্ক। জীবন চলার পথে মানুষ সম্পর্কের বহুরূপতাকেই পাথেয় করে এগিয়ে চলে। কখনো প্রয়োজনের তাগিদে কখনো শুধুমাত্র মনের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে। যার প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন লেখকের ছোটগল্পে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে নর-নারীর সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন দিক। যার চমক পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে এবং নবনব রসে সিক্ত করে। তাঁর বিপুল সাহিত্য সম্ভারের সমস্ত অংশকে এই ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই যে সম্পর্কগুলি গতানুগতিকতাকে ছাড়িয়ে একটু অন্যমাত্রা লাভ করেছে, যে সম্পর্কগুলি অনেক বেশী দ্বন্দ্ব-জটিলতার গিঁটে আবদ্ধ, যার উত্থান-পতন বৈচিত্র্যময় দিকের সন্ধান দেয়, আবার হয়তো বা অন্তরালে বলা বা না-বলা সম্পর্কের যে রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার বাস্তবতা ও পরিণতি পাঠককুলকে ভাবায় এবং প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করায় সেই সমস্ত সম্পর্কের রূপরেখা সম্পন্ন গল্পগুলিকে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সম্পর্কের সমীকরণ বিশ্লেষণে ঠিক সেভাবে শ্রেণীকরণ করা সম্ভব নয়, তবে আলোচনার সুবিধার্থে গল্পগুলিকে কয়েকটি গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এইভাবে –

ক) দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের উত্থান-পতন

খ) বিবাহ পূর্ববর্তী জীবনে সম্পর্কের সমীকরণ

গ) বৈধব্য জীবনে সম্পর্কের আবর্তমানতা

ঘ) অন্যান্য সম্পর্কের রূপরেখা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত গল্পমালা - ১ থেকে গল্পমালা - ৭ পর্যন্ত মোট গল্পের সংখ্যা ৩৫০টি; প্রতিটি গল্পমালায় ৫০টি করে গল্প আছে। তার মধ্যে ৮৪ টি গল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে আলোচনার জন্য। এই গল্পগুলির মধ্যে ক) দাম্পত্য সম্পর্ক উঠে এসেছে যে গল্পগুলিতে তা প্রথম প্রকাশের সাল অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজালে এমন হয় – যৌথ, শম্বুক, প্রতিদ্বন্দ্বী, মদনভস্ম, রোগ, চোর, স্বঘাত, সেতার, পুনশ্চ, কুলপী বরফ, চোরাবালি, দ্বিরাগমন.... ইত্যাদি।

খ) বিবাহপূর্ববর্তী সম্পর্ক যে গল্পগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলি হল - মালঞ্চ, ক্রোড়পত্র, চেক, অসবর্ণা, টর্চ, অমনোনীতা, শুল্ক, সুদর্শন চৌধুরী, দয়িতা, চা, ছদ্মনাম.... ইত্যাদি।

গ) বৈধব্যজীবনের ছায়া আছে এই গল্পগুলিতে যথা - মহাশ্বেতা, পুনর্ভবা, যবনিকা, উত্তরণ..... ইত্যাদি।

ঘ) অন্যান্য সম্পর্কগুলি যে গল্পে প্রস্ফুটিত হয়েছে সেগুলি হল - কুমারসম্ভব, উল্টোরথ, অপরাহ্ন, দোলা, আগামীকাল, একটি ফুল ঘিরে, মিসেস রায়, এই প্রথম, রসভাস, রক্ষাকবচ, দুর্বল মুহূর্ত .... ইত্যাদি। প্রথম প্রকাশিত সালের ক্রমানুসারে গল্পগুলি একে একে আলোচনার মাধ্যমে নর-নারীর সম্পর্কের বৈচিত্র্য কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা অন্বেষণ করা হল।

ক) দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের উত্থান-পতন

দাম্পত্য সম্পর্ক সমাজ স্বীকৃত একটি প্রধান ও গভীর সম্পর্ক। যে সম্পর্কে দুটি নর-নারী পরস্পর একত্রে বাস করার অনুমতি পায়, সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়ে বংশ পরম্পরা ধরে রাখে। স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে, গোটা জীবন সমস্তরকম পরিস্থিতিতে একসঙ্গে থাকার এবং উভয়ের পরিপূরক হয়ে থাকবার প্রতিশ্রুতি নেয়। অর্থাৎ এক কথায় জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী হওয়ার অনুমোদন করে থাকে সমাজ এই সম্পর্কের মাধ্যমে। সেই সঙ্গে দুজনের শারীরিক মিলনকে স্বীকৃতি দেয় এই সম্পর্ক। ফলস্বরূপ দুটি মানব-মানবীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি স্বত্ত্ববোধ তথা অধিকার বোধ জন্ম নেয়। গন্ডিবদ্ধ এই সম্পর্কের অভ্যন্তরে সুখ দুঃখের ঢেউ জীবনকে প্লাবিত করে। তাতে কখনো দুটি মনের মধ্যে আনে নীরব মানসিক দূরত্ব। আবার কখনো বা তারা ফিরে পায় তাদের ভালোবাসার হারানো সুর। কেউ বা নিজ আশ্রয়, নিরাপত্তা প্রয়োজনের তাগিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে যায়; কেউ বা সেই সম্পর্ককে ছিন্ন করার সাহস দেখায়। আবার কখনো ছিন্ন করা সম্পর্কের গুরুত্ব, সত্যতা উপলব্ধি করে অনুশোচনা করে থাকে। ফলে এই সম্পর্ক বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করে। অনেক সময় সেই সম্পর্কের জটিলতাকে বুঝে ওঠা যায় না। অর্থাৎ সমাজ দুটি পরিবেশের ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন বংশ পরম্পরার নর-নারীকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে একত্রে থাকবার অনুমতি দিলেও দুটি মানুষের মন মানসিকতা গোটা জীবনকে পরিচালিত করে। সেখানেই তৈরী হয় সম্পর্কের জটিলতা। আমরা এই অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই সম্পর্কিত গল্পগুলি বিশ্লেষণ করে সেই জটিলতার নানা অধ্যায়গুলি স্পষ্ট করে তুলব।

দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের জটিলতা তৈরী হয়েছে এরূপ গল্প হল **"যৌথ"**। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যৌথ' গল্পটি ১৩৪৯ বঙ্গব্দের ২৯শে পৌষ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটিকে দাম্পত্য জীবনের গল্প হিসাবে বেছে নিলেও এখানে মূলত দাম্পত্য বলয়ের বাইরে যৌথ পরিবারের অন্তর্গত দেওরের সঙ্গে দাদা-বৌদির পারস্পরিক ত্রিপক্ষ সম্পর্কের রূপরেখাটি পরিস্ফুট হয়েছে।

গল্পের কাহিনীতে দেখা যায়, অনুরূপ ও মল্লিকা দুজন স্বামী-স্ত্রী। তিন সন্তান ও দেওর স্বরূপকে নিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ভাবে বয়ে চলছিল। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা তাদের সেই স্বাভাবিকতার ধারায় পরিবর্তনের সূচনা করে; সেই সঙ্গে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের গতিমুখের বদল আনে। অনুরূপের অসুস্থ বড়ছেলের জন্য নারকেল গাছ থেকে ডাব পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে স্বরূপ পড়ে যায়। তার ফলস্বরূপ একটা সময় দুটো পা-কেই কেটে বাদ দিতে হয় স্বরূপের। নিজের ছেলের জন্য ভাইয়ের এই দুর্দশায় অনুরূপ কম অনুশোচনা করেনি। সংসারের দায়-দায়িত্ব অর্পণ, সাংসারিক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে ভাইয়ের উপরেই নির্ভর করেছে অনুরূপ। এমনকি, স্ত্রী-পুত্রকেও স্বরূপের কাছে সঁপে দিয়ে শারীরিক অক্ষমতাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। তাই স্ত্রী মল্লিকার প্রতি অনুরূপকে বলতে শোনা যায় –"আহা, আমাকে তোমার দেখতে হবে না। আমার হাত-পা আছে; নিজেরটা আমি নিজেই করে নিতে পারি। ওকে তুমি একটু দেখ। ওকে একটু ফূর্তিতেই রাখতে চেষ্টা কর।"[১] শুধুমাত্র সঙ্গদান নয়, প্রতিবন্ধী ভাইয়ের বিয়ে দেবার জন্যও অনুরূপ বহু চেষ্টা করেছে।

স্বরূপ সৌন্দর্যের পিয়াসী। যৌবনের দূত। আপন মনের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যকে একটু একটু করে সে মরা কাঠের বুকে খোদাই করে জীবন্ত রূপ দান করে। নিজ কল্পনাশক্তি ও শিল্পবোধের মাধ্যমে সে তার যৌবনকে ধরে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, বৌদি মল্লিকার জীবন-যৌবনের লাবণ্যও তাকে আকৃষ্ট করে। সেই যৌবনের সৌন্দর্য্যকে মনের কোণে সে আজীবন স্থায়ী করে রাখতে চায়; তাই বৌদি একদিন প্রশ্ন করেছিল - "আমার বয়স তুমি জোর করেই কমিয়ে রাখবে নাকি ভেবেছ ?"[২] উত্তরে স্বরূপ বলেছিল –"হ্যাঁ জোর করেই তো রাখব।"[৩] মল্লিকা স্বরূপের এইরূপ ব্যবহারে বাইরে বিরক্ত বোধের ভাব দেখাত, কিন্তু মনে মনে এই বিষয়টি সে উপভোগ করত। স্বরূপের ব্যবহারে কোথাও যেন একটু মোহ আছে। আসলে দেওরের শারীরিক অক্ষমতাকে ভোলাতে নয় এই মোহের টানেই সে স্বরূপকে সঙ্গ দিত। হাসি-ঠাট্টার আড়ালে স্বরূপের মুগ্ধ দৃষ্টিটুকুই মল্লিকার মনকে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত মধুরতা ও স্নিগ্ধতায় আবিষ্ট করত। মল্লিকা যেন স্বরূপের দৃষ্টিতে প্রতিদিন নতুনভাবে, নতুনরূপে বেঁচে উঠত। স্বরূপের এই মোহ দৃষ্টিই মল্লিকার দেহের রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে। স্বরূপ ও মল্লিকার যে বাহ্যিক সম্পর্ক – দেওর ও বৌদির সম্পর্ক – তা আদিকাল থেকে বাঙালী জীবনে বয়ে চলছে। 'রামায়ণ'-এ সীতা ও লক্ষ্মণের মধ্যে সেই সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ছিল। কিন্তু আলোচ্য গল্পে সেই স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করেছে। এই সম্পর্ককে

যেমন ঠিক ভালোবাসা অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক বলা যায় না, ঠিক তেমনি তথাকথিত সামাজিক ভাষায় 'কলুষিত সম্পর্ক'-এর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আসলে এই সম্পর্ক একজন পুরুষের প্রতি একজন নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ। একটি সৌন্দর্য্য পিয়াসী রূপমুগ্ধ আত্মার রূপের প্রতি, যৌবনাত্মার প্রতি স্বাভাবিক টান। যেখানে শারীরিক স্পর্শ ও মিলন নয়, শুধুমাত্র রূপ-সৌন্দর্য্যের সঙ্গলাভ ও তাকে দর্শনের মাধ্যমে আপন মনের কোণে স্থায়ী করার বাসনাই প্রধান হয়ে ওঠে।

আসলে স্বরূপ মনে করে – কোন নারী-জীবন যে সৌন্দর্য্যের আধার তা শুধুমাত্র স্বরূপের জন্যই প্রস্ফুটিত ও বিকাশ লাভ করবে, যাকে সে সম্পূর্ণরূপে নিজের বলে অর্জন করবে। তা কখনো বৌদি মল্লিকার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই তার সঙ্গদান স্বরূপের মনে সাময়িকভাবে আনন্দ দান করলেও তৃপ্তি আনতে পারেনি। তাই বৌদিকে সে বার বার দাদার কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছে। এই একটা অভাববোধ তার জীবনে ছিল। সেই অভাববোধের পরিধি ক্রমশ বাড়তে থাকে যখন সময়ের তালে তালে দাদা-বৌদি অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কর্তব্যবোধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের সেই আগের মত অনুশোচনাবোধ লীন হতে থাকে এবং বিষয়ীবোধ সম্পন্ন দাদা অনেক বেশি হিসাবী হয়ে ওঠে। চার সন্তানের মা মল্লিকাও আরও খিট্‌খিটে স্বভাবের হতে থাকে। তখন স্বরূপের মনে হয় জীবনের-সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মল্লিকাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কেবল স্বরূপ রয়ে গেছে একই জায়গায়; সে পঙ্গু, সে চলাফেরা করতে পারে না। কেবল তার জীবনেই কোন অভিজ্ঞতার ছাপ নেই। এই বিষয়টি তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বরূপের পঙ্গু হওয়ার সাত বছর পরের একটি কথোপকথনকে কেন্দ্র করে দাদার বলে যাওয়া কথায়। জলচৌকির চারিধার দিয়ে নক্সা তোলার কাজ না হয়ে ওঠায় বিরক্ত হয়ে অনুরূপ বলেছিল – "এতক্ষণ কি করছিস বসে বসে ? কাজ নেই, কর্ম নেই, কেবল গল্প আর গল্প!"[৪] স্বরূপ আর ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারেনি; উত্তরে বলেছিল –"কাজ না করে কি মাগনা খাই তোমার সংসারে ? নিজের কাছেই নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি। কাজ আমি করি, না করি না ? খুব খাটিয়ে নিয়েছ আর কেন ? এত আমি করব কার জন্য ? কে আছে আমার সংসারে ?"[৫] এই উক্তির মাধ্যমে বোঝা যায় পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে স্বরূপ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তাই একাকীত্বের যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করেছে। সেই জায়গা থেকেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে –"ভূ-ভারতে খুঁজে অন্ধ, খঞ্জ,বোবা, বধির যেমনই হোক একটি মেয়েও কি পাওয়া গেল না স্বরূপের জন্য ? আর কিছু না হোক শুধু একটি মেয়ে ?.... স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সম্পূর্ণ

আপন একটি সংসারের জন্য স্বরূপের মন হাহাকার করে ওঠে।"[৬] অর্থাৎ একটি নারী ও একটি পুরুষ একত্রে থেকে যে জগৎ গড়ে তোলে স্বরূপ পঙ্গু হলেও সেই জগতের স্বপ্ন দেখে আর তাই প্রতিবন্ধী কোন নারীকে গ্রহণ করেও সে সেই জগৎকে গড়ে তুলতে চায়। এখন সে একটি পঙ্গু নারীকেই চায়, যে তার পঙ্গু জীবনের সঙ্গে পা মেলাতে পারবে।

এই অভাব বোধ-ই তার মনে ক্রোধের সঞ্চার করে। এতদিনে তার মনে হয় – অনুরূপ-মল্লিকা ইচ্ছা করেই তাকে ঠকিয়েছে। কেবল সোহাগ আদর করে ভুলিয়ে রেখেছে, পাছে স্বরূপের নিজের সন্তান এসে সম্পত্তির অংশীদার হয়। তাই স্বরূপ ও দাদার মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি হয় তখন মল্লিকা বিষয়টি লঘু করতে ঠাট্টা করায় স্বরূপের চোখে আর ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যেন ঝলসে ওঠে; সে দৃষ্টি যেন বলে দেয় – "মল্লিকা কি ভেবেছে এমন ছদ্ম সোহাগে আজীবন তাকে ভুলিয়ে রাখবে ? নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য চিরকাল তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে ? মল্লিকা কি ভুলে গেছে সে চার সন্তানের মা ?"[৭] স্বরূপের এই অবজ্ঞার দৃষ্টি মল্লিকা সহ্য করতে পারে নি। তার আজ অনেকদিন পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল তার চেহারা কতটা ভেঙে গিয়েছে। কিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এতদিন যেন তা ধরাই পড়েনি। অপরদিকে স্বরূপের এরূপ ব্যবহার অনুরূপকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বহুদিন পর সে যখন নক্সা তোলার কাজে নিযুক্ত হল তখন উপলব্ধি করল এইসব কাজে ভাই স্বরূপের তুলনায় সে অনেক পিছনে। এই কাজে সে ব্যর্থ। অথচ ভাইয়ের কাজের সুখ্যাতি একদিন তার গর্ব ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে সেই সুখ্যাতি গৌরব শুধুমাত্র স্বরূপের, তাতে অনুরূপের অংশ নেই। অথচ সেই কাজের সুযোগ করে দিয়েছে অনুরূপ, কেননা, স্বরূপ শুধু নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে কাজ করে আর অনুরূপ বাইরে বাইরে ঘুরে কাজের উপকরণ জোগাড় করে। স্বরূপ যেন তার যৌবনকে এতটুকু হারাতে দেয়নি, অথচ অনুরূপের যৌবন বলে কিছু নেই, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, আছে শুধু অতীত। এই ব্যর্থতা অনুরূপের মনে নিজের প্রতি ক্ষোভ ও স্বরূপের প্রতি ঈর্ষা বোধ জাগ্রত করে। অন্যদিকে মল্লিকা ও তার স্বামী অনুরূপের মধ্যে যে মানসিক দূরত্ব তৈরী হয়েছিল তার প্রকাশ পায় নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাওয়ার জন্য একটি শাড়ি পরাকে কেন্দ্র করে। অনুরূপ মল্লিকাকে দামী শাড়িটি পরে যেতে বলে, কেননা, তাতে তার মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে। এই বিষয়টিকে মল্লিকার মনে হয় স্বরূপ হলে হয়ত এমনভাবে ভাবত না। এখানেই বিষয়ীসত্তার সঙ্গে শিল্পীসত্তার স্বাভাবিক তুলনাটি মল্লিকার মনে জেগে উঠেছিল। আলোচ্য গল্পে এই ভাবেই তিনটি চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্কের টানাপোড়েন উঠে আসে। স্বরূপ ও অনুরূপের যৌথ সত্তার দ্বারা যেন মল্লিকার জীবন ও মনন

পরিপূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ স্বরূপের জীবন-দর্শন মল্লিকার যৌবনকে চিহ্নিত করে প্রস্ফুটিত করে। অপরদিকে অনুরূপের দৃষ্টি মল্লিকার বাকী জীবন অর্থাৎ প্রৌঢ় জীবনকে অঙ্কন করে তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় মল্লিকার জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। তাই হয়ত গল্পের শেষে দেখা যায়, স্বরূপের অসমাপ্ত মূর্তিকে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে অনুরূপ বলে ওঠে – "দাঁড়াও এইখানে – বাকীটা তো আমাকেই শেষ করতে হবে।"[৮]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র **'শম্বুক'** ও **'বেহালা'** দুটি গল্পেই একজন শিল্পী চরিত্র আছে। তাদের দাম্পত্য জীবনের রূপরেখা গল্পে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তাই আলোচনার সুবিধার্থে এই গল্প দুটিকে পাশাপাশি রেখে আমরা বিশ্লেষণ করব। 'শম্বুক' গল্প ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় এবং 'বেহালা' গল্প ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দুটি গল্পই 'গল্পমালা - ৬' এ স্থানলাভ করেছে।

প্রথমে আসা যাক 'শম্বুক' গল্পে। 'শম্বুক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল - শামুক। এটি একটি প্রাণী। যার দেহের বেশিরভাগ অংশই খোলসে আবৃত। দেখা যাক, গল্পকার আলোচ্য গল্পের নামকরণ ঠিক কোন্ প্রতীকে ব্যবহার করেছেন। গল্পে পাওয়া যায় – সুপ্রিয়া ও নীলাম্বর স্বামী-স্ত্রী। তারা দীর্ঘ সাত-আট বছর বিবাহিত জীবনকে অতিবাহিত করলেও তাদের মধ্যে আত্মিক যোগসূত্র গভীরতা লাভ করেনি। বরং সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যেকার মানসিক দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেউ কাউকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি, বিশেষত, স্বামী নীলাম্বর স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব দেয়নি। তাদের সম্পর্কের প্রতিরূপ যেন উদ্ভাসিত হয়েছে কাহিনীর শুরুতে উল্লেখিত দ্বিখণ্ডিত গ্রামের অবস্থান চিত্রণের মধ্য দিয়ে। যেখানে দেখা যায় 'রূপগঞ্জ' নামের শহরটির মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ায় শহরটি দুদিকে দুই টুকরো হয়ে রয়েছে। যা দেখে গল্পের নায়িকা সুপ্রিয়ার মনেও প্রশ্ন জেগেছিল সত্যিই নদী একে ভেঙেছে, না কি, এমন টুকরো টুকরো ভাবেই এদের জন্ম। আসলে এই টুকরো গ্রাম যেন তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের রূপক হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হলেও তাদের দুটি মন দু'প্রান্তে পড়ে আছে।

গল্পে দেখা যায় – স্বামী নীলাম্বর অফিসের একজন কর্মচারী হলেও সে শিল্পী। নিজ সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সে পৃথিবীতে নতুন পরিচয়ে বাঁচতে চায়। নিজের শিল্পীসত্তাকে বিকশিত করতে চায়। এই বিষয়টিই তার কাছে মুখ্য। অপরদিকে স্ত্রী সুপ্রিয়া সপ্তাহের বাকী দিনগুলির

গতানুগতিকতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলেও রবিবার ছুটির দিন, এই দিনটিতে সে স্বামীর কাছ থেকে মানসিক তথা শারীরিক সাহচর্য চায়। কিন্তু দেখা যায় – সেদিনও নীলাম্বর সকাল থেকেই লিখতে বসে, কেবল লেখে এবং ছেঁড়ে। সুপ্রিয়া সংসারের কাজকর্ম সারে, মাসিকের পাতা ওল্টায়, দৈনন্দিন সান্ধ্য প্রসাধন সারে কিন্তু তাতেও তার যেন সময় যেতে চায় না। আসলে একাকীত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ হলেও প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। আবার বলা যায়, সে হয়তো জানে স্বামীর কাছে তার এই মনের বেদনা প্রকাশ করলেও নীলাম্বর তাতে কোন গুরুত্ব দেবে না। তাই সে নীরব থাকে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরেও নীলাম্বরের সেই একই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে সুপ্রিয়া কাছে গিয়ে অনুনয় করে বলে –"এই যাও এখন ঘুরে এস একটু নদীর পার দিয়ে, এত যদি কাটছ তবে লিখছ কি, সব সময়েই কি লেখা যায় ?"[৯] স্ত্রীর এই কথার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নীলাম্বর বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, তার সমস্ত মুখে পশুর হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক সুপ্রিয়ার গলার ব্যঙ্গাত্মক সুর অনুকরণ করে বলে –"এই যাও বীরেনবাবুর বাসা থেকে একটু ঘুরে এস না, সব সময়েই কি এখানে আসতে হয় ?"[১০] স্বামীর এমন আচরণে স্ত্রীর মনে তীব্র অভিমান পুঞ্জিভূত হয়। এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই অভিমান এক সময় প্রবল ক্রোধে সঞ্চারিত হয়। তাই প্রায় মধ্য রাত্রে নীলাম্বর যখন উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে সুপ্রিয়ার কাছে এসে তার খোঁপায় হাত বুলোতে বুলোতে তাকে একটা গান গাওয়ার আবেদন জানায় তখন সুপ্রিয়া তার মনের ক্ষোভকে আর চেপে রাখতে পারেনি। সে তীক্ষ্ণ হেসে জানতে চায় –"ভালো হয়েছে বুঝি লেখাটা ?..... আমাকে গান গাইতে বলছ যে। তোমার কলম দিয়ে যখন ভালো লেখা ঝরবে আমার গলা দিয়ে তখন সুর ঝরবে না কেন ? তোমার মন যখন গুনগুন করছে আমার মনেরও তখন গুনগুন করাই তো উচিৎ।"[১১] নিস্পৃহ উৎসাহহীন সুপ্রিয়ার স্বরে ও তার এই একটা খোঁচায় ক্রুদ্ধ নীলাম্বর দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দেয় –"কিন্তু ঔচিত্য বড় কঠিন, বড় নীরস কিনা তাই ওদিক আমরা বড় ঘেঁষতে চাই না। আমার মন যখন গুনগুন করে তোমার তখন হুল ফোটাবার দিকে মন যায়। দুজনে মিলে আমরা একটি মৌমাছি।"[১২] এই একটি জায়গায় এসে তাদের প্রাণহীন সম্পর্কের কঙ্কাল যেন জেগে ওঠে। স্বামীর এই যুক্তিতে সুপ্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মনের ভাব এই ভাবে ধরা দেয় –"লেখক হলেই কি অভদ্র হতে হবে, স্বামী হলেই কি ইতর হতে হবে ? আর এমন শুধু আজই যে প্রথম তা তো নয়, এমন প্রায় প্রত্যেক দিন। সুপ্রিয়ার যেন আলাদা কোন জীবন নেই, অস্তিত্ব নেই, নেই তার নিজের ভালোলাগা-না-লাগা। সে শুধু নীলাম্বরের মনের ভিন্ন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নীলাম্বর অন্তত: তাই চায়।

যখন ভালো লাগে নীলাম্বরের, ভালো কোনও আইডিয়া আসে মাথায়, তখন নীলাম্বরের উচ্ছ্বাসের বন্যায় তাকে ভেসে যেতে হবে, হাসতে হবে, গান গাইতে হবে। আর নীলাম্বর যখন লিখতে পারবে না, যখন লেখা কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে থাকবে, তখন সুপ্রিয়া কেন দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত হতে থাকবে না, আত্মহত্যা করে মরবে না কেন ?"[১৩] আসলে গল্পের মানব চরিত্রটি অর্থাৎ নীলাম্বর একজন এককেন্দ্রিক মানুষ। সে নিজের খেয়ালে চলে। মনের বিভিন্ন অনুভূতি প্রবলভাবে তাকে নাড়া দেয় এবং সেই অনুযায়ী অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও প্রভাবিত করতে চায়। তার কাছে নিজের ছাড়া অন্যান্য মানুষের অস্তিত্ব তথা মানবিক অনুভূতি অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। তাই স্ত্রী সুপ্রিয়া যে একজন স্বতন্ত্র সত্তা তা নীলাম্বর উপলব্ধি করতে চায়নি। ফলে তাদের মধ্যে মানসিক একাত্মতার অভাব দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে সুপ্রিয়া একে স্বামীর পাগলামি বলে মনে করলেও পরে তার মনে হয় –"নীলাম্বরের এ পাগলামি নয়, হীন স্বার্থস্বরূপতা। নীলাম্বর চেনে শুধুই নিজেকে, নিজেকেই সে একমাত্র ভালোবাসে।"[১৪]

আমরা দেখি নিজেকে নিয়ে নীলাম্বর আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত সকলের সঙ্গে মেলা-মেশায় অনভ্যস্ত। শুধু তাই নয়, তার সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চাইলেও এই বাস্তব পৃথিবীর রস-রূপ-গন্ধকে সে আস্বাদন করতে চায় না। বরং সে সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে চায়। এই দিকটি কাহিনীর বর্ণনায় ধরা পড়েছে এইভাবে –"কিন্তু নীলাম্বর তো তা চায় না, সে দেখাতে চায় না নিজেকে, সারাজীবন সে কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে, মানুষের কাছ থেকে কেবল লুকোতে চেয়েছে, পৃথিবীকে সে ভয় করে, ভয় করে মানুষের দৃষ্টিকে। আর সমস্ত পৃথিবীময় কেবল অসংখ্য মানুষ যারা কিলবিল করছে পোকার মত, মশকের মত দুঃসহ গুঞ্জন তুলছে।"[১৫] কেবলমাত্র তাই নয়, সুপ্রিয়া তার একাকীত্বকে দূর করতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠলে তা নীলাম্বর ভালোভাবে নিতে পারে না। দেখা যায় – পারুলের বাসায় গিয়ে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের কথোপকথন ও আচার-ব্যবহারে সুপ্রিয়া মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হয়। তার গতানুগতিক জীবনে সাধারণ মানুষের এই সামান্য সান্নিধ্যই তাকে অজস্র আনন্দধারা উপহার দেয়। এই ক্ষণেক মুহূর্ত যেন তাকে নবজন্মের স্বাদ আস্বাদন করতে সাহায্য করে, যাকে কেন্দ্র করে এই জটিল জীবন যাত্রা কোথায় যেন একটু সহজতা লাভ করে। আর তাতেই সে উল্লসিত। সেই উল্লাস তথা মনের প্রসন্নতাকে সুপ্রিয়া যখন স্বামীর সামনে প্রকাশ করে তখন নীলাম্বরের তা সহ্য হয় না। সে জানায় – "থামলে কেন, হেমাঙ্গবাবুর গুণবত্তার বর্ণনা শেষ হয়ে গেল এরই মধ্যে ?"[১৬] আর একটি লক্ষণীয় বিষয়,

নীলাম্বর অপরের প্রশংসাও গ্রহণ করতে রাজি নয়। আসলে এ তার ব্যর্থ জীবনযাত্রারই প্রতিক্রিয়া। তবে স্বামীর এই কথায় সুপ্রিয়া তার সম্বিৎ ফিরে পায়। ফলে সে বিপরীত ভাবে অর্থাৎ হেমাঙ্গবাবু ও রমলাকে নিয়ে নিন্দাবাক্য ইচ্ছাকৃতভাবেই নীলাম্বরের সামনে উপস্থিত করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, বা, বলা যায় দাম্পত্য জীবনের এই পর্যায়ে এসে তাদের সম্পর্কের যে সমীকরণ তা আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে যায় এইভাবে –"নীলাম্বরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল সুপ্রিয়ার চোখের পর। তারা সব জানে, পরস্পরকে তাদের আর চিনতে বাকি নেই। কতদিন তারা নিজেকে নিঃসংকোচে অনাবৃত করেছে পরস্পরের কাছে। তাই কি পরস্পরের খুঁত তারা এমন নিখুঁতভাবে চিনেছে। তাই কি আবরণ ভেদ করে তাদের দৃষ্টি শুধু ক্ষতস্থানে গিয়েই বিদ্ধ হয় ? দুটি ধারাল তরবারির মত তাদের মিল কি শুধু আঘাতে আঘাতে ?"[১৭]

সুপ্রিয়া উপলব্ধি করতে পারে নীলাম্বরের এককেন্দ্রিকতা তার জগৎকে সঙ্কুচিত করতে করতে ক্রমশ এক অন্ধকার গুহার সৃষ্টি করছে। এবং সেখানে সে প্রতিনিয়ত নিমজ্জিত হচ্ছে। যেখানে সুস্থ পৃথিবীর স্পর্শ নেই ফলে তা থেকে কোন শুভ সৃষ্টির আশা করা যায় না। এর পরিণতি শুধুমাত্র ব্যর্থতা ও আত্মবিলুপ্তি। আর এখান থেকে স্বামীকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র সুপ্রিয়াই। সুপ্রিয়ার মনের এই ভাবান্তরের মূলে ছিল হেমাঙ্গ ও রমলার মুক্ত জীবন দর্শনের অনু প্রেরণা। যাদেরকে দেখে সুপ্রিয়া অনুভব করে এই বিপুলা পৃথিবীর চারদিকে অজস্র আনন্দ ছড়িয়ে আছে, তাকে শুধু মাত্র সংগ্রহ করতে হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকেই। এই বোধেই নীলাম্বরের উপর করুণ সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে ওঠে সুপ্রিয়ার মন। অনুকম্পা জাগে। তার মনে হয় আর রাগ নয়, আঘাত নয়, কলহেরও শেষ হোক। প্রীতি-ভালোবাসা ও নমনীয়তার মাধ্যমে স্বামীকে তার গহ্বর থেকে উদ্ধার করতে স্ত্রী সুপ্রিয়া দৃঢ় সংকল্প নেয় –"ঈর্ষার দহন থেকে সে তাকে স্নিগ্ধ শ্যামল পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ে আসবে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও নিজের পঙ্গুতাকেই যদি নীলাম্বর শুধু প্রত্যক্ষ করতে থাকে, সেখানেও শুধু ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতা তাকে দগ্ধ করতে থাকে, সেই গুহা নীলাম্বর ছেড়ে আসুক। জীবনের আরো অনেক দিক আছে, জীবন আরো বড়, আরো বিচিত্র। সুপ্রিয়া নীলাম্বরের পৃথিবী হতে চায় না, এই বিপুল পৃথিবীর মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নীলাম্বরের সঙ্গেই সমস্ত পৃথিবীকে সে উপভোগ করতে চায়।"[১৮]

এরকম মানসিকতা তথা প্রতিজ্ঞাকে সম্বল করে নিজের অভিমান-অহংবোধকে দূরে সরিয়ে স্ত্রী যখন স্বামীর কাছে ছুটে আসে তখন সে দেখতে পায় নীলাম্বর অস্থিরভাবে সমস্ত ঘর ভরে পায়চারি করছে, তার চোখে সন্ধ্যাবেলার সেই হিংস্রতা। পূর্বের রচনাকে সে টুকরো টুকরো

করে ছিঁড়েছে। তা দেখে স্ত্রী দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন থেকে যায় সুপ্রিয়া কি শম্বুক নীলাম্বরকে তার খোলস থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে ? তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক কি স্বাভাবিকতা লাভ করবে ? না কি সুপ্রিয়া নিজেই একটি শম্বুক হয়ে যাবে ?

এবার আসা যাক **'বেহালা'** গল্পে। 'বেহালা' নামক বাদ্যযন্ত্র ও অর্থসংকট একজন শিল্পীর দাম্পত্য জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তারই একটি উদাহরণ এই গল্পটি। গল্পের নায়ক নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্গত একজন মানুষ। সে একজন শিল্পী। তার হৃদয়ের নানা অনুভূতিকে বেহালার তারের মাধ্যমে অন্যান্য হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে সে সক্ষম। প্রত্যেক শিল্পীরই মনে তার শিল্পসত্তাকে তথা প্রতিভাকে বিকশিত করবার বাসনা থাকে। গল্পের শিল্পী চরিত্র অর্থাৎ পঞ্চানন সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু দেখা যায় বাস্তবজীবন তাকে সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে। সেখানে প্রথমত, দেখা যায় প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রী অপর্ণাকে দেখে তার মনে হয়েছিল সুরশ্রী মালশ্রীর মূর্তি। কিন্তু ধীরে ধীরে মোহ ভাঙলে সে উপলব্ধি করে সুর স্ত্রীর মূর্তির মধ্যে আছে কিন্তু মনের মধ্যে নেই। দ্বিতীয়ত, সংসারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সে ক্লান্ত ও ব্যর্থ হতে থাকে। ফলে তার মনের ক্ষোভ নানাভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর প্রতিফলিত হয়। সংসার ধর্মে অপটু ও অদক্ষ এই চরিত্রটিকে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নিজের শিল্পীসত্তার সঙ্গে অসাধারণ মানবসত্তার লড়াইয়ে নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। এর প্রভাব যে দাম্পত্য সম্পর্কে প্রতিফলিত হবে তা খুব স্বাভাবিক। তবে সেও তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। দেখা যায় – স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ায় স্বামী পঞ্চানন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছে। আবার যখন বেহালা বাজাবার আমন্ত্রণ এসেছে তখন শিল্পী পঞ্চানন সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, সকলে তার হাতের প্রশংসা করলে খুশিতে সে আপ্লুত হয়েছে। এই সময় তার কাছে সংসার জীবন তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে। পুনরায় সেই গতানুগতিক রূঢ় বাস্তবে তার ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়নি। আসলে এই বেহালাটি ছিল তার প্রাণের দোসর। যার মধ্য দিয়ে সে মুক্তি পেত, এক অপূর্ব জগতের সন্ধান পেত। জীবনে বহু কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু এই বেহালাটি তার কাছে সবসময় আছে। এটিই ছিল তার সান্ত্বনা। এইভাবেই ছোট ছোট সুখ-দুঃখকে বহন করে সে জীবনের পথে এগিয়ে চলে। এমত অবস্থায় গর্ভিনী স্ত্রীর সন্তান প্রসব করাকে কেন্দ্র করে অর্থের প্রয়োজন হয়। শিল্পী পঞ্চানন বাধ্য হয়ে তার প্রিয় প্রাণের দোসর বেহালাটিকে বিক্রি করে। ফলে তার মনে

একদিকে থাকে হারানোর বেদনা, অপরদিকে স্ত্রী সন্তানের প্রতি ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। কেননা, সে মনে করে তাদের জন্যই তার শিল্পীসত্তাকে হারাতে বাধ্য হয়েছে। মনের এমত পরিস্থিতিতে রুগ্ন সদ্যোজাত সন্তানটি যখন অবিরাম কাঁদতে থাকে তখন পঞ্চাননের হৃদয়তন্ত্র এক বিশেষ অনুভূতিতে কেঁপে ওঠে। সন্তানের কান্নার মধ্য দিয়ে সে বেহালার সুর শুনতে পায়। এখানেই পঞ্চাননের শিল্পীসত্তা ও পিতৃসত্তা একাকার হয়ে ওঠে, যা তাদের সম্পর্ককে এক ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে।

সম্পর্কের উত্থান-পতনকে সঙ্গী করেই মূলত দাম্পত্য-জীবন আবর্তিত হয়ে থাকে। সেই তরঙ্গায়িত সম্পর্কেরই একটি বিশেষ নির্দশন হল **"প্রতিদ্বন্দ্বী"** গল্পটি। এটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দুটি মানুষের মধ্যেকার দৃষ্টিভঙ্গি তথা মানসিক অনুভূতির পার্থক্য এই গল্পের মূল বিষয়। এইক্ষেত্রে বলা যায়, শিল্পবোধ - সৌন্দর্যবোধ এক একটি মানুষের এক এক রকমের হয়ে থাকে। কারও ক্ষেত্রে তার গভীরতা অনেক বেশি, আবার কারও ক্ষেত্রে কম। অর্থাৎ বলা যায়, শিল্পবোধ তথা সৌন্দর্যচেতনা বিষয়টি আপেক্ষিক এবং তা একান্তভাবে নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন মানুষগুলির মন-মানসিকতার উপর। এই বিষয়টির উপর লক্ষ্য রেখেই আমাদের আলোচ্য গল্পের চরিত্রগুলির মনোগহ্বরে প্রবেশ করতে হবে।

"প্রতিদ্বন্দ্বী" গল্পের কাহিনীতে আমরা যে প্রধান দুটি চরিত্র পাই – অবিনাশ ও রেবা, তারা পরস্পরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আবদ্ধ। গল্পে দেখা যায়, স্বামী অবিনাশকে একজন বড়মাপের শিল্পী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। যিনি বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের বুক কেটে কেটে তাতে চক্ষু-কর্ণ তথা দেহের অবয়ব দানের মাধ্যমে প্রতিটি মূর্তিকে জীবন্ত করে তোলেন। ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভাবকে ধরা রয়েছে তার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে। যেগুলি তার সৌন্দর্যচেতনা তথা শিল্পসত্তার বহিঃপ্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ। লক্ষণীয় বিষয়, আলোচ্য কাহিনীতে সর্বদা রূপ অন্বেষণে নিযুক্ত, রূপের পূজারী অবিনাশের শরীরের বাহ্যিক রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে – তা এককথায় কুৎসিত-কদাকার; সেই সঙ্গে তার শরীরে বয়সের ছাপও স্পষ্ট। এই বিষয়টি ধরা পড়েছে রেবার মার চোখে। মেয়েকে এমন পাত্রের হাতে তুলে দিতে তার মন দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে। তার গলায় শোনা যায় আপত্তির সুর – "কিন্তু আমার রেবার তুলনায় বয়সটা একটু যেন বেশি মনে হয়, পয়ত্রিশ চল্লিশের কম কি হবে ? ..... পাঁচুর মা বলছিল ভদ্রলোকের চেহারাখানা দেখতে ঠিক ভদ্রলোকের ছেলের মত নয়। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত রূপ আমার রেবার, তার বরের চেহারা যদি এমন হয় – পাঁচুর মা-ই বলছিল।"[১৯] যদিও এই আপত্তি তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কাছে হার মেনেছিল।

অপরদিকে অবিনাশের বৈপরীত্যে রেবাকে অপূর্ব রূপের অধিকারিণী হিসাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। তার রূপে শুধুমাত্র অবিনাশই নয়, তার মাও মুগ্ধ। অবিনাশের মায়ের মনের অভিব্যক্তি – "ওর মুখের ওপর থেকে সহজে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না সরোজিনীর। পাথর কেটে অবিনাশ যে সব মূর্তি গড়ে, তারই একখানা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"[২০] তবে রেবা তার নিজের সম্পর্কে সচেতন নয়; অর্থাৎ সে যে অপূর্ব সুন্দরী, তার রূপ মুগ্ধতায় সকলে তন্ময় হয়ে যায় এই ধারণাটি রেবার মনে জাগ্রত হয়নি। আসলে রূপ সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ এই বিষয়গুলি তথা অনুভূতির এই জায়গাগুলি রেবার মানসলোকে অস্পষ্ট ও গোচরহীন হয়ে আছে। কাজেই রেবা স্বামীর শিল্প সত্তাকে প্রাথমিক পর্যায়ে উপলব্ধি করতে পারেনি। তার কাছে অবিনাশের সৃষ্টিগুলো শুধুমাত্র মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলা যায় – কোন কোন মানুষ আছে যাদের 'শিল্প-সৌন্দর্যবোধ' সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তা হয়তো কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থার মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে। আলোচ্য 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে স্ত্রী রেবার ক্ষেত্রে বিষয়টি এরকমই। প্রাথমিক পর্যায়ে গল্পে এই যে একটি মানুষ রূপ সৌন্দর্যের পূজারী, অপরদিকে রূপান্ধ আর একটি মানুষের মধ্যে মানসিকতার যে পার্থক্য, জগৎ ও জীবনকে দেখবার, জানবার যে পার্থক্য তারই প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে। মানসিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত এই বৈষম্য তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে অকথিত এক সূক্ষ্ম বিপরীত স্রোতধারায় বয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। দুজন মানুষ যেন দুজনকে সম্পূর্ণ রূপে পায় না। এই না পাওয়ার খাম্‌তি তাদের মধ্যে মানসিক দূরত্বকে বৃদ্ধি করতে থাকে।

স্ত্রী রেবা রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে অসচেতন ও উদাসীন – তা অবিনাশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু একজন বিখ্যাত শিল্পী হিসাবে অবিনাশ চায় তার স্ত্রী তার শিল্প-সৃষ্টিকে উপলব্ধি করুক এবং তার গুরুত্বকে উপলব্ধি-অনুধাবন করুক। সেই সঙ্গে স্বামীর সে প্রেরণাদাত্রী হোক। তাই যখন কথার কোন জবাব না দিয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিটার দিকে রেবা একবার তাকায় তখন অবিনাশ অপেক্ষমানভাবে তাকিয়ে থাকে রেবার দিকে – নিশ্চয়ই সুন্দর কোন মন্তব্য এবার তার মুখ থেকে বেরোবে। কিন্তু ততক্ষণে জানালা দিয়ে রেবার দৃষ্টি পড়েছে রাস্তার উপর। অবিনাশকে হতাশ করে। আবার রেবা যখন বলে ওঠে –"কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা তোমার"[২১] অবিনাশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে প্রত্যাশার অপেক্ষায় থাকে। উত্তরে রেবা বলে –"এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ি আমাদের বিজয় কাকাও করতে পারেনি। তুমি যে এত বড় লোক, তা সত্যি আগে বিশ্বাস হয়নি।"[২২] অম্লান ছায়া পড়ে অবিনাশের মুখে; মৃদু হেসে বলে, 'তাই না কি ?'[২৩]

বারবার আশাহত হয়ে অবিনাশ মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। তাই আবার যখন রেবা এক পঙ্গু মানুষের চলাফেরা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে –"কিন্তু যাই বলো ভারি অদ্ভুত লাগছে আমার। একটা পাও নেই তবু ওর চলা থামছে না।"[২৪] তখন অবিনাশের গলায় শোনা যায় ক্ষোভ ও আক্ষেপের সুর –"আর আমার তৈরী মূর্তিগুলোর দুটো করে পা থাকা সত্ত্বেও এক পাও কেউ নড়ছে না, তাই নয় ? কিন্তু জানো রেবা নড়ে ওরা ঠিকই, কেবল সকলের তা চোখে পড়ে না। পুত্তলিকার চোখ আছে দেখতে পায় না, আসলে তেমন পুতুলের সংখ্যা মানুষের মধ্যে বেশী"[২৫] আর একবার হাসতে হাসতে রেবা বলেছিল –"ছোড়দা কি বলছিল জানো ? তুমি আমাকে বিয়ে করেছ মডেল করবে বলে। প্রত্যেক আর্টিস্টের নাকি দু'একটি করে মডেল থাকে। অর্ডার মাফিক ঘন্টার পর ঘন্টা কিভাবে তাদের কর্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কোমর বাঁকিয়ে, ছোড়দা তাই দেখাচ্ছিল। মাগো এমন হাসাতে পারে ছোড়দা। আর যাই কর, আমাকে কিন্তু তোমার মডেল হতে বলো না।"[২৬] অবিনাশের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। রেবার রূপে একদিন অবিনাশ মুগ্ধ হয়েছিল। সেই মু গ্ধতা যেন ধীরে ধীরে লীন হতে থাকে। তার মনে হয় – "রূপ, কিন্তু এই মূঢ় ছেলে মানুষের রূপ দিয়ে কি করবে অবিনাশ ? যার কেবল রূপই আছে, রূপবোধ নেই, রূপ সৃষ্টির কোন কাজে যাকে লাগানো যাবে না, তাকে দিয়ে কি হবে অবিনাশের।"[২৭] তাই যত দিন যায় অবিনাশের বিরক্তি তত বেড়ে ওঠে। রেবার চঞ্চল, প্রাণবন্ত রূপ কিছুর মধ্যেই যেন ধরে রাখা যায় না। যত ব্যর্থ হয় অবিনাশ, তত তার ক্রোধ বাড়ে। ইতিমধ্যে সে অনেকবার চেষ্টা করেছে রেবার মনে যাতে শিল্পবোধ আসে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি; এসব কথা তুললেই সে পালিয়ে যায়। কোন না কোন ছলে চলে যাবে বাইরে। বরং সযত্নে সে অবিনাশকে পরিহার করেই চলতে চায়।

অপরদিকে রেবা চায় – তার স্বামী তাকে কাছে ডাকবে, আদর সোহাগ করবে। অর্থাৎ শারীরিক সাহচর্য ও মানসিক একাত্মতা চায় রেবা। কিন্তু সে যেমন করে যেভাবে পেতে চায় সেভাবে যেন পায় না। তার মধ্যেও না পাওয়ার অতৃপ্তি কাজ করতে থাকে। ঘরে আসা নিয়ে অবিনাশের এক কথার উত্তরে রেবা বলেছিল –"আসতে কি আর ইচ্ছা করে না তোমার ?" অবিনাশ বলেছিল –"করে ? কেন বলতো ?" অর্থপূর্ণভাবে রেবা একটু হেসে বলে –"আহা, কিছু যেন বোঝেন না।"[২৮] আসলে অবিনাশও সবই বোঝে। রেবা কি চায় অবিনাশ তা উপলব্ধি করেছে। এই ক্ষেত্রে তার মনের অভিব্যক্তি –"বোঝে অবিনাশ সবই বোঝে। অবিনাশের আদর চায় রেবা, তার কাছ থেকে গল্পগুজব শুনতে রেবা ভালোবাসে, এ ঘরে আসে রেবা নিতান্ত অবিনাশের জন্যই; অবিনাশের সৃষ্টির দিকে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই রেবার, কিন্তু ও রকম দৈহিক

আরাম যে কোন পুরুষই রেবাকে দিতে পারত। তার জন্য শিল্পী অবিনাশের কি প্রয়োজন ছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে কত নরনারী অবিনাশের এই স্টুডিও দেখতে এসেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে। শুধু কোন মুগ্ধতা এল না, বিস্ময় জাগল না রেবার মনে, তার শিল্পকে তার সৃষ্টিকে একটুও ভালোবাসলো না রেবা। স্বামীর খ্যাতি আছে, আছে, ঐশ্বর্য আছে এইটুকুই সে বোঝে, তার সৃষ্টির প্রতিভাকে উপলব্ধি করবার মত বোধশক্তি রেবার নেই।"[২৯] এই যে দুটি মনের পাওয়া – না পাওয়ার দ্বন্দ্ব তথা একজনের প্রত্যাশা বিনষ্ট অপরজনের চাহিদার অপূর্ণতা তাদের দাম্পত্যজীবনকে প্রাণহীন করে তুলেছিল। জীবনের ধারায় তারা যেন কেউ কাউকে সম্পর্ণরূপে লাভ করতে পারল না, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হতে পারল না, তাদের সম্পর্কের মধ্যে এই খামতিই গল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়েছে। গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু জীবনের গতি অন্যরকম, সে আপন তাগিদে, আপন প্রয়োজনে চলে, যার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হয় মানব চরিত্রগুলোকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনের মাধ্যমে যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে তা তাদের চলমান দাম্পত্য সম্পর্ককে অন্যমাত্রায় দোলায়িত করে তোলে।

অবিনাশের তৈরী মূর্তি বিক্রি করার বিষয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে অবিনাশের রুক্ষ ভাষায় দর কষাকষি হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেবার মনের সুপ্ত শিল্পবোধ যেন ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়। রেবা পাশ থেকে সব শুনছিল। অবিনাশের কর্কশ কণ্ঠে সে চমকে উঠল। তার মনে হল – রাগলে যেন আরও বেশি কুশ্রী দেখায় অবিনাশের মুখ। আর সেইসঙ্গে তারই পাশে চোখে পড়ল মদনমোহনের মূর্তি। স্থির প্রসন্ন হাসি মুখটিতে অনুক্ষণ লেগে রয়েছে। রেবা উপলব্ধি করল সত্যিই ভারি সুন্দর হয়েছে মূর্তিখানা। স্বামীর সৃষ্টি অন্যান্য মূর্তিগুলির সৌন্দর্য তার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং তার মুগ্ধতা তার চোখে বিস্ময় জাগিয়ে তুলছে। সে স্বামীকে মূর্তিটি বিক্রি করতে নিষেধ করে। এবং অবিনাশকে না জানিয়ে সেই মূর্তিখানি ঠাকুর ঘরে নিয়ে আসে। তাই নিয়ে অবিনাশ সকলকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আর তাতে রেবার মনে হয় –"রাগ করলে এত কুশ্রী দেখায় অবিনাশকে যে, তার দিকে একেবারেই চাওয়া যায় না।"[৩০] শুধু তাই নয়, অবিনাশ রাতে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল এই অবস্থায় স্বামীকে দেখে রেবার মনে হল – "এতদিন ভালো করে চেয়ে দেখেনি। আজ মনে হল, ঘুমুলেও বড় বিশ্রী দেখায় অবিনাশের মুখ। প্রৌঢ় মুখে রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। স্থানে স্থানে কুঁচকে গেছে চামড়া। এত অসুন্দর তার স্বামী আর সত্যিই এত বুড়ো।"[৩১] শুধুমাত্র স্বামীর কদাকার রূপ নয়, বৈপরীত্যে তার নিজের অসাধারণ রূপও তার কাছে ধরা পড়েছে। দেওয়ালে বড় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ করে

রেবা উচ্ছ্বসিত, পুলকিত হয়েছে। উগ্র আনন্দে অপূর্ব হাসি ফুটেছে তার মুখে। রেবার মনে হয়েছে – তার যৌবন, তার সৌন্দর্য অবিনাশের কুশ্রী ব্যবহারের একমাত্র প্রতিশোধ। রেবা তার সৌন্দর্যকে নিজের রঙে, নিজের রুচিতে আরও বেশি করে রাঙিয়ে তোলে। তার মনে হয় এই রঙ, রূপ, সৌন্দর্যের অধিকারী তার জীবন একমাত্র নিজের। সেই নিজ জগতের সে যেন নিজেই স্রষ্টা। সেখানে আর কারও প্রয়োজন নেই, এমনকি, স্বামী অবিনাশেরও না।

লক্ষণীয় বিষয়, দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্যায় মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির অসমতা তাদের সম্পর্ককে একটি পর্যায়ে চালিত করেছিল। এই অসমতা তাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মিক দূরত্বের কারণ ছিল। সেই সময় অবিনাশ চেয়েছিল – তার স্ত্রীর মনে শিল্পবোধ সমৃদ্ধ হোক্। সত্যিই আজ রেবা শিল্প-সৌন্দর্য চেতনা সমৃদ্ধ একটি সত্তা। এই অর্থে তারা দুজন আজ সম-মানসিকতার তথা সম-বোধের অধিকারী। আবার আর এক অর্থে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পরস্পরে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সম-দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমলড়াই-এ, সম-ভাবনায় তারা পরস্পরের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল রেবার মনোলোকে জাগ্রত সৌন্দর্যবোধে কি অবিনাশের কুৎসিত কদাকার রূপ ও ব্যবহার ধরা পড়বে না ? এবং তার খামতি তার মনের ভিত্তিকে কি আলোড়িত করবে না ? করলে তাদের পরস্পর সম্পর্ক কি রূপ নেবে, আর এই সম-পর্যায়ে এসে কতখানি সুস্থ থাকবে তাদের পরবর্তী সম্পর্ক ধারা। সম্পর্কের এই বৈচিত্র্যময় আবর্তের ধারার রূপ কেমন হবে তারই ভাবনা পাঠককুলের মনে সঞ্চারিত করেছেন গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর এই 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পটির মাধ্যমে।

"মদনভস্ম" গল্পটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে 'রূপান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা-৪' এ অন্তর্ভুক্ত।

'দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের উত্থান-পতন' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গল্পটিকে বেছে নিলেও এখানে দুজন স্বামী-স্ত্রী নয়, স্ত্রীর সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিমানুষটির সম্পর্কের ফলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের যে গতিমুখের পরিবর্তন হয়েছে সেই বিষয়টিই আলোচ্য গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা জানি, আমরা মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। নিজের চাহিদা, প্রয়োজনকেই আমরা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই বিজ্ঞানী ডারউইন 'অস্তিত্বের লড়াই'-এর তত্ত্ব স্থাপিত করেছিলেন, যা আদিম প্রবৃত্তি হিসাবে খ্যাত। এটি সমস্ত জীব-প্রকৃতির মধ্যেই কাজ করে। মানবজাতি ধীরে ধীরে সভ্য থেকে সভ্যতার

হয়েছে ঠিকই তবে সেই আদিম প্রবৃত্তি কিন্তু প্রত্যেকের রক্তে সঞ্চারিত আছে। তাকে মানুষ সযত্নে সভ্যতা-ভদ্রতা নামক মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। তবে জীবনের চরম ক্ষণে অর্থাৎ বেঁচে থাকার প্রশ্ন যখন বড় হয়ে দাঁড়ায় তখন সমস্ত আড়াল ও মুখোশ খুলে গিয়ে সেই প্রবৃত্তিই বড় হয়ে ওঠে। আর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পারস্পরিক মানবিক বন্ধন, তথা হৃদয় অনুভূতির প্রাধান্য যেন ম্লান হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক কোন ধারায় প্রবাহিত হয় তাই আলোচ্য গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

এই গল্পে তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই তিনজন হল ধনঞ্জয়, মালতী ও মানিক। ধনঞ্জয় ও মালতী দুজন স্বামী-স্ত্রী। অপরদিকে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে মানিকের সম্পর্ক হল মামা-ভাগ্নে। গল্পে দেখা যায়, ধনঞ্জয়কে একজন প্রৌঢ় চরিত্র হিসাবে অঙ্কন করা হয়েছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে মালতীকে বিবাহ করে। অপরদিকে মালতী এই গল্পে ভরা যৌবনের অধিকারী এক নারী। সে স্বাভাবিকভাবে যৌবনের প্রতি অর্থাৎ মানিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং মানিককেও নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। মালতী ও মানিক উভয়েই জানে – তাদের সম্পর্ক সমাজ নিষিদ্ধ। তাদের সম্পর্কের সামাজিক পরিভাষা হল অবৈধ তথা পরকীয়া সম্পর্ক। তথাপি পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ নানা বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে সে সম্পর্ককে অটুট রাখতে সাহায্য করেছে। ধনঞ্জয় জানে, সে বিগতযৌবন সম্পন্ন একজন প্রৌঢ় মানুষ। এই বিষয়টি তাকে ভিতরে ভিতরে দুর্বল করে দেয়। তাই সে সবসময় স্ত্রীকে নিজের কাছে আঁকড়ে রাখতে চায়। স্ত্রীর মনে ভালোবাসা অথবা ভয় সঞ্চারিত করে তার মনকে কুক্ষিগত করতে চায় ধনঞ্জয়। এই মানসিকতা থেকে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহের প্রবণতা জাগ্রত হয়। যদিও তার সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা, একসময় মালতী ও মানিকের সম্পর্ক তার কাছে গোপন থাকেনি। তা চাক্ষুস প্রমাণিত হয়েছে।

মিষ্টান্ন খাওয়াকে কেন্দ্র করে মালতী ও মানিকের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে –"মানিক উঠে দাঁড়িয়ে বাটিটা ধরতে হাত বাড়াতেই বাটিসুদ্ধ হাতখানা মালতী যথাসাধ্য উঁচু করে ধরল। মানিক এত কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে যে মালতীর কোমল বুকের স্পর্শ লাগছে তার গায়ে। মিষ্টান্নের বাটি মালতীর হাতেই রইল। সেদিকে একটুও হাত না বাড়িয়ে মানিক মালতীকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার সেই মিষ্টান্ন খাওয়া ঠোঁটে পরপর কয়েকটি চুম্বন করে বসল। মুহূর্তকাল স্তম্ভিত থেকে খিল খিল করে হেসে উঠল মালতী।"[৩২] এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ধনঞ্জয় কঞ্চি দিয়ে পিটিয়ে মানিককে বাড়ি ছাড়া করেছিল এবং মালতীকে চুলের মুঠি ধরে

মাটিতে ফেলে আঘাতের পর আঘাত করেছিল। কিন্তু স্বামীর এই আঘাতের কোন প্রভাব মালতীর উপর পড়েনি। কেননা, সে আগের মতই স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করে; রাঁধে-বাড়ে, ঘরসংসারের কাজ করে। শুধু তাই নয়, মানিকের সঙ্গে তার মেলামেশা পূর্বের মতই স্বভাবিক থাকে। তারও প্রমাণ ধনঞ্জয় হাতে হাতেই পায় – রাতের অন্ধকারে মালতী ধনঞ্জয়কে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকের সাদা লোমগুলির মধ্যে মুখ গোঁজে। তার গা থেকে যে মিষ্টি গন্ধ ধনঞ্জয় উপভোগ করছিল তার উৎস খুঁজতে গিয়ে তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয় – "খোঁপার চারপাশে ঘুরিয়ে বড় বড় গন্ধরাজ গোঁজা। অন্ধকারেই সেই ফুলগুলির ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ধনঞ্জয় তাদের আকার পরিমাপ করে। এতবড় গন্ধরাজ কেবল এক মানিকের আঙ্গিনাতেই আছে। হাতের তালু পুড়ে যেতে থাকে ধনঞ্জয়ের তবু হাতখানা সে তুলে নেয় না। মালতীর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে সর্বাঙ্গ ধনঞ্জয়ের ঘিন ঘিন করতে থাকে তবু নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেয় না।"[৩৩] এইভাবে মালতীর প্রকাশ্যে অবমাননার সাহস দেখে ধনঞ্জয় আশ্চর্য ও ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সমস্ত জীবনটা তার কাছে বিস্বাদ হয়ে ওঠে। ধনঞ্জয়ের মনে হয় এর চেয়ে যদি মানিক ও মালতী অন্য কোথাও চলে যেত তাও সহ্য হত। কিন্তু তার পরিবর্তে প্রতিদিন মালতী ও মানিক তাকে বঞ্চনা করে চলেছে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় মালতীকে প্রতি মুহূর্তে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করবে। কিন্তু কাছে গেলে ধনঞ্জয়ের সেই সংকল্পও গুলিয়ে যায়। মালতীর যে ভালোবাসার অভিনয়, ছল করা চুম্বন, আলিঙ্গন-অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধনঞ্জয়কে গ্রহণ করতে হয়। মারতে গিয়ে সে যেন অন্তরে অন্তরে নিজেই মার খেতে থাকে। মনের এই দ্বন্দ্ব, অশান্তি ধনঞ্জয়কে অস্থির করে তোলে। মানিককে কেন্দ্র করে মালতী-ধনঞ্জয়ের দাম্পত্য জীবনে এই দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েন গল্পটির প্রাথমিক পর্যায়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, প্রবৃত্তি বা পরিবেশ-পরিস্থিতি উক্ত তিনটি চরিত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। এবং তিনটি চরিত্রের মনোলোকের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। আসলে এই গল্পের নায়ক হল এই আদিম প্রবৃত্তি যাকে নিয়তি হিসাবেও ধরা যেতে পারে। সে-ই গল্পের স্রোতধারাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে মানবজাতি যতই সভ্য হোক না কেন, প্রতিটি মানুষই নিজ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এ ব্যস্ত। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানবিক অনুভূতি তথা মূল্যবোধের আদর্শ তুচ্ছ হয়ে ওঠে। যার প্রভাব পড়ে থাকে সমাজসংসার ও জীবন প্রদত্ত মানব সম্পর্কগুলোর উপর।

সম্পর্কগুলো কেন, কীভাবে বৈচিত্র্যময় রূপ লাভ করে তার কারণ হিসাবে লেখক এই

গল্পে এক বিশেষ পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করেছেন। পরীক্ষা করেছেন – বিপরীত পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলির ভূমিকা কি হতে পারে, তার ফলে তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন সমীকরণে পৌঁছোয়। দেখা যায়, দুর্ভিক্ষ মালতী ও ধনঞ্জয়ের দাম্পত্য জীবন তথা সমগ্র গ্রামকে স্পর্শ করেছে। তার উপর সহায়-সম্বল যা কিছু ছিল তাও চুরি যায়। এই পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে ধনঞ্জয় কলেরায় আক্রান্ত হয়। মালতীও পরপর তিনদিন কচু সিদ্ধ খেয়ে মরিয়া হয়ে শেষপর্যন্ত দুমুঠো ভাতের সন্ধানে বের হয়। শেষ পর্যন্ত বহুকষ্টে মালতী একমুঠো ভাত জোগাড় করতে পারে। সেই ভাতকে কেন্দ্র করে মালতী ও মানিকের যে আচরণ, কথোপকথন এবং পরিণতি তা-ই এই গল্পের কেন্দ্র বিন্দু। ধনঞ্জয়ের চোখে এই বিষয়টি ধরা পড়েছে এভাবে –"কেবলই এ হাত থেকে ও হাতে সেটাকে নিয়ে রাখছে। মানিকের হাত এড়াবার জন্য একবার বাটি সুদ্ধ হাতখানা মাথার ওপর উঁচু করে ধরছে আর একবার পিছনে সরাচ্ছে মালতী। কখন আঁচলখানা মাটিতে পড়ে গেছে মালতীর। কিন্তু সেদিকে মানিকের লক্ষ্য নেই। সে কেবল মালতীর হাতের দিকে লুব্ধ হাত বাড়াচ্ছে। খানিক পরে পরিশ্রান্তভাবে মানিক বলল – "এক মুঠো ভাত দিবি তাই প্রাণ ধরে দিতে পারিসনে এই তোর ভালোবাসা। আজ পাঁচদিন ধরে ভাতের মুখ দেখিনি। মালতী বলল - ইস্ কি সাধের নাগররে আমার। এক মুঠো কুড়িয়ে আনবার শক্তি নেই, মেয়েমানুষের খিদের গ্রাসে ভাগ বসাতে এসেছেন। বের হ দূর হ এখান থেকে।"[৩৪] লক্ষণীয় বিষয় – ঘটনা একই, কিন্তু পাল্টে গেছে শুধুমাত্র সময়। প্রথমদিকে অর্থাৎ যখন আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল তখনও মিষ্টান্নের বাটি নিয়ে মালতী ও মানিকের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়। তবে সে সময় মিষ্টান্নের বাটি লক্ষ্যবস্তু ছিল না। মালতীর শরীর স্পর্শের মাধ্যমে সুখানুভূতি, সেই সঙ্গে প্রেমানুভূতি লাভ করাই ছিল মানিকের প্রধান লক্ষ। কিন্তু এবার তার বিপরীত কার্যক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মানিকের এবার লক্ষ্যবস্তু 'ভাতে ভরা কালো পাথরের বাটিটি'। এবারও মালতীর আঁচল মাটিতে পড়ে যায়; কিন্তু সেদিকে মানিকের কোন লক্ষ্য নেই। আর এখানেই বোধ হয় বড় হয়ে ওঠে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির মূল দিকটি। অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার তাগিদ। যেখানে মনের আবেগ-অনুভূতিতে গঠিত হওয়া সম্পর্ক ঠুনকো হয়ে যায়। শিব যেমন প্রেমের দেবতা মদনকে ভস্ম করেছিলেন, এখানে ক্ষুধা রূপ জৈব প্রবৃত্তিই প্রেমানুভূতিকে ধ্বংস করল। মৃত্যু ঘটাল মানব বন্ধনের এক বিশেষ অনুভূতিকে। হয়ত এই অর্থেই এই গল্পের নামকরণ হয়েছে 'মদনভস্ম'। অপর দিকে এই দৃশ্য দেখে ধনঞ্জয়ের মনে হল – "বেশ হয়েছে। ধনঞ্জয়ের আর প্রয়োজন নেই। নিজের হাতেই নিজেরা চরম শাস্তি পাচ্ছে।"[৩৫] অর্থাৎ ধনঞ্জয়ের মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল,

মালতী-মানিকের সমাজ-সম্পর্ক বহির্ভুত রূপটির অবনমনের এই দৃশ্য দেখে তার খানিকটা প্রশমিত হয়। শুধু তাই নয়, মালতী ও মানিক বাটি নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি করে মানিক বাটিটি ছিনিয়ে নেয় তখন আর্তনাদ করে মালতী মানিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড় বসিয়ে দেয়। ফলে সমস্ত ভাত মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই পড়ে যাওয়া ভাত নিজেদের দিকে আনতে তারা পরস্পরে ব্যস্ত। এই দৃশ্য ধনঞ্জয়ের চোখে জল এনে দেয়। অর্থাৎ বলা যায়, এই ঘটনা শুধুমাত্র মালতী ও মানিকের মনের গতিকে পরিবর্তন করেনি সেই সঙ্গে ধনঞ্জয়ের হৃদয়কেও দোলায়িত করেছে। মালতী ও মানিকের প্রতি ধনঞ্জয়ের যে ক্ষোভ, ক্রোধ ছিল, তা কিছুটা ম্লান হয়ে যায় এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয় ধনঞ্জয়ের মনে। আমাদের যৌন ক্ষুধা জীবনের স্বাভাবিক সমাজ অনুমোদিত সম্পর্কগুলোকে ভেঙে দিয়ে জৈব প্রবৃত্তির তাগিদে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে সাহায্য করে। কিন্তু খাদ্যের ক্ষুধা যেহেতু অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে, তাই জীবনের অস্তিত্ব না থাকলে বাকি সবই ম্লান হয়ে যায়। এখানে মালতী ও মানিকের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক তৈরী ও খাদ্যের অভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের জৈব প্রবৃত্তির দুটি দিক – ক্ষুধা ও যৌনতা – কীভাবে আমাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে মানব-মানবীর আদিম সম্পর্কের দিকটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

জটিল স্ত্রীরোগ দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার খেলাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তারই একটি দিক ধরা পড়েছে **'রোগ'** গল্পে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে 'আন্দবাজার' পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে গল্পটি প্রকাশিত হয়।

প্রকাশকাল অনুযায়ী গল্পে স্বাধীনতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে।

দাম্পত্য জীবনের মাঝামাঝি একটি সময় পর্ব থেকে এই গল্পের কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। সেখানে দেখা যায়, স্ত্রী নীলিমা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। অপরদিকে স্বামী বিভূতি স্ত্রীর প্রতি তার দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হলেও রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে অজ্ঞ। তাই সে স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার ভার বড় শ্যালিকার উপর ন্যস্ত করে সারাদিন অফিস করবার পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরে। বিভূতির এই আচরণে শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয় এবং তা প্রকাশও করে। তবে স্বামীর এইরকম আচরণের পিছনে নানাবিধ কারণ আছে। আমরা কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে পেয়ে থাকি যে, ফুলশয্যার রাত্রেও নীলিমার জ্বর এসেছিল। অর্থাৎ সে দীর্ঘদিন ধরেই রোগে আক্রান্ত। হয়তো বিবাহের পূর্ব থেকেই এই রোগ তার শরীরে

বাসা বেঁধেছিল। তারই পর্যায়ক্রমিক অবস্থা তাকে মাঝে মাঝে গ্রাস করত।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য, 'ফুলশয্যার রাত্রি' দুজন নব-দম্পতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। যেখানে দুজন মানুষ পরস্পরকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে স্পর্শ করে একাত্মতা অনুভব করে থাকে। এবং সেখান থেকেই পরস্পরকে উপলব্ধি করবার মধ্য দিয়ে তাদের নব জীবনের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু আলোচ্য গল্পে নীলিমা ও বিভূতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটে। হয়তো সেই খামতির জন্য দুজন মানুষের মধ্যেকার দূরত্ব দূরীভূত হয়নি। তারা পরস্পরের 'মন'কে স্পর্শ করতে পারেনি। বা বলা যায়, পরস্পরের ভালোলাগা-মন্দলাগা ও নানা অনুভূতি সম্বন্ধে দুজনেই অজ্ঞ ছিল। তাই তাদের সম্পর্ক সময়ের তালে এগিয়ে গেলেও তা ছিল প্রাণহীন। বহমান সম্পর্কে একাত্মতার অভাব থাকায় তাতে যেন বিচ্ছেদের সুর মিশ্রিত ছিল। এই একটি দিক যেমন সত্য, তেমন আর একটি বিষয় সম্পর্কে আমরা সকলে হয়তো একমত তা হল – দীর্ঘ দিন ধরে একই রোগ ও রোগগ্রস্ত মানুষের প্রতি সমান অনুভূতি রাখা একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিভূতির আচরণের পিছনে হয়তো এই দুই কারণ নিহিত ছিল। তাই সেবা-শুশ্রূষা বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকলেও সে কখনো অসুস্থ স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসে নি বা বসতে চায় নি। যদি উভয়ের মধ্যে মানসিক নৈকট্য থাকত তাহলে হয়তো বিভূতি স্ত্রীর কাছে সবসময় থেকে সেবা-শুশ্রূষা করবার চেষ্টা করত এবং একটা সময় হয়তো এই বিষয়টি তার আয়ত্বে চলে আসত। কিন্তু তা ঘটেনি। তবে স্বামী হিসাবে রোগ নিরাময়ের জন্য অর্থ ব্যয় করা, ঔষধ পথ্যের যোগান দেওয়া এই সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্যই সে পালন করেছে।

যাই হোক, এমত পরিস্থিতিতে দেখা যায় – নীলিমার দিদি বিভূতিকে কিছু সময়ের জন্য স্ত্রীর পাশে রেখে বাইরে যায়। আর এই সময়টুকুতেই বিভূতি ক্লান্ত হয়ে ওঠে এবং বাইরে যেতে উদ্যত হয়। এই সময় নীলিমা তার দুর্বল হাতখানি দিয়ে স্বামীর পায়ের পাতা স্পর্শ করে বলে –"একটু বসো শুধু আর একটুখানি।"[৩৬] করুণ ও ক্লান্ত চোখে স্ত্রীর এই আবেদন স্বামীর মনের ভাবান্তর ঘটায়। স্ত্রীর প্রতি একরকম সহানুভূতিতে ও মায়ায় বিভূতির মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বামীর প্রতি নীলিমার এই নির্ভরতা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে বিভূতি আপ্লুত ও প্রসন্ন হয়। তার মনে হয় এমন মিষ্টি কাতর মিনতি স্ত্রীর কণ্ঠে যেন আর কোনদিন শোনে নি। তাই সে গভীর সহানুভূতিতে স্ত্রীর সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। এই পরিস্থিতিতে তার মনের ভাব ধরা পড়েছে এইভাবে – "দীঘল ঋজু দেহ আরো শীর্ণ হয়েছে রোগে। ফ্যাকাশে হয়েছে রঙ, রক্তের চিহ্নমাত্র নেই এতটুকু। তবু এই রোগশীর্ণ দেহ কেমন যেন ভারি সুন্দর লাগল বিভূতির চোখে।

কেমন অসহায়ভাবে বিছানার সঙ্গে একেবারে যেন মিশে রয়েছে নীলিমা। কিন্তু এই রুগ্নতা এক অপূর্ব করুণ সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। যা কোনদিন চোখে পড়েনি বিভূতির। এক মুহূর্ত বিভূতি অপলকে তাকিয়ে রইল ওর দিকে সুন্দরী নারীর দেহে যে কোন কিছুই অলংকার হয়ে ওঠে; কিন্তু রোগও যে এমন অপরূপ সুষমা এনে দিতে পারে তা তো বিভূতির জানা ছিল না। রোগকে তাহলে যতটা কুৎসিত সে ভেবেছিল তা কি সে নয় ?"[৩৭]

আসলে এই প্রথম বিভূতি তার ভালোবাসার চোখ দিয়ে স্ত্রীকে দেখে। তার এই মুগ্ধ দৃষ্টি নীলিমাও উপলব্ধি করতে পারে। আর সেই বোধ সাময়িকভাবে শীর্ণ শরীরেও রক্তের আভাস এনে দেয়। তাই বলা যায়, তাদের এই দৃষ্টিটাই হল প্রথম শুভদৃষ্টি। যার স্পর্শে গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করে নীলিমা। সে বলে –"আমি যদি মরে যেতাম, কী করতে তুমি?" বিভূতি জানায় –"মরে যাবে কেন?" স্বামীর উত্তরে পাতলা ঠোঁটে আবার একটু হাসি ফুটে ওঠে, সে বলে –"তুমি আর চলে যাবে না বলো, সব সময়ই থাকবে এখানে?" প্রত্যুত্তরে বিভূতি তার সরু লম্বা আঙুলগুলি আলগোছে রাখে নীলিমার ঠোঁটের উপর। সে যেন এই ক্ষীণ পাতলা হাসিটুকু আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চায়। সস্নেহে বলে – "সব সময়েই তো এখানে আছি নীলি"[৩৮] এই যে পরস্পরের চাওয়া-পাওয়া আবদার সেই সঙ্গে স্ত্রীকে সংক্ষিপ্ত নামে অর্থাৎ 'নীলি' বলে ডাকার মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতার দিকটাই আরও গভীরভাবে ধরা পড়ে। তাই আমরা দেখি, নীলিমা নিশ্চিন্তে চোখ বোজে। নিশ্চিন্ত এই কারণে যে সে অনুভব করে, তার স্বামী তাকে ও তার রোগকে আর কখনো ঘৃণা করবে না এবং তার কাছে না এসে থাকতে পারবে না। আসলে স্বামীর চোখের মুগ্ধতাই নীলিমাকে আশ্বস্ত করে এবং বেঁচে থাকার নতুন পথ দেখায়। অর্থাৎ বলা যায়, একদিন যে জটিল রোগ দুজন মানুষের মানসিক নৈকট্যে তথা মানবিক মিলনের অন্তরায় ছিল, সেই রোগই দুজন নর-নারীর পরস্পরের সত্তাকে অনুভব করবার সুযোগ করে দেয়। তাই দেখা যায় এই রোগশয্যাকে কেন্দ্র করে দুজন দম্পতি উভয়ের কাছে নতুনভাবে ধরা দিতে থাকে। এখন আর বিভূতিকে ডেকে বসাতে হয় না। সে নিজেই এসে স্ত্রীর খবর নেয়। আমরা আরও জানি, রোগগ্রস্ত মানুষ তার প্রিয় ও সবথেকে কাছের মানুষকে সর্বদা পাশে পেতে চায়। নীলিমাও তার ব্যতিক্রম নয়। সে স্বামীকে কাছে পেয়ে খুশিতে আবিষ্ট হয় এবং মনের সমস্ত কথা ও অনুভূতিকে মেলে ধরে। স্বামী বিভূতিও স্ত্রীর সেই আনন্দের মধ্যেই নিজের আনন্দ খুঁজে পেতে থাকে। তার মানসিকতা ও আচরণে পরিবর্তনও ধরা পড়ে এই ভাবে –"প্রথম প্রেমের দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে নতুন করে। সেই একটু ছোঁয়া, একটু কথা, একটু হাসি।

আর এই টুকরোগুলি জড়ো করে মনে মনে তা দিয়ে মালা গাঁথা...কি হয়েছে বিভূতির। নতুন এক নেশায় যেন পেয়ে বসেছে তাকে। অফিসে কোন রকমে ঘন্টা সাতেক কাটিয়ে আজকাল সে একেবারে সোজা চলে আসে নীলিমার কাছে। আড্ডা নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, সমস্ত পৃথিবী যেন ধরা দিয়েছে নীলিমার ঘরটুকুর মধ্যে। পরিসর তার কম, কিন্তু কী ঘন আর কী গভীর। আর প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন রঙ বে-রঙের ফুল কিনে নিয়ে আসে বিভূতি। রুক্ষ এলো চুলের মধ্যে গুঁজে দেয়, কয়েকটা বালিশের পাশে আর বিছানা ভরে ছিটিয়ে রাখে।"[৩৯] স্বামীর কাছে নিজের মূল্য তথা অবস্থান উপলব্ধি করে নীলিমা বিস্মিত ও আনন্দিত হয়। তাই সে জানায় –"মরে গেলে তো ভারি ঠকে যেতাম, তোমাকে এমন কাছে পেতাম কেমন করে?"[৪০]

অপরদিকে বিভূতি সেবা পরিচর্যা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু শিখে নিয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে তার মানসিকতা পরিবর্তনের ও পরস্পরের একাত্মতার মধ্য দিয়ে। শুধুমাত্র পরিচর্যা নয়, দেখা যায় – বিভূতি তার ডাক্তার বন্ধুদের কাছ থেকে ডাক্তারী বই এনে স্ত্রীরোগ সম্পর্কে জানতে থাকে ও তা সহজ সরল ভাষায় স্ত্রীকেও বুঝিয়ে দেয়। একটা সময় দেখা যায়, বিভূতির সাহচর্যে ও অনুপ্রেরণায় নীলিমা দ্রুত সেরে ওঠে। সে যেন নতুন প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হয়। এই নবপ্রাণশক্তি দিয়ে সে যেন পৃথিবীকে নতুন করে দেখে। শুধুমাত্র দেখা নয়, নতুন পৃথিবীর রূপ-রঙ-রসকে নীলিমা আস্বাদন করতে চায় স্বামীরই হাত ধরে। তাই তার মধ্যে এত উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসের জাগরণ ঘটে। সে ঔষধপত্র ও রোগশয্যা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নতুনভাবে সংসার সাজাতে চায়। দীর্ঘ রোগশয্যায় থেকে নিজের নানা চাহিদা থেকে নীলিমা যেমন বঞ্চিত থেকেছে তেমন স্বামীকেও বঞ্চিত করেছে। তাই সে দুজনের মধ্যস্থতায় সেই খামতি দূর করে জীবনের নানা মুহূর্তের ও নানা অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করতে চায় নতুনভাবে। তাই নীলিমা যখন নব উদ্যমে প্রস্তুত হয়েছে তখন স্ত্রীর এই আচরণ বিভূতির মনের আবার ভাবান্তর ঘটায়। তার মনের ভাব ফুটে ওঠে এইভাবে –"....তার এই হাসি উল্লাস অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয় বিভূতির কাছে। কী হাল্কা, কী ছেলেমানুষ হয়ে গেছে নীলিমা। কোথায় গেল অতল রহস্যময় কালো চোখের সেই করুণ প্রশান্ত দৃষ্টি ? কোথায় সেই অনুভূতিঘন গভীরতা ? সে মরে গেছে, সে নীলিমা আর নেই।"[৪১] স্বামীর প্রতি নীলিমার নির্ভরতা, আত্মসমর্পণের দিকটাই বিভূতিকে সবথেকে বেশী মুগ্ধ করে। স্ত্রীর অসহায়ত্ব ও করুণ জীবনরূপ স্বামীর আকর্ষণের মূল বিষয় ছিল। নিজ স্বভাব অনুযায়ী বিভূতি স্ত্রীর মধ্যে গভীরতা, স্থিরতা ও ধীরতাকে কামনা করে। তাই এই পর্যায়ে এসে স্ত্রীর উল্লাস-উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসকে তার বড় তরল এবং হালকা বলে মনে হয়।

এই স্তরে পুনরায় স্বামীর মনোজগতের পরিবর্তন সূচিত হয়। আর এই পরিবর্তনকে খানিকটা প্রভাবিত করে গল্পে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে অরুণদার ক্ষণিক উপস্থিতি। তাই দেখা যায় নীলিমা নিজেকে অলংকার ও প্রসাধনে সজ্জিত করে এনে স্বামীর হাতের ডাক্তারী বইখানি দূরে ফেলে দিয়ে তাকে টেনে তুলতে উদ্যত হয়, আর তাতেই বিভূতির সমস্ত মন অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। নীলিমার শোভন সংযত প্রকাশের অভাবে তাকে বিভূতির রীতিমত অশ্লীল বলে মনে হয়। নীলিমা নতুন স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও তার দিকে চেয়ে বিভূতির সর্বাঙ্গ ঘৃণায় ভরে ওঠে। তাই সে শুষ্ক কণ্ঠে বলে –"কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ নীলিমা, যাও এখান থেকে, তোমার যা খুশি কর গিয়ে"[৪২] এবারও স্বামীর পরিবর্তিত দৃষ্টিকে নীলিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সেই বোধই তাকে স্মরণ করায় – সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর বিভূতি তাকে আর উপহার এনে দেয়নি, উৎসাহ জাগায়নি। আত্মীয়-স্বজন সকলে তার নবজীবনের জন্য অভিনন্দন জানালেও বিভূতি তেমন কোন উৎসাহ দেখায়নি। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ও সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র হিসাবে স্বামীর কাছ থেকে এমন ব্যবহারে নীলিমা আহত হয়। তাই দগ্ধ হৃদয়ে পুনরায় স্বামীর কাছে এলে বিভূতির প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় এইভাবে –"বিরক্তিতে কপাল তার কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আবার? আবার এসেছ তুমি ইয়ারকি দিতে ? কিন্তু আমি তো আর তোমার মত নবজন্ম লাভ করিনি যে, উড়ে উড়ে বেড়াব প্রজাপতি সেজে। চিকিৎসা বাবদ অনেক দেনা হয়েছে বাজারে, সেগুলো শোধ দেওয়ার ভাবনা আমাকেই ভাবতে হবে। কিন্তু বলছি তো, তুমি যাও না, বেড়িয়ে এসোগে যেখান থেকে খুশি।"[৪৩] লক্ষণীয় বিষয় – গল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে বিভূতি রোগ ও রোগগ্রস্ত মানুষ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইত। কিন্তু এই স্তরে দেখা যায় সেই রোগ তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ জন্মে। এক্ষেত্রে বলা যায় – হয়ত সে এই বিজ্ঞানে নিজেকে কিছুটা দীক্ষিত করে তা উপার্জনের কাজে লাগাতে চেয়েছিল। অপরদিকে নীলিমার মধ্যে এই রোগশয্যার গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে পদার্পণ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর এই বৈপরীত্যই যে দুজনের মধ্যে পুনরায় মানসিক দূরত্ব সৃষ্টিতে সাহায্য করতে থাকবে তা খুব স্বাভাবিক। তাই স্বামীর আচরণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নীলিমার মনের বিষাদের তিক্ততা তারই কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই –"পাগল হয়েছ, তুমিও যেমন, কোথায় আবার যাব বেড়াতে। তার চেয়ে ওদের কাউকে বল বিছানাটা পেতে দিক, আবার শুয়ে পড়ি। তাক থেকে ওষুধের শিশিগুলো নামিয়ে আনো, আর তুমি এসে বস শিয়রের কাছে আগের মত ডাক্তারি বইটি নিয়ে। রোগশয্যাই যে আমাদের ফুলশয্যা। এ ছেড়ে যাবো আবার কোথায়। এই

দিব্যি করে বলছি তোমাকে, আমি আর কোনদিন উঠতে চাইব না।"[৪৪] স্ত্রীর এই গভীর অভিমান হয়ত পুনরায় নব-পর্যায়ে স্বামীকে কাছে আনতে সাহায্য করবে। দাম্পত্য সম্পর্ক যে কত বৈচিত্র্যে ভরা হতে পারে, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে শারীরিক ও মানসিক চাওয়া-পাওয়ায় যে কত ভিন্নতা তা গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র এমন সব গল্পকাহিনী নির্মাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

"চোর" গল্পটি ১৩৫১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন কাঠামোর অন্তর্গত দুজন দম্পতির মানবিক অবতরণ ও উত্তরণের বৈপরীত্য ঘটেছে। কিভাবে ঘটেছে সেই বিষয়টি গল্পের মুখ্য দিক। এটিই তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের ধারায় – বিশেষ কতগুলো রীতিনীতি, আদর্শবোধ ও মূল্যবোধ আছে। এগুলোর সমষ্টিতে তাদের জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। জীবন চলার পথে এই দর্শন বা বোধকে পাথেয় করে তারা এগিয়ে যায়। এমনকি উক্ত জীবনবোধ তথা মূল্যবোধ শুধুমাত্র একটি প্রজন্ম নয়, বংশপরম্পরা অনুযায়ী তা রক্তে রক্তে সঞ্চারিত হয়ে আছে। কাজেই কখনো যদি তাকে হারাতে হয় বা কখনো হারাতে বাধ্য হয় তখন সেই হারানো জীবনের ভিত্তিমূল আলোড়িত হয়। কেননা, এই বোধগুলিই তাদের অস্তিত্ব তথা মানবিক ও আত্মিক কাঠামোর স্মারক। এই মানবিক বোধের উত্থান-পতনের বৈপরীত্য স্রোতে আলোচ্য গল্পের চরিত্রগুলি নিমজ্জিত হয়েছে।

এই গল্পের দুটি চরিত্র হল – অমূল্য ও রেণু। তারা নব দম্পতি। তারা নিম্নবিত্তের পরিবার। গল্পে রেণুর চরিত্রটি মধ্যবিত্ত জীবন-ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা হয়েছে। কাজেই তার কাছে মান সম্মান ও আদর্শবোধের মূল্য অনেক বেশী। তাই তার ধারণা, তার স্বামীও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত সৎ ও আদর্শবান একজন মানুষ। অপরদিকে ঠিক বিপরীত আদলে গড়া অমূল্য চরিত্রটি। তার কাছে ন্যায়-নীতি বোধের গুরুত্ব কম। হাত সাফাইয়ের কাজে তার হাত পাকা। চরিত্রটির মধ্যে চৌর্যবৃত্তির এই স্বভাবটি এমনভাবে সম্পৃক্ত যে এই বিষয়টি নিয়ে তার কোন অনুশোচনা বা ভয় নেই, বরং এই কাজ সম্পর্কে মনে মনে গর্ববোধ করে। তবে অমূল্যের স্বভাবের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আর একটি দিক লক্ষণীয় – তা হল তার শৌখিনতাবোধ। প্রমাণ হিসাবে দেখা যায়, সে স্ত্রীর জন্য চুরি করে সাবান-স্নো, দামী চিরুনী যেমন এনেছে আবার কখনো ভেবেছে স্ত্রীকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাবে। যাই হোক, এই দুটি বিপরীত মনের মানুষ যখন দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করল তখন তাদের প্রচলিত ধারণাগুলি

কিন্তু ধাক্কা খেতে লাগল। স্ত্রী রেণুর কাছে স্বামীর স্বভাবের রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। সাবানের বাক্স আর এক কৌটো স্নো এনে অমূল্য যখন স্ত্রীর সামনে বার করে ধরে তখন রেণু হাতখানা বাড়িয়েই তাড়াতাড়ি আবার সরিয়ে নেয়। তার মনে হয় সে সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল। সরাসরি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল –"আজ আবার এসব এনেছ যে।"[৪৫] তীব্র দৃষ্টিতে রেণুর দিকে চেয়ে ক্রোধে ব্যঙ্গ মিশ্রিত অদ্ভুত হাস্যে অমূল্য ধমকে ওঠে –"এনেছি বাজারে বিক্রি করার জন্য।.... বলি জিনিসগুলো হাত থেকে নিতে পারবে কিনা ?"[৪৬] উত্তরে রেণু আস্তে আস্তে বলেছে –"হাতে করে তুমি যদি আনতে পেরে থাক, আমি নিতে পারব না কেন ?"[৪৭] লক্ষণীয়, উক্তিটিতে রেণুর মনে আক্ষেপের সুর স্পষ্ট। মধ্যবিত্তের মতো সংস্কারবোধ থেকে স্বামীর এই আচরণ স্বাভাবিকভাবে তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সে স্বামীর ভালোবাসা চায় ঠিকই কিন্তু স্বভাব নষ্টের বিনিময়ে নয়। তাই অসৎ উপায়ে অর্জন করে স্বামীর দেওয়া এই উপহারগুলি তার মনের কষ্টকে আরও যেন বাড়িয়ে তোলে। অপরদিকে অমূল্য চায়, সে স্ত্রীকে যে উপহার এনে দেবে স্ত্রী তা সাদরে গ্রহণ করবে। উপহার কীভাবে, কোথা থেকে এনেছে এই কৈফিয়ৎ সে চাইবে না। আসলে দুটি চরিত্রই নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেকে বিচার করেছে। আর সেই বিষয়টি দুজনের মনে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। ফলে তারা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ আছে ঠিকই, কিন্তু কেউ কারও মনকে স্পর্শ করতে পারেনি।

স্ত্রীর মননবোধের সঙ্গে স্বামীর অবনমনবোধের দ্বন্দ্ব এই পর্যায়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবে স্ত্রী রেণু স্বামীর এই স্বভাবকে বদলাতে চেয়েছিল। তাই শান্ত কণ্ঠে স্বামীকে বুঝিয়ে বলেছিল – "দেখ তোমার ভালোর জন্যই বলি, না হলে আমার আর কি, একদিন যদি হাতে নাতে ধরা পড়ে যাও তখন দশা হবে কি, তখন মান থাকবে কোথায় ?"[৪৮] অমূল্য অটুট আত্মপ্রত্যয়ে বলে –"ক্ষেপেছ! তেমন কাঁচা হাত আমার নয়।"[৪৯] দেখা যাচ্ছে, মান-সম্মান বড় বিষয় নয় অমূল্যর কাছে; সে যে পাকা চোর তাই নিয়ে আত্মগর্বে মগ্ন। আর এই বিষয়টিই রেণুর মনকে ছোট করে দেয়। অমূল্যের নিজ স্বভাবের বড়াই করা দেখে রেণুর যেন মরে যেতে ইচ্ছে করে।ট্রামে উঠে টিকিট না কাটায় রেণু যখন প্রতিবাদ করে, তখন প্রত্যুত্তরে অমূল্য জানায় –"বিয়ে করায় বড্ড খরচ। দু-চার পয়সাও যদি এভাবে পুষিয়ে না নেওয়া যায় তাহলে কি করে চলে বল।"[৫০] আবার অমূল্য রেণুর জন্য একখানা দামী চিরুনী আনলে রেণু সেটি খুশি মনে নেয় এবং এইরূপ চিরুনী বৌদিকে দেওয়ার ইচ্ছা থেকে আনন্দিত হয়ে, সে চিরুনীটির দাম জিজ্ঞাসা করে। তৎক্ষণাৎ অমূল্যের ভাবমূর্তির পরিবর্তন ঘটে। ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর দেয় –"আর ন্যাকামি কর না, মেয়েদের

ন্যাকামি কখনো ভালো লাগে, তাই বলে কি সবসময় সহ্য হয় ? ....পয়সা লাগেনি হাত সাফাইতে এসেছে।"[৫১] বাস্তববাদী অমূল্য স্ত্রীর এই অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়, আসলে সে আশা করে তার স্ত্রী বিষয়গুলিকে স্বাভাবিকভাবে নেবে এবং তাই নয় তার এই কাজে তার যথার্থ সহধর্মিণী হবে অর্থাৎ এবিষয়ে অমূল্যকে সে বরং সাহায্য করবে। তাই গোবিন্দবাবুর বাড়িতে যেহেতু রেণু যায় কাজেই সেখান থেকে নানা জিনিস সুযোগ বুঝে সে যেন তুলে আনে, এই পরামর্শই অমূল্য স্ত্রীকে দেয়। উক্ত প্রস্তাবে রেণুর মন ক্ষুব্ধ ও আত্মগ্লানিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার মনে আক্ষেপের সুর স্পষ্ট হয় –"নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কান্না পায় রেণুর। শেষ পর্যন্ত এমন লোকের হাতেই পড়তে হল তাকে। আর শুধু হাতে নয়, আজীবন এই লোকটির সঙ্গেই তাকে বাস করতে হবে, হাসতে হবে, আদর সোহাগ করতে হবে। তারপর ছেলে হবে, মেয়ে হবে। কিন্তু কিছুতেই অমূল্যের প্রবৃত্তি আর বদলানো যাবে না।....কেউ জানবে না রেণু অন্য প্রকৃতির মেয়ে, এসব সহ্য করতেই পারে না। কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে ? সবাই জানবে অমূল্য যেমন ছিঁচকে চোর, রেণু তেমনি চোরের বৌ।"[৫২] এই আত্মোপলব্ধিতে অন্ধকারে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে ঘৃণায় রেণুর যেন সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত হয়ে আসে। তার মনে জাগে, এমন একটি লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে যার মন ছোট, প্রবৃত্তি ছোট। আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক এমন এক গভীর সম্পর্ক যেখানে দুটি মানুষ পরস্পরের মন ও শরীরকে স্পর্শ করে আরও কাছে আসে ও একাত্মায় লীন হয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পের দম্পতি শরীরকেই স্পর্শ করছে, মনের সন্ধান পায়নি। তাই বাইরে থেকে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মনহীন এই সম্পর্ক যান্ত্রিক সম্পর্কেরই জন্ম দেয় – যা ক্ষণস্থায়ী এবং যার থেকে শুভ কিছু আশা করা যায় না। 'চোর' গল্পটিতে এই পর্যন্ত দেখা যায় দুটি মনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-নিরাশার থেকে চারিত্রিক সততা-অসততার দ্বন্দ্বই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গল্পটি লেখা হয় চল্লিশের দশকের প্রেক্ষাপটে। এই সময় মানুষ জীবন জিজ্ঞসার সম্মুখীন। অস্তিত্বের লড়াইয়ে তারা সর্বদা ব্যস্ত। যার ফলস্বরূপ মানুষের মানবিক মূল্যবোধের মৃত্যু ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গল্পের অমূল্য চরিত্রটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হয়ত আর্থিক অসচ্ছলতা ও বাঁচার তাগিদের টানাপোড়েনে অমূল্যের চরিত্রে এই চৌর্যবৃত্তির স্বভাব যুক্ত হয়েছে। কাজেই ন্যায়-অন্যায় বোধ তার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে রেণুর চরিত্র যেভাবে আঁকা হয়েছে তাতে সে হয়তো আর্থিক অসচ্ছলতায় মানুষ হয়েছে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে চরম-বাস্তবতার সম্মুখীন হয়নি। দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে সে দারিদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে যখন নিজের

স্বামীর চাকরিটি চলে যায়। আবার বলা যায়, হয়তো স্বামীর প্রতিনিয়ত এইরকম স্বভাব-ব্যবহার, মান-সম্মান সম্পর্কে উদাসীনতা ধীরে ধীরে স্ত্রী রেণুর মানসিকতার পরিবর্তন আনে। আদর্শবোধের জায়গা তার কাছে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে থাকে। তাই স্বামীর চৌর্যবৃত্তির সম্ভাব্য এই দুটি কারণ তার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তন অমূল্যের চোখেও ধরা পড়েছে। কেননা, একদিন একটি দামী ফাউন্টেন পেন স্ত্রীর সম্মুখে তুলে ধরে অমূল্য অপেক্ষা করছিল এই বুঝি রেণু তাকে তিরস্কার করবে। কিন্তু তা না করে রেণু তার নিজ কাজে মন দেয়। এই বিষয়টিতে অমূল্যের খট্‌কা লাগে এবং তার মনের কোণে কেমন একটু খোঁচা লাগে।

এখান থেকেই স্ত্রী চরিত্রটির পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ নেয় যখন রেণু গোবিন্দবাবুর বাসা থেকে তার হাতঘড়িটি সত্যি সত্যি চুরি করে আনে। এবং এই কৃতকর্মের অনুভূতি প্রকাশ হয়েছে এইভাবে –"রেণু যখন কোন রকমে নিজের ঘরে এসে পৌঁছাল, তখন অদ্ভুত উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। এমন আনন্দের স্বাদ অভূতপূর্ব। আর একবার ছোট্ট ঘড়িটা আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে দেখল রেণু। পুরুষের প্রথম স্পর্শও কি এত তীব্র, এমন রোমাঞ্চকর"[৫৩] লক্ষণীয় বিষয় – রেণুর এই পরিবর্তন যেন অমূল্যের স্বভাবের যথার্থ প্রতিবাদ ও পরিহাস স্বরূপ।

প্রেক্ষাপট এবারও একই। সেই রাতের নিরিবিলিতে স্বামী-স্ত্রী যখন কাছে এসেছে তখন রেণু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছোট্ট ঘড়িটা স্বামীর হাতের মণিবন্ধে বেঁধে দিয়ে বলে – "দেখি তো কেমন মানাচ্ছে।"[৫৪] এক্ষেত্রে কার্যাবলী, আচরণ একই, শুধুমাত্র চরিত্রের বদল ঘটেছে। আজ রেণুর কোন কুন্ঠা নেই, লজ্জা নেই, দীনতা নেই, সে যেন পৃথিবী জয় করে ফিরেছে। আজ অমূল্যেরও সবচেয়ে খুশি হওয়ার দিন; কেননা, সে তো এই প্রত্যাশা করেছিল যে স্বভাব-ব্যবহারে স্ত্রী তার যথার্থ সহধর্মিণী হবে। কিন্তু অমূল্য স্ত্রীর কোমল বাহু বন্ধনের মধ্যে কাঠ হয়ে রইল। আসলে স্ত্রীর এই মানবিক অবনমন বোধের মুহূর্তটি তার মনন বোধের উত্তরণ ঘটিয়েছে। তার মনের গভীরে যে সুপ্ত মূল্যবোধের মাহাত্ম্য ছিল তার স্ফূরণ ঘটায় উক্ত ঘটনাটি। কাজেই অমূল্য অনুভব করে –"পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির পরিচিত দুখানি হাত তার কন্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কন-ক্বণিত মৃণালভুজ নয় – আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।"[৫৫]

গল্পের ট্র্যাজেডি এখানেই। স্ত্রীর সংস্কারাচ্ছন্ন মনের সঙ্গে স্বামীর অবনমন রূপের দ্বন্দ্ব তাদের দাম্পত্য জীবনকে প্রাথমিক পর্যায়ে একভাবে প্রভাবিত করেছে, ঠিক বিপরীত ক্ষেত্রে

আবার স্বামীর মননবোধের উত্তরণের বৈপরীত্যে স্ত্রীর মনের অবনমণের যে টানাপোড়েন তা তাদের পরবর্তী দাম্পত্য জীবনকে আর একভাবে প্রভাবিত করবে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মনলোক যেমন উত্তরণ ও অবতরণে আবর্তিত হয়েছে সেই সঙ্গে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কও নানা রূপে আবর্তিত হয়েছে এবং হবে।

"স্বখাত" গল্পটি ১৩৫১ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে 'অলকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা-৩' এর অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি দাম্পত্য-সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি একটি ভিন্ন মাত্রার গল্প, যেখানে দুজন দম্পতি নয়, তৃতীয় এক ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে এই তিনজন মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গল্পটিতে একটি পুরুষ মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে। "স্বখাত" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল - "নিজের খোঁড়া কোন জলাশয়''। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, মানুষের মন বড় অদ্ভুত। আমরা প্রতিটি মানুষই হয়ত নিজেদের মনকে বুঝে উঠতে পারি না। এই 'মন' যেমন কোন আইন-কানুন, রীতিনীতি মানতে চায় না, তেমনি কোন বাধা-নিষেধের গণ্ডিকেও বুঝতে চায় না। সে আপন খেয়ালে চলে। এভাবে চলতে চলতে নতুন অভিজ্ঞতায় মানুষটি নতুন রূপে, নতুনভাবে নিজেকে চিনতে, জানতে সক্ষম হয়। এই আত্মোপলব্ধি মানুষের সারাজীবনই চলতে থাকে। তেমনই এক বিশেষ মুহূর্ত ধরা আছে এই গল্পটিতে।

আলোচ্য গল্পে প্রধান চরিত্র তিনটি। রমেন ও মাধুরী দুজন দম্পতি, আর ভবতোষ রমেনের বন্ধু। তিনজনের মানসিকতা তিন রকমের। পরিবারের সকলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ভবতোষের উপর। অথচ সেই অনুযায়ী তার আর্থিক সচ্ছলতা নেই। তার উপর যুদ্ধের বাজারে চাকরি পাওয়ার অনিশ্চয়তা। অপছন্দ হলেও যে চাকরি সে করছে তা ছাড়বার উপায় নেই। জীবনের এই টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে ভবতোষের সম্বল শুধু মুখের কথা। হেঁয়ালির ছোঁয়ায় ও কথার মায়াজালে ভবতোষ এই বাস্তব জীবনের কঠোরতাকে প্রলেপ দেয় এবং নিজেকে ভুলায়। এই প্রসঙ্গে তার নিজের বক্তব্য – "বিশেষত জীবনটা যখন এত কাঠখোট্টা এত নীরস, একেবারে জলের মত পরিষ্কার আর জলের মত পানসে, তখন মাঝে মাঝে চেষ্টা করে যদি একটু দুর্বোধ্য হেঁয়ালির ছোঁয়াচ তাতে লাগাতে পারা যায় মন্দ কি, আর তো কিছু করবার শক্তি নেই, কোন দিক থেকেই জীবনটাকে একটু মোড় ফেরানো যায় না; কেবল যত ইচ্ছা যত খুশি বানানো যায় কথা, আর সেই মনগড়া কথা দিয়ে কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া যে জীবনকে সে জগৎকে

কিছুতেই গড়ে নেওয়া গেল না।"[৫৬]

অপরদিকে, এর ঠিক বিপরীত ধারার মানুষ রমেন। আর্থিক দীনতা তার জীবনে নেই, তথাপি তার দুঃখের শেষ নেই। কারণ, আর পাঁচটা সাধারণ পুরুষের মত সেও চেয়েছিল তার স্ত্রী রূপ ও গুণ সমন্বিত একজন নারী হবে। কিন্তু তা হয়নি, বাবার কথা রক্ষার্থে সে একজন কুৎসিত ও প্রায় নিরক্ষর মেয়েকে বিয়ে করেছে; এখানেই তার ক্ষোভ ও অশান্তির কারণ নিহিত। অর্ধশিক্ষিত সাধারণ বাঙালী মেয়ের পতিত্ব বন্ধু-সমাজে তাকে পতিত করে রেখেছে। আর বন্ধুরা বিষয়টি নিয়ে ঠাট্টা করে আরও বেশি ক্ষেপিয়ে তোলে। সকলের নেতিবাচক কথাবার্তা রমেনের দুর্বলতাকে যত বৃদ্ধি করেছে রমেন তত ক্রোধ-ক্ষোভ ও অসহায় অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। রমেনের হয়ে ভবতোষ বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। তাই ভবতোষ মনে মনে হাসে আর ভাবে –"আসলে স্ত্রীর শিক্ষা এবং রূপ তো স্বজনবন্ধুদের কাছে আত্মমর্যাদা বাড়াবার জন্যেই। দামী ঘড়ির মত, রুচিসম্মত আসবাবের মত, স্ত্রীও যদি বন্ধুদের সপ্রশংস ঈর্ষা জাগাতে না পারল তবে আর তার সার্থকতা কি;"[৫৭]

গল্পের তৃতীয় চরিত্র রমেনের স্ত্রী মাধুরী। শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে সে স্থূল মানসিকতার অধিকারিণী। তবে তার স্থূল মনেও স্বামীর অশান্তির কারণ ধরা পড়েছে। সে জানে তাকে তার স্বামীর পছন্দ হয় নি। আর এই বিষয়টিকে তার বন্ধুরাই তাকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাই কোন বন্ধুর সামনে মাধুরীর আর বের হতে ইচ্ছা করে না। তারা যেন কেবল যাচাই করবার জন্য আসে – তার কতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি ও কতটুকু রূপ। মাধুরী মনে মনে ভাবে –"বিয়ের চার-পাঁচ বছর আগে থাকতে এই যে যাচাই বাছাই আরম্ভ হয়েছে এর যেন শেষ নেই। ভেবেছিল বিয়ে হয়ে গেলে আর এসবের বালাই থাকবে না। কিন্তু ব্যাপারটা ইদানিং যেন আরো বেড়েছে। স্বামীর নিত্য নতুন বন্ধু আসবে আর তাদের সামনে ওজন করে করে কথা বলতে হবে। জবাবটা একটু কাঁচা হয়ে গেলেই স্বামীর মান যায়, মন পাওয়া যায় না।"[৫৮] এই রকম এক পরিস্থিতিতে রমেন একদিন স্পষ্টই বলেছিল –"মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও শেখনি।"[৫৯] মাধুরী তার আর মনের ক্ষোভকে চেপে রাখতে পারেনি; সেও ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিয়েছিল –"না শিখিনি তো, তার হবে কি, আমি লেখাপড়া শিখিনি, দেখতে ভালো না একথা তো সব বন্ধুকেই তুমি বলে দিয়েছ, তবে আর তোমার লজ্জা কিসের ? এতই বলেছ আর একটু বাড়িয়ে বলতে পারলে না আমার বউ বোবা, একেবারেই কথা বলতে পারে না। তাহলে তুমিও বাঁচতে আমিও বাঁচতুম।"[৬০] মাধুরীর এরকম কথার ঝাঁঝে রমেন যেন তখনকার মত নিজেই বোবা হয়ে যায়। এইভাবে যখন তাদের

দাম্পত্য জীবনের অসুখীর কারণ পরস্পরের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে এবং তাদের সম্পর্ক ক্রমশ সংকটাপন্ন হয়। আর এই দূরত্ব ও সংকটকে দূর করতেই ভবতোষ জেনে শুনেই তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়।

রমেনের স্ত্রীকে দেখার পর রমেনের ক্ষোভ ও গ্লানির যথেষ্ট কারণ আছে তা ভবতোষ অনুমান করে, তবে সে মুখে ঠিক বিপরীত কথাই বলল – "চমৎকার মেয়ে, আমার তো বেশ লাগল"[৬১] এতদিন রমেন তার অন্যান্য বন্ধুদের কাছে এর বিপরীত কথাই শুনে এসেছে। এই প্রথম ভবতোষের কাছে সে অন্য কথা শুনছে। তাতে যেন তার মনের শক্তি কিছুটা ফিরে এসেছে। ভবতোষের সান্ত্বনা বাক্যকেই রমেন সত্যি বলে মনে করেছে এবং সে যেন এমন কথাই আরও ভবতোষের কাছ থেকে শুনতে চায়। রমেন যেন আশ্রয় খুঁজে পায়। তার মন চায় – মনের সমস্ত কষ্টকে ভবতোষের সামনে উন্মুক্ত করতে। তাই রমেন এই সমর্থনকে জোরালো করতেই ভবতোষকে উজ্জ্বল মুখে বলে –"তুমি ঠাট্টা করছ....কিন্তু ওর মধ্যে কী এমন দেখতে পেলে বল তো ?"[৬২] বন্ধুর মনে আনন্দের আমেজ লেগেছে দেখে ভবতোষ মনে মনে হাসে আর জবাব দেয় – "সে যদি আমার দুটো চোখ তোমাকে ধার দিতে পারতাম তাহলে বুঝতে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়, তাই আমি এক মুহূর্তে যা দেখলাম জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে একটু একটু ক'রে তোমাকে তাই দেখতে হবে"[৬৩] আসলে ভবতোষের মিথ্যা কথার মায়াজালে রমেন যত আকৃষ্ট হয়েছে ভবতোষ যেন আরও বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই রকম হেঁয়ালী রচনায়। এ যেন এক খেলায় মেতেছে ভবতোষ। রমেনের মন নিয়ে খেলা। যত এই খেলা এগিয়ে গিয়েছে তত ভবতোষের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। সাধারণ আটপৌরে স্ত্রীকে প্রেয়সী বানিয়ে তুলতে হবে বন্ধুর কাছে এটাই তার মূল লক্ষ। তাই এখন অবসর পেলেই সে রমেন ও মাধুরীর মধ্যে উপস্থিত হয়। হাসি ঠাট্টা, থিয়েটার দেখানো – নানা রকমের পরিকল্পনা গড়ার মূলে ভবতোষ। আর এইভাবেই ধীরে ধীরে রমেন ও মাধুরী পরস্পরের কাছে আসতে থাকে। রমেনের মনের বিতৃষ্ণা দূর হয়ে যায়, স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধতার দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। নিজের শক্তির পরিচয় পেয়ে ভবতোষ নিজেই বিস্ময়বোধ করে। নিত্য দুঃখ দারিদ্র সমন্বিত বাস্তবজীবন-জগতের মানুষ ভবতোষ। তার জীবনে ভাবালুতার কোন জায়গা নেই। কিন্তু প্রয়োজন হলে সেও যে এমন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারে তা তার নিজেরও জানা ছিল না। মাধুরী সম্পর্কে তার বাছা বাছা চমকপ্রদ বিশেষণগুলিতে রমেন খুশি হয়। চাপা লজ্জায় আর আনন্দে মাধুরীর শ্রীহীন, সৌন্দর্যহীন ভোঁতা মুখও সুন্দর দেখায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি খুশি হয় ভবতোষ

নিজে। এক একটি ধারালো শব্দ তার মুখ থেকে খসে পড়ে আর তার ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পৃথিবী যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে। এ যেন ভবতোষের নব রূপে নিজেকে আবিষ্কার করা। অপরদিকে রমেনের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সে বাহ্যিক রূপ নয়, স্ত্রীর মনের সৌন্দর্যকে খুঁজে পায়। ফলে তারা তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিষাদময় প্রাথমিক পর্যায়কে অতিক্রম করে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। রমেন ও মাধুরী এখন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ে উভয়ের দ্বারা মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত। আর এই বিষয়টি মাধুরীর মনেও ভাবান্তর আনে। তা ভবতোষও লক্ষ না করে পারল না। মনে তার প্রশ্ন জাগে –"এই রূপহীনা অর্ধশিক্ষিত মেয়েটি আত্মপ্রত্যয়ে এমন দৃঢ় হল কি করে ?"[৬৪]

শুধুমাত্র মাধুরী নয়, রমেনও পরিবর্তিত হয়েছে। তা যাচাই করতে গিয়ে মাধুরীর চেহারা সম্পর্কে ভবতোষ নেতিবাচক কথা বললে উত্তরে রমেন জানায়, –"সত্যি ভবতোষ, হলো কি তোমার, পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি ?"[৬৫] রমেনের কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। ভবতোষ উপলব্ধি করে – তাদের মাঝখানে তার নিজের আর কোন প্রয়োজন নেই। এবার বিদায় নেবার পালা এসেছে তার। সেও সত্যি সত্যি বিদায় নিতে চায়। কিন্তু বিদায় বেলায় ভবতোষ অনুভব করে – কখন যেন সেও রমেন ও মাধুরীর দাম্পত্যজীবন বলয়ে জড়িয়ে গেছে। সে চাইলেও সেখান থেকে সরে যেতে পারছে না। তার পরিবর্তনের পরিচয় সে যখন পায় তখন নিজের বোন মাধুরীর চেহারা সম্পর্কে মুখ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে নিন্দা করে। তখন ভবতোষের মনে হয় –".....কিন্তু আজ নীলিমার এই মুখ বাঁকানো তীরের ফলার মত গিয়ে তার হৃদয়ে ঢুকল। অথচ কথাটি তো সত্যি। প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই মাধুরীর মধ্যে। আর এই না থাকায় কিছুমাত্র ক্ষতিও নেই ভবতোষের। তবু একটু তীব্র বেদনায় মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।"[৬৬] যাই হোক, ভবতোষ সত্যই রমেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু দেখা যায় নানা ভাবনার তালে তালে কখন যেন সে আবার রমেনদের সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ছাদের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। আসলে এ আসা কেবল পুনরায় রমেনদের বাড়িতে আসা নয়। তাদের দুজনের মাঝখানে আসা বা আসার জন্য মনের প্রত্যাশা জাগা। কিছুতেই সেই গন্ডি থেকে ভবতোষের মন আর প্রস্থান চায় না। রমেনের সঙ্গে ভবতোষের বাহ্যিক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়েছে বন্ধুর ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সম্পর্ক কিন্তু তার অন্তরালে বাহিত হয়েছে ছলনা ও মিথ্যা স্তুতি প্রদানের এক রূপ। ভবতোষ একদিকে খুশি হয়েছে; কেননা, সে তার লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পেরেছে। অপরদিকে তার হৃদয় ব্যাথিত হয়েছে এই ভেবে যে, তার কথায় মাধুরী কেবল পৃথিবীর এই একটি মাত্র কুরূপা মেয়ের দেহাধার ছাড়া কিছুতেই অন্য কোন রূপ খুঁজে পেল না। এই অবনমণই যেন তার মনের গ্লানি। মানব মনের বিচিত্র রূপের মধ্যে এটিও আর একটি দিক যা গল্পের এই চরিত্রটির মাধ্যমে প্রকট হয়েছে।

১৩৫২ বঙ্গাব্দে 'বসুমতী' পত্রিকায় বার্ষিক সংখ্যায় **'সেতার'** গল্পটি প্রকাশিত হয়। এটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা-১' এর অন্তর্গত। সমাজ-সংসারে থাকতে হলে দেখা যায় পরিস্থিতির পরিবর্তনের তালে তালে জীবনে নানা সুখ-দুঃখের ঢেউ উত্থিত হয়, যা মানব হৃদয়কে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবিত হৃদয়ের টানাপোড়েনকে পাথেয় করে 'মন' আবার নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় ও নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। এইভাবে অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে জীবন এগিয়ে চলে। আলোচ্য গল্পে দাম্পত্য জীবনের অন্তর্গত এমনই এক নারীর জীবনবোধ ও মানসিক টানাপোড়েনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নারীটির মনে যে দ্বন্দ্ব ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে সেই বিষয়টি এই গল্পের মুখ্য দিক।

গল্পের প্রেক্ষাপটে আছে প্রাচীন ভাবনায় আচ্ছন্ন এক মধ্যবিত্ত পরিবার। সেই পরিবারের পুত্রবধূ নীলিমা। সে এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র। কাহিনীর সূচনাতে দেখা যায়, এই অসচ্ছল পরিবারের প্রধান অবলম্বন পুত্র সুবিমল থাইসিসে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন হাসপাতালে ভর্তি আছে। এমত অবস্থায় সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় স্ত্রী নীলিমার উপর। স্ত্রী হিসাবে, পুত্রবধূ হিসাবে সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার সময় সে জীবনে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, যা তার মনোলোককে প্রভাবিত করে। তথাপি সে নিজ সত্তা নয়, প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু অন্তর্লোকে ঐ দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েন তাকে যে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে, তা প্রকাশ্যে আসে নি, অকথিত-ই রয়ে গেছে। কেমন এই না-বলা দিকটির স্বরূপ, তা জানতে হলে আমাদের কাহিনীতে প্রবেশ করতে হবে।

গল্পে দেখা যায়, বিমল টানা দু'ই বছর রোগাক্রান্ত। তার চিকিৎসা বাবদ খরচ মেটাতে সংসারে যে সামান্য কিছু গহনা, আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ছিল তা বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়েছে। বৃদ্ধ শ্বশুরের সামান্য চাকরিতে সংসারের সমস্ত সদস্যদের জন্য দুবেলা অন্ন সংস্থান করা দায়। এই পরিস্থিতিতে নীলিমাকেই এগিয়ে আসতে হয়। ছোটবেলায় শেখা সামান্য সঙ্গীত বিদ্যাকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে হয়। কিন্তু সেখানেও নানা বাধা বিঘ্ন। এই রক্ষণশীল পরিবারের অভিভাবক হিসাবে শ্বশুর-শাশুড়ি বিয়ের পর মাত্র কয়েকটি মাসের জন্য পুত্রবধূকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা দিতে দেয় নি। ছেলের বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে গান শেখানোর বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিতে পারে নি। তাদের সংস্কারে বেঁধেছে। তাই বিমলের বাবা কালীমোহনবাবু আমতা আমতা করলেন এবং বললেন – "লোকে কি বলবে।"[৬৭] এই মানসিকতার প্রতিফলনে নীলিমার মনের প্রতিক্রিয়া এইভাবে ধরা পড়েছে – "অতি দুঃখে নীলিমার হাসি পেল। স্বামী, শ্বশুর-

শাশুড়ি সকলের মনে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই বিপদের আশঙ্কা। অভাব-অনটন সমস্ত সংসারকে গিলে ধরেছে কিন্তু স্থির আছে সেই অবিশ্বাস, সেই কুটিল সংশয় প্রবণতা"[৬৮] পরিবার বাধ্য হয়ে অনুমতি দিলেও নীলিমার সঙ্গে তার দেবরকে পাঠানো হল।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আর এক অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়। ছাত্রীর বাড়িতে নীলিমা ভূমিকা হিসাবে দুখানা গান গাইল, কিন্তু তেমন জমল না বরং তাল কেটে গেল দু-এক জায়গায়। তাতে রায় সাহেব ভ্রু কুঁচকালেন। রেখা ননদের দোষ চাপা দিতে বলে উঠল – "অনেক দিন ধরে চর্চা নেই কিনা।"[৬৯] বিষয়টিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে এবং সমর্থনের সুরে বাড়ির গিন্নী জানায় – চর্চা না থাকাটাই স্বাভাবিক। স্বামী যার অসুস্থ তার মনের অবস্থা সুস্থ থাকে না। আর তাছাড়া সংসারের বৃদ্ধ শ্বশুরের অর্থে সমস্তটা মেটে না, তাই নীলিমার এই সাহায্য গৃহবধূ হিসাবে আদর্শ কর্তব্য। নিজের সম্পর্কে অন্যের মনে ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নীলিমার কাছে। তার আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। তথাপি কোন প্রতিক্রিয়া নয়, শুধুমাত্র প্রয়োজনকে সিদ্ধি করাই তার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু। কিন্তু মনোগহ্বর যে আন্দোলিত হয়ে ওঠে – "নীলিমার গুণের চেয়ে, তার প্রয়োজন, স্বামীর অসুস্থতায় অর্থ সাহায্যের কথাই যে ওঁরা বেশী করে বিবেচনা ক'রেছেন একথা নীলিমাও বুঝল, ওঁরাও বুঝিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লেও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু বিঁধতে লাগল নীলিমার।"[৭০] এখানেই শেষ নয়, ফেরার পথে রেখা উপদেশ দিল – "গান বাজনাটা তোমাকে আরও একটু ভালো করে চর্চা করতে হবে ভাই।"[৭১] আসলে গরীব বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করে ওস্তাদ রেখে গান বাজনা শেখার সুযোগ তার কোনদিন হয়নি। রেকর্ড শুনে শুনে তার বিদ্যার্জন হয়। পরবর্তী সময়ে ভালো করে শেখার বাসনা মনে মনে ছিল। কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল, গান-বাজনা শ্বশুর-শাশুড়ি পছন্দ করে না, এমনকি, স্বামীরও এতে আগ্রহ কম। তাই শেখার বাসনাটা নীলিমার ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ যখন সময় হল তখন শখে নয়, আনন্দে নয়, প্রয়োজন ও পেশার তাগিদে পুনরায় চর্চা করা। যাই হোক, বাড়িতে চর্চা তাকে করতে হবে। কাজেই সংসারের সমস্ত কাজ সেরে সে চর্চা করতে বসলে পাশে ননদরা ভিড় করে। আর তাতে শাশুড়ির প্রতিক্রিয়া –"কি যে তোরা আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা করিস, তোরাই জানিস। এত স্ফূর্তি যে তোদের কি দেখে আসে তাই ভাবি। বাছা আমার হাসপাতালে ভুগছে আর বাড়িতে তোরা দিব্যি গান-বাজনায় আনন্দ-সোহাগে দিন কাটাচ্ছিস। যে শোনে সেইতো অবাক হয়ে যায়।"[৭২] এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নীরব যন্ত্রণায়, বেদনায় নীলিমা স্তব্ধ হয়ে যায়। অসহায়তা এবং নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করে। তবে তা সে মনের গভীরেই সযত্নে

রাখে বাইরের সম্পর্কে তা প্রতিফলিত হতে দেয় না। এই অবস্থায় দেওয়ালে টাঙানো স্বামীর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে সে মনের মধ্যে পুনরায় শক্তিকে উজ্জীবিত করে।

দেখা যায়, নীলিমার জীবনে একবার সেতার শেখার সুযোগ আসে। সেও এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চায়; কারণ এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। কেননা, শুধুমাত্র স্বামীর চিকিৎসা করা নয়, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাকে চেঞ্জে নিয়ে যেতে আরও অর্থ প্রয়োজন। তাই সে একজন গুরুর কাছে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করে। কিন্তু তাতেও নীলিমার ধৈর্য নেই। গুরুর প্রতি তার প্রশ্ন থাকে – আর কতদিন লাগবে শিখতে, কতদিনে অন্তত কাজ চালানোর মতো বিদ্যেটা তার আয়ত্তে আসবে। টাকা রোজগার করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীকে শিখিয়ে। এই উক্তির উত্তরে গুরুমহাশয় স্মিত হেসে জবাব দেয় – "যা আনন্দের জিনিস তাকে তুমি এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনে লাগাতে চাইছ।"[৭৩] নীলিমা এই তিরস্কারে চুপ করে থাকে। এই অবস্থায় এখন তার আর দুঃখ অনুভূত হয় না। অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। সেও জানে সঙ্গীত চর্চা তথা শিল্পচর্চা আনন্দের বিষয় এবং এর উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি ও সুখানুভূতি সঞ্চারিত করা, এই বিষয় সমস্তরকম প্রয়োজন ও চাহিদার উর্দ্ধে। কিন্তু সেই সত্যকে মেনে নেওয়ার মত পরিস্থিতি নীলিমার নেই। প্রয়োজনকে মেটানোই তার জীবনের একমাত্র ও প্রধান প্রয়োজন।

তাই লক্ষ করা যায়, প্রথম প্রথম স্বামীর রোগের কথা শুনে লোকে তাকে অনুকম্পা করে টাকা দিয়ে, সহানুভূতি দেখিয়েছে। এই কার্যকলাপে তার হৃদয়কে যে ক্ষতবিক্ষত করত না, এমন নয়। আসলে সেও তো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তারও নিজস্ব একটা সত্তা আছে। কিন্তু পরিস্থিতি মানুষের মনের অনুভূতিকে লুপ্ত করে, অসাড় করে। তাই ধীরে ধীরে এই আত্মহীনতা তার অভ্যেস হয়ে যায়। যেখানে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব তার জুটত না, নৈপুণ্যের অভাব দেখে লোকে তাকে তুচ্ছ করত, অনাদর করত, সে সব জায়গায় নীলিমাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে তাদের স্মরণ করিয়ে দিত, বিদ্যায় তার দীনতা থাকলে কি হবে, অন্তরে সে সমৃদ্ধ। কেননা, সে টাকা তুলছে দুঃস্থ যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত স্বামীর জন্য, নিঃস্ব অর্ধভুক্ত পরিবারের জন্য। তাতেও টাকা আসত; ফলে নিজের শিল্পকুশলতার অভাবের জন্য ক্ষোভ এবং গ্লানিও তখন কম হয়ে যেত। তবে তার দগ্ধ হৃদয়কেও মাঝে মাঝে গুণগুণ করে গাওয়া গানের কলি দোলায়িত করত। তখন মনে হত এর সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। এর কাছে সমস্ত কর্তব্য, সকল উদ্দেশ্য মিথ্যা। কিন্তু মনের এই অনুভূতিকে সে বেশীক্ষণ প্রশ্রয় দিত না। কেননা, তা দায়িত্ব কর্তব্য পালনের পথে বাধা স্বরূপ।

তবে নীলিমার এই দুঃখে জরাজীর্ণ কন্টকময় একঘেয়েমী যান্ত্রিক জীবনেও আমন্ত্রণের

পত্র নিয়ে কলকাতার একদল ছেলে নীলিমার কাছে আসে। তারা রঙমহল থিয়েটার হল ভাড়া নিয়ে এক জলসার আয়োজন করেছে। টাকাটা যাবে বন্যাপীড়িত দুর্গত সেবার তহবিলে। শহরের বড় বড় শিল্পীরা আসবে, তাদের সঙ্গে নীলিমারও ডাক পড়েছে। প্রথমে নীলিমা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। সে আনন্দে আত্মহারা। এতদিন ছিল শুধুমাত্র তার প্রয়োজন। এবং মানুষও তার পরিবেশনকে প্রয়োজনের দৃষ্টিতেই দেখেছে, শিল্পী হিসাবে নয়। কিন্তু এই প্রথম প্রয়োজন নয়, নিজ সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ এসেছে নীলিমার জীবনে। সেও প্রমাণ করতে পারবে – সেও একজন শিল্পী। শিল্পগুণের পরিচয়ে সে সকলের কাছে পরিচিত হবে। কোনরকম অনুকম্পার, সহানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে নয়। যার মাধ্যমে সে এত দিনের আত্মহীনতা, গ্লানিকে মুছে ফেলতে পারবে। এবং প্রতিষ্ঠিত করবে আত্মমর্যাদাকে। সেই উদ্দেশ্যে সে এক হাতে ঘরকন্নার ফাঁকে ফাঁকে সেতারে তুলতে লাগল তার সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত, তার শিল্পকুশলতার চরম নৈপুণ্য। কাল জগৎ তার যথার্থ পরিচয় পাবে – সে দীন নয়, ছোট নয়, অকৃতার্থ নয়। এদিকে এতদিন বাদে আরোগ্য লাভ করে সুবিমল কাল বাড়িতে আসছে। পরের দিন সেই সময় এল, নীলিমার মনও চঞ্চল হতে লাগল, সমস্ত প্রস্তুতি যখন শেষ, তখন নীলিমার সঙ্গে সুবিমলের কথোপকথনের মাধ্যমে সুবিমল জানতে পারে নীলিমা বাইরে যেতে চায় – এর পরিপ্রেক্ষিতে সুবিমল বলে - "তবে কি জলসা-টলসা গোছের কিছু নাকি ? তারও আর দরকার নেই। তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনেছে নীলিমা বাঈজীর ভূতপূর্ব স্বামী ফিরে এসেছে যমের দুয়ার থেকে, যমের হাত থেকে যমদণ্ড কেড়ে নিয়ে আজ কেবল একটি মাত্র জলসা হবে, কেবল তোমাতে-আমাতে।"[৭৪] এমনিভাবেই বোধহয় মানুষ, বিশেষত পুরুষেরা নিয়তি রূপে নারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এইভাবেই নারীর আত্মজাগরণে ইচ্ছাশক্তির বা প্রচেষ্টার মৃত্যু ঘটে। তাই বাধ্য হয়ে নীলিমা সেতার বাজাতে থাকে। এবং একসময় চমকে ওঠে নীলিমা। কানে যায় তার সদর দরজায় কড়া নাড়বার আওয়াজ। সেই দিকে সে কিছুক্ষণ কান পেতে থাকে – "নিজের সেতারের বাজনার চেয়েও যেন মধুর আর অপূর্ব ঐ কড়ানাড়ার নিক্কণ।"[৭৫] এখানেই গল্পের ট্র্যাজেডি। হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টাকে নিজের হাতেই গলা টিপে মারে নীলিমা বা বলা যায়, জীবন সংসারে নীলিমাদের মত মেয়েরা এই ভাবেই আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়। সেই নীরব মৃত্যুর না-বলা যন্ত্রণা সেতারের বাজনার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর অন্তর্গত নারী হৃদয়ের যন্ত্রণা এইভাবেই যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি সেভাবে পুরুষের চোখে ধরা পড়ে না। একজন স্ত্রী খাঁচায় বদ্ধ একটি পাখির

মত। তার পক্ষে সম্পর্ককে ছিন্ন করে, খুব সহজে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাইরে সম্পর্কের সেই লৌকিকতা, সামাজিকতা সবই চলে কিন্তু সেই সম্পর্কের যে সত্যিকারের আবেগ বা তার প্রতি শ্রদ্ধা মনে কি আর থাকে বা থাকা সম্ভব ? কিন্তু সেই বিকৃত মানসিকতা নিয়েও সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে যেতে হয় মানুষকে।

"পুনশ্চ" গল্পটি ১৩৫২ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে 'বসুমতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা-২' এর অন্তর্ভুক্ত। বিচিত্র সম্পর্ককে পাথেয় করে একটি মানব জীবন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। মানুষ যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে, এমনকি, মৃত্যুর পরও তার সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কের গিঁট বাঁধা ও গিঁট ছেঁড়ার আবর্তমানতা বর্তমান থাকে। দাম্পত্য সম্পর্কও তার ব্যতিক্রম নয়।

দাম্পত্য সম্পর্ক সমাজ স্বীকৃত একটি প্রধান সম্পর্ক। এই দাম্পত্য জীবন বলয়ে ছোট-বড় সব রকমের সুখ-দুঃখের কথা দুটি মনের গভীরেই উত্থিত হয়। আর সেই উত্থিত ঢেউ যেমন দুটি মনের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে, তেমনি আবার দুটি মনের দূরত্বকে ঘুচিয়ে একাত্ম করে তোলে। আলোচ্য গল্পে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সম্পর্ক তার নাম পরিবর্তন করে এবং সেই পরিবর্তিত সম্পর্কে আবার নানা জোয়ার-ভাঁটা পরিলক্ষিত হয়।

গল্পটি মুসলমান সম্প্রদায়ের দুটি নর-নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। দুটি মানুষের জীবনে তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। এই তিনটি পর্যায়ে তিন রকমের সম্পর্ক বর্তমান। প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বিবাহ-পরবর্তী একটি সম্পর্ক। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বিবাহ-পরবর্তী দাম্পত্য সম্পর্ক, তৃতীয় পর্যায়ে আছে দাম্পত্য সম্পর্কেরই দ্বিতীয়ভাগ। এই তিনটি পর্যায়ে দুটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে তার রূপকে পরিবর্তন করে চলেছে তাই আমাদের দেখার বিষয়।

কাহিনীর প্রাথমিক পর্যায়ে পাওয়া যায় – জৈনুদ্দিন ও ফতেমা পরস্পরে দেওর ও বৌদির সম্পর্কে আবদ্ধ, যে সম্পর্কের মূলে আছে রসিকতা। এই সম্পর্কের বন্ধনের মহিমা আমরা প্রাচীনযুগ থেকেই পরিলক্ষিত করে থাকি। তবে এই সম্পর্কের রসিকতা যখন সুস্থ স্বাভাবিক রূপকে অতিক্রম করে তখন সম্পর্কটি বিশুদ্ধ বা সুস্থ অবস্থায় আর থাকে না। তা সামাজিক পরিভাষায় 'পরকীয়া' সম্পর্ক নামে পরিচিত হয়।

জৈনুদ্দিনের দাদা মৈনুদ্দিন ফতেমাকে যেদিন বিয়ে করে এনেছিল সেই দিন থেকেই তার উপর জৈনুদ্দিনের চোখ পড়েছিল। মেটে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে ফতেমা যখন জল নিয়ে

ফিরত তখন আড় চোখে তাকে অনুসরণ করতে করতে আসত। শুধুমাত্র তাই নয়, ঢেঁকিতে যখন ধান ভানত ফতেমা, বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই চোখ তার চঞ্চল ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকত। আসলে জৈনুদ্দিনের এই দৃষ্টিতে ছিল প্রবল যৌনতৃষ্ণা। শুধুমাত্র নীরব দৃষ্টি নয়, আড়ালে আবডালে ফতেমাকে পেলে জৈনুদ্দিন ভাষা দিয়েও তার দৃষ্টির ব্যাখ্যা করে বলেছে –"ভাবী সাব, আমার চোখে ভারী সুন্দর লাগে তোমাকে।"[৭৬] বিষয়টি ফতেমা উপভোগ করলেও, প্রকাশ্যে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে –"খবরটা তোমার মিঞা ভাইকে একবার দিয়ে দেখব।"[৭৭] তাদের সম্পর্কটা যে আর ঠাট্টা-রসিকতায় সীমাবদ্ধ নেই তা প্রকাশ্যে আসে ফতেমার স্বামীর মৃত্যুর পর তার নিকা করাকে কেন্দ্র করে। এই সময় জৈনুদ্দিন তার মনের কথাও স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করে বলে –"ভাবীসাব, মিঞা ভাই তো ফাঁকি দিয়েই গেল। খোদার ইচ্ছার ওপর তো মানুষের আর জোর থাকে না! জোর জুলুম মানুষের আপন জনের ওপরেই চলে।"[৭৮] ফতেমাও জৈনুদ্দিনের আবেদনকে মনে স্থান দেয় কতগুলি যুক্তির মাধ্যমে – "কেবল ঠাট্টা ইয়ার্কি নয়। সাময়িক ইচ্ছাপূরণ নয়। জৈনুদ্দিন সঙ্গতভাবে নিজে যেচে তাকে বিয়ে করতে চাইছে। এই অনুরাগকে সন্দেহ করা যায় না, এই ভালোবাসার ওপর সারাজীবন নির্ভর ক'রে থাকতে সাধ যায়। এমন আপনজন ক'জন মেলে সংসারে ?"[৭৯] এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে ফতেমা জৈনুদ্দিনের 'কামনা-বাসনা'কে ভালোবাসা বলে মেনে নিয়েছে। কাজেই উভয়ের মানসিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার সুপ্ত পরকীয়া সম্পর্কটি পরিণতি পায়। দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তারা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। আর এখান থেকেই তাদের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব সূচিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্ববর্তী সম্পর্ক যখন দাম্পত্য সম্পর্কে পরিণত হল তখন তাদের মধ্যে সম্পর্কের রূপরেখা ঠিক কেমন হবে তা যেন লেখক একটা পরীক্ষা করেছেন এই গল্পে। এই পর্যায়ে দেখা যায়, জৈনুদ্দিনের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে ফতেমা। কেননা জৈনুদ্দিনের প্রথম স্ত্রী ও সন্তান বর্তমান ছিল। যাই হোক, ফতেমা জৈনুদ্দিনের জীবনে একই আকাঙ্ক্ষা ছিল এতদিন। কাজেই নিকা করার পর তাকে যখন সম্পূর্ণ নিজের বলে পেয়েছে তখন যেন জৈনুদ্দিন নতুন নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। ফতেমার জীবনে উত্তাল তরঙ্গ বয়ে এনেছে জৈনুদ্দিন। নিত্য-নতুন করে আদর জানাবার কায়দা। নিত্য-নতুন নামে ভালোবাসা জানায়। ফতেমা যেন নবজন্ম লাভ করেছে। আর এই জায়গা থেকেই স্বাভাবিক ভাবে তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে বর্তমান স্বামীর এক তুলনা মনের কোণে ভিড় করে। তার মনে জাগে – এত কথা কোনদিন মুখচোরা মৈনুদ্দিনের মুখে আসত না। মনের গভীরে এই তুলনা যত স্পষ্ট হয় তত যেন ফতেমা

আত্মতৃপ্তিতে পুলকিত হয়। তাই তার স্বামী যে একমাত্র তাকেই ভালোবাসে এই আত্মবিশ্বাস থেকে ফতেমা তার সতীনকে দয়া করে এবং জৈনুদ্দিনকে বলে –"হয়েছে, হয়েছে, এবার ছোট বিবির ঘরে যাও দেখি একটু।"[৮০] কিন্তু কোন অনুভূতি বোধহয় এক ধারায় চলতে পারে না। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের মাধ্যমে মানসিক অবস্থারও বদল ঘটে। ফতেমাকে পাওয়ার পর জৈনুদ্দিনের যে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা ছিল ধীরে ধীরে তা শিথিল হয়ে আসে। আকর্ষণে ভাটার টান অনুভূত হয়। আসলে বাধাহীন, স্থূল যৌন জীবনে তখন একঘেয়েমী স্থান করে নিয়েছে। সমস্ত রহস্য যেন লুপ্ত হয়েছে। তার উপর পরিবেশ-পরিস্থিতি অন্তরায় হয়েছে। এক ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে জৈনুদ্দিন সর্বস্বান্ত হয়। সেই সঙ্গে যুদ্ধের বাজারে আর্থিক অনটন নিত্য সঙ্গী। এই পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকাটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই প্রয়োজনই একমাত্র প্রধান। এই দু ই কারণেই ফতেমার প্রতি জৈনুদ্দিনের পূর্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তার উপর জৈনু দ্দিন প্রমাণ পায় – ফতেমার তুলনায় তার প্রথম স্ত্রী অনেক বেশি কর্মে পটু। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদে প্রথম স্ত্রী বেশি গুরুত্ব পাবার যোগ্য। তাছাড়া সে জৈনুদ্দিনের বিয়ে করা স্ত্রী, বজলু তার নিজের সন্তান। তাই প্রথম স্ত্রী সাকিনার জন্য মাজন আসে। তার ছেলের জন্য আখ আর বাতাসা আসে। জৈনুদ্দিন জানে দুধেল গাইকে খোল জাব বেশি খাওয়াতে হয়। এবার ফতেমা ছট্‌ফট্‌ করে, কিন্তু সাকিনা কিছুমাত্র ভাগ দেয় না।

পরবর্তী সময়ে তাদের জীবনে নেমে আসে মন্বন্তরের অভিশাপ। বাড়িতে হাঁড়ি না চড়লেও চেয়ে চিন্তে যেখান থেকে যা পায় সব সাকিনা ও তার ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ায় জৈনুদ্দিন। অথচ শুকিয়ে শুকিয়ে ফতেমা অস্থিসার হয়, নড়ে বসবার শক্তি থাকে না, তথাপি জৈনু দ্দিনের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফতেমার অভিযোগ –"একি তোমার ব্যবহার মিঞা ? পায়ে ধরে চৌদ্দবার ক'রে সিধে নিকা করেছিলে মনে নেই ?"[৮১] প্রতিক্রিয়ায় জৈনুদ্দিন জবাব দেয় –"না নেই। কিন্তু এখন পায়ে ধরেই বলছি রেহাই দে, রেহাই দে আমাকে। মিঞাভাইকে খেয়েছিস, আমাকে আর খাসনে। গাঁয়ে আরো তো মুসলমান আছে তাদের কারো ঘরে যা।"[৮২] স্বামীর এই মানসিক পরিবর্তন ফতেমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। মনের দূরত্ব ত্বরান্বিত করে। ফলে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অভিমুখটি পরিবর্তিত হতে থাকে। এতদিন ধরে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটি বয়ে চলছিল এই পরিস্থিতিতে এসে সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত হল।

কাহিনীর তৃতীয় পর্যায়ে আর্থিক অনটন ফতেমাকে শহরের কোলে পৌঁছে দেয় এবং বাজারে নামতে বাধ্য করে। অপরদিকে জৈনুদ্দিন কলেরার প্রকোপে তার প্রথম স্ত্রী ও সন্তানকে

হারায়। আশ্চর্য সম্পর্কের বন্ধনের মহিমা। ঘটনাক্রমে আর্থিক সংকট জৈনুদ্দিনকেও শহরে এনে উপস্থিত করে এবং লোকের জন্য মেয়েমানুষ খোঁজার তাগিদে ফতেমার মুখোমুখি দাঁড়ায়। ফতেমা ভেবেছিল জৈনুদ্দিন নিজের জন্য কাকুতি-মিনতি করে তার কাছে আসতে চায়। কিন্তু যখন সে শুনল – অন্যের জন্য সুপারিশ করতে এসেছে জৈনুদ্দিন, তখন ফতেমা ভিতরে ভিতরে একেবারে ভেঙে পড়ে। তা থেকেই জৈনুদ্দিনের প্রতি তার তীব্র ক্ষোভ ও অভিমান জন্ম নেয়। যাই হোক, ব্যবসায় উভয়ের লাভের জন্যই ইতিমধ্যে বেশ একটু নতুন ধরণের অন্তরঙ্গতা জন্মেছে তাদের মধ্যে। আসলে ফতেমা ও জৈনুদ্দিন উভয়েই তো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। বাহ্যিক ভাবে ব্যবসায়িক লাভ ক্ষতি থাকলেও অন্তরালে যে মানবিক টানাপোড়েন পর্বটি চলতেই থাকে। তাই ফতেমার মনে প্রশ্ন জাগে –"কেবল ক্ষতির ভয়েই কি জৈনুদ্দিন কোন গোসা করে না, অভিমান করে না, হিংসা করে না ? ক্ষতির ভয় কি মানুষকে এমন পাথর করে ফেলে ?..... সেজেগুজে বেরুলে তাকে নাকি ঠিক কলেজে পড়া মেয়েদের মত দেখায়। কিন্তু জৈনুদ্দিন তাকে ছোঁয় না। জৈনুদ্দিন তাকে ঘৃণা করে। এতখানি ঘৃণা করার অধিকার কোথায় পেল সে, জৈনুদ্দিন কি তার চেয়ে কম পাপী।"[৮৩] প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজের অন্তরকেই ফতেমা জর্জর করে তোলে। ক্ষুব্ধ হৃদয় কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। আসলে ফতেমার মনে জৈনুদ্দিনের প্রতি তীব্র ঘৃণার বিপরীতে প্রবল আকর্ষণ বোধ কাজ করে। এই বিষয়টিই তাকে অস্থির করে তোলে। তাই জৈনুদ্দিন আর একটি লোকের কথা জানালে ফতেমা ম্লান মুখে জানায় যে তার মাথা ধরেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জৈনুদ্দিন তাকে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকার প্রস্তাব দেয়। এই কথায় ফতেমা অন্তরঙ্গতার সুর খুঁজে পায়। সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে পুরোনো দিনের কথা। একদিন ফতেমার মাথা ধরায় কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল জৈনুদ্দিন। কিন্তু আজ কত উদাসীন। তাই হঠাৎ ফতেমা একেবারে চেঁচিয়ে উঠল –"হয়েছে হয়েছে। অত সোহাগে আর দরকার নেই আমার। ভারী দরদ দেখাতে এসেছে, দরদ যে কিসের জন্য তা কি বুঝি না ? ভয় নেই, মাথা ধরায়, মরে যাব না, কালই উঠতে পারব। কালই আনতে পারবে তোমার লোক।"[৮৪] এই কথায় জৈনুদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আগের জৈনুদ্দিন আর নেই। নেই যৌবনের সেই উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা। জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে শান্ত ও গম্ভীর করে তুলেছে।

শহরের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে জৈনুদ্দিন সন্তানসহ এক সুখী দম্পতিকে দেখে। এই দৃশ্য তার মনে ভাবান্তর ঘটায়। জৈনুদ্দিন ফিরে এসে দেখে ফতেমা তারই দেওয়া গোলাপ গুঁজে, গায়ে আতর মেখে সুন্দর করে সেজেছে। এক অপরূপা নারী হিসাবে ধরা দেয় ফতেমা

জৈনুদ্দিনের চোখে। ধীরে ধীরে কাছে এসে ফতেমার হাতে পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে জৈনুদ্দিন তার হাতখানা মুঠির ভিতরে চেপে ধরে বলল –"সে যদি আজ নাই আসে, তোমার কি খুব মন পোড়াবে বরুবিবি ?"[৮৫] ফতেমা জৈনুদ্দিনের মনের ভাব উপলব্ধি করতে পেরেছে। এতদিন তো ভিতরে ভিতরে সে এই চেয়েছিল। চেয়েছিল তারা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হোক। তাই নোটখানা পুনরায় জৈনুদ্দিনের পকেটেই গুঁজে দিলে জৈনুদ্দিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল –"কম হল নাকি ? আরো চাই তোমার ?" উত্তরে ফতেমা অপূর্ব ভঙ্গিতে হাসল –"চাই না। খরচ কত তার খেয়াল আছে মিঞার ? এত কাণ্ডর পর মোল্লা-মুনসীদের মুখ কি আর দু-পাঁচ টাকায় বন্ধ হবে ভেবেছ ?"[৮৬] ফতেমার এই উক্তিতে পুনরায় নিকা করার কথা ধরা পড়ে। ধরা পড়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলার ইঙ্গিত। এবার অর্থ নয়, উগ্র কামনা নয়, সূক্ষ্ম হৃদয় বৃত্তেরই জয়গান সূচিত হয়েছে। প্রয়োজন নয়, দুটো মানুষের মানবিক টানাপোড়েন, উত্থিত অধিকারবোধ, ভালোবাসা-ই এবার প্রাধান্য লাভ করেছে। একদিন আর্থিক সংকট তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। আজ সেই অর্থই তাদেরকে আবার কাছে এনে দিল। তবে এবার 'অর্থ' অনুঘটক মাত্র। তাদের পুরোনো সম্পর্কটি যেন নানা বাঁকে বাঁকে বয়ে এসে 'পুনশ্চ' তার পুরোনো গতিপথ খুঁজে পায় এবং নবরূপে নব ফল্গুধারায় বাহিত হয়।

"কুলপী বরফ" গল্পটি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে 'লেখন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি গল্পকারের 'গল্পমালা-২' এ অন্তর্গত। গল্পটি দাম্পত্য-সম্পর্কের অন্তর্গত হলেও স্ত্রীর সঙ্গে তৃতীয় এক ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন তা-ই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কুলপী বরফকে কেন্দ্র করে দুজন নর-নারীর মানসিক নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা এক বিশেষ মাধুর্যের রঙে রঙিন হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু আবার সেই কুলপী বরফকে ঘিরেই নারীটির মানসিকতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কাজেই তাদের মধ্যে নব-সৃষ্ট সম্পর্কটিও তার অভিমুখের পরিবর্তন করে। এই দুটি নর-নারীর বিপরীত অনুভূতির জাগরণ ও তার টানাপোড়েন-ই আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়।

কাহিনীতে পাওয়া যায়, মনোহর ও নির্মলা দুজন স্বামী-স্ত্রী। তাদের সংসার নির্ভেজাল ও স্বাভাবিক। রুটিনমাফিক সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে ধীরে ধীরে নিজেদের সংসারের শ্রী দান করছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় জীবন-সংসারে প্রতিটি মানুষ প্রত্যেকের থেকে আলাদা। প্রত্যেকের মানসিক গঠন আলাদা। তবু সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে

নিজেদের চাহিদা, অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং সামাজিক কাঠামোকে সু-শৃঙ্খল করতে মানুষ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখকে ভাগ করে নিয়ে জীবনচক্র রচনা করে। ফলে সেই জীবনচক্রে সম-অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত আবেগের ঢেউও উত্থিত হয়। তাতে প্রতিটি মানুষের যেমন আত্মোপলব্ধি ঘটে তেমনি তার বিপরীত মানুষগুলির সেই সময়ের আবেগ অনুভূতিও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই জীবন-অভিজ্ঞতা সারাটা জীবন ধরে চলে। মানুষই তো একক ও এককেন্দ্রিক; তাই তার ভাবনাগুলো নিজের নিজের এবং সেই ভাবনা দিয়েই অন্যকে যাচাই করে থাকে বা সেই ভাবনায় অন্যকে নিজের করে পেতে চায়। আর তখনই বিভ্রান্তি ঘটে।

নির্মলার রুচি ও মানসিকতাও ভিন্ন। মধ্যবিত্তের সংস্কার ও মূল্যবোধের আবরণে তার চরিত্রটি গঠিত। কাজেই তার কাছে মান-সম্মান, আভিজাত্যের মর্যাদা অনেক বড় বিষয়। শুধু তাই নয়, কর্মের ক্ষেত্রে কোন্‌টি ভদ্রলোকের যোগ্য কোন্‌টি অযোগ্য তার একটি মাপকাঠির ছক নির্মলার মনের মধ্যে আছে। সে জানে তারা যে কুলপী বরফের ব্যবসা পেতেছে তা ভদ্রোচিত জীবিকা নয়। তাই এই জীবিকার বিষয়টি বাপের বাড়ির তরফের দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছে নির্মলা অনেক কষ্টে অনেক কৌশলে গোপন রেখেছে। সে এও জানে বাবা বেঁচে থাকলে এমন সম্বন্ধ তার হত না। দেনায় ডুবুডুবু দাদা যে তাকে পাত্রস্থ করতে পেরেছে এই তো যথেষ্ট। যাই হোক, নির্মলা নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে স্বামীর সহধর্মিণী হিসাবে সহযোগিনী হয়েছে এবং তার সংকোচটা ধীরে ধীরে অভ্যাসের নীচে চাপা পড়েছে। অপর দিকে মনোহর স্থূল রুচিসম্পন্ন বাস্তববাদী সহজ সরল মানুষ। তার কাছে জীবিকার ছোট-বড় নিয়ে কোন সংকোচ নেই, অর্থ উপার্জনটাই আসল। একটা উক্তিতে তার মনোভাব স্পষ্ট হয় – "ঈস লজ্জার বহর দেখ। যাতে ভাত জুটছে, কাপড় জুটছে, তার নাম করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে পড়ে, অপমান বোধ হয়!"[৮৭] মনোহর যাই ভাবুক না কেন, নির্মলার তাতে কিছু আসে যায় না; শুধুমাত্র বাইরের লোকের কাছে এই তথ্যটুকু না জানালেই হল। তাই উচ্চশিক্ষিত, চাকুরে এক দূর সম্পর্কের দেওর নীরদের কাছে মনোহর যেন জীবিকার কথাটি চেপে রাখে, নির্মলা স্বামীকে এই অনুরোধ করেছিল। এবং প্রসঙ্গক্রমে জীবিকার কথা উঠলে যেন বলে এলাকার কোন অফিসে কাজ করে। কিন্তু মনোহর তার স্বভাব মত সমস্ত কিছুই নীরদের কাছে মেলে ধরে। শুধু তাই নয়, নির্মলা কিভাবে তাকে সাহায্য করে তার সমস্ত বৃত্তান্তই দেয় এবং জীবিকা ও সেই থেকে উন্নতি লাভের বিষয় নিয়ে ভাইয়ের কাছে বরং গর্ব প্রকাশ করেছে।

এই দুই মানসিকতার দম্পতির জীবনে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে নীরদ প্রবেশ করল। নীরদের সঙ্গে নির্মলার একটা সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। নীরদের কাছে জীবিকার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গেলেও নীরদ তা নিয়ে কোন নাক কোচ্‌কায়নি; এটাই নির্মলার মনের সংকোচ দূর করতে সাহায্য করেছিল। শুধু তাই নয়, নির্মলাই যে একাজে সাহায্য করে তা জানতে পেরে নীরদের যেন নির্মলার শিল্পগুণ সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে যায়। আসলে নীরদ নির্মলার সংকোচের কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই বিষয়টিকে সে আরও গুরুত্ব দিয়ে নির্মলাকে অনুপ্রাণিত করেছে এই ভাবে – "ভিতরে ভিতরে যে এত গুণ আছে আপনার সে সব আমার কাছে গোপন করে যাবেন ভেবেছিলেন না ?... এমন কুলপী বরফ নাকি এ অঞ্চলে আর কেউ তৈরী করতে পারে না। আর এত বড় কথাই আপনি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছিলেন, কিন্তু আজ আপনার হাতের কুলপী বরফ না খেয়ে এক পাও নড়ছি না, হাজার জরুরী কাজ থাকলেও না।"[৮৮] এখানেই ক্ষান্ত হয়নি নীরদ। সে নির্মলার কাছে এই বিদ্যাটি শিখে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। নির্মলা আত্মগর্বে ও আনন্দে উল্লসিত। সে নব-উদ্যমে বরফ কুচোয়, দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর তৈরী করে; তারপর দ্রুত হাতে সেই ক্ষীর ছোট ছোট টিনের চোঙগুলির মধ্যে ভরে শেষে ময়দা দিয়ে আটকে দেয় চোঙের মুখ। যেন অসংখ্য রহস্যের টুকরোকে রাখে আড়াল করে। আর না তাকিয়ে অনুভব করে যে নীরদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার হাতের কাজ দেখছে। বরফের খাবার তৈরী করতে করতে অদ্ভুত এক আনন্দ মনের মধ্যে নির্মলা অনুভব করে, যেন সত্যই এক দুরূহ কলাকৌশলময় শিল্প সৃষ্টিতে সে হাত দিয়েছে। আর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে নীরদের অনুভব – "খাটো ঘোমটার ফাঁকে চাপা হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানি ভারি সুন্দর লাগল নীরদের। এমন ঘরে এমন মুখ সত্যি অপ্রত্যাশিত।"[৮৯] নীরদ আরও প্রশংসা-বাণ ছোঁড়ে। আসলে কুলপী বরফ নয়, নির্মলার সান্নিধ্য ও দর্শন ছিল নীরদের মূল লক্ষ্য। নীরদের কথায় নির্মলা উচ্ছ্বসিত। তার তৈরী জিনিসে যাতে নিত্য নতুন স্বাদ আসে ও উৎকর্ষতা বাড়ে তাতে মাথা খাটিয়ে রোজ নতুন নতুন ধরণ সে আবিষ্কার করল। সেই সঙ্গে নীরদ এই বাড়িতে যাতায়াতের পরিমাণ যেমন বাড়াতে লাগল তেমন প্রশংসার ভাষাও বাড়াল। আর তাতেই নির্মলার মনে হয় – "প্রশংসা নির্মলা আরো অনেক শুনেছে। বাজার ভরে সমস্ত লোকেই তার হাতের তৈরী জিনিসের তারিফ করে। কিন্তু নীরদের প্রশংসার ভাষা আলাদা। সে কেবল জিনিসের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হয়নি, হাতের গুণগানও করেছে।.... একমাত্র নীরদের মুখেই নির্মলা শুনল নতুন সুর, নতুন ভাষা। যা ছিল নিতান্তই গুরুভার প্রয়োজনের বস্তু, দৈনন্দিন জীবিকার পক্ষে অপরিহার্য, তাকে নীরদ যেন নতুন

রূপ দিয়ে গেছে। সে কেবল নির্মলার গুণপনার রূপ। নীরদের হাসি পরিহাসে মিশে নির্মলার কুলপী বরফ যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে, হয়ে উঠেছে নতুন রকমের সামগ্রী।"[৯০]

অন্যদিকে, ব্যবসায়ে প্রচুর লাভের দিকে তাকিয়ে মনোহরও প্রশংসা করেছে এইভাবে – "ঈস্, দু'হাতের বদলে হাত যদি তোর চারখানা হ'ত নির্মলা, চার মাসের মধ্যে পাকা বাড়ি তুলে ফেলতুম।"[৯১] আসলে স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন মনোহর ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে নির্মলার শিল্পগুণকে বিচার করেছে। তার কাছে ব্যবসার 'লাভ' টাই মূল লক্ষ, নির্মলার হাতের গুণ নয়। নির্মলা কথাটি শুনে আহত হয়। সে চুপ করে থেকে বলে – "কিন্তু তা যখন হবার জো নেই আর একটি দু'হাতওয়ালা বউই বরং নিয়ে এসো ঘরে।" উত্তরে মনোহর জানায় – "উঁহু তাতে সুবিধা হবে না সে রকম চার হাতে কেবল হাতাহাতি হবে, কুলপী বরফ তৈরী হবে না।" নির্মলার মনে হয় – "যেন হাতাহাতি হবার ভয় না থাকলে মনোহরের তাতে কোন আপত্তি থাকত না।"[৯২] মনোহরের মানসিকতা ও কথা বলার ভাষা শুনে স্বাভাবিকভাবে নির্মলার মনে স্বামীর সঙ্গে নীরদের তুলনা মনে জাগে। মনোহরের এমন মানসিকতা, নীরদের প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট হতে নির্মলাকে সাহায্য করেছিল। ফলে আড়ালে আড়ালে নীরদের সঙ্গে নির্মলার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। তাদের মাঝখানে কুলপী বরফ যে অনুঘটকের কাজ করেছিল, ধীরে ধীরে তার অবসান হয়। নীরদ ও নির্মলার আলাপের বিষয় বরফকে অতিক্রম করে ব্যক্তিগত গণ্ডীতে প্রবেশ করেছে। দেওর-বৌদির যে রসিকতার সম্পর্ক তার সীমা লঙ্ঘন করে তাদের সম্পর্ক এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে। নীরদ যে কি চায় তা আকার ইঙ্গিতে নির্মলাকে বুঝিয়েছে। কথা বলার ভঙ্গিটা নীরদের জটিল কিন্তু ইঙ্গিতটা নির্মলার বুঝতে বাকি থাকেনি। শব্দের অর্থ সর্বদা বোধগম্য নাই হতে পারে কিন্তু তার ধ্বনির ব্যঞ্জনা নির্মলার জানা। কলকাতা যাওয়ার প্রসঙ্গে একবার নির্মলা তার স্বামীর মনোভাবের কথা নীরদের কাছে জানিয়ে বলে – নির্মলা যদি কলকাতায় যায় তবে তার মাথা ঘুরে যাবে, সে আর এই ছোট্ট শহরে ফিরে আসতে চাইবে না। একথা শুনে নীরদের বুকের ভিতরটা একটু যেন কেমন করে উঠল; মৃদু কম্পিত গলায় বলল – "আচ্ছা সে দেখা যাবে। না ফিরতে চান নাই চাইবেন।"[৯৩] একজন পুরুষ একটি নারীর প্রতি স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হয় ও সান্নিধ্য চায়। নীরদও নির্মলার কাছে তাই চেয়েছিল। মানসিক দিক দিয়ে তারা পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে উভয়েই যৌনাকাঙ্ক্ষী। এই সম্পর্কের এই পর্যায়টুকু গল্পের প্রাথমিক পর্বে রচিত হয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মনোহরের মনে তাদেরকে নিয়ে কোন জটিলতা তৈরী হয় নি। বরং অন্য এক অনুভূতি তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে – "নীরদ যে

নির্মলার রূপগুণের প্রশংসা করেছে, ক্রমশ বাধ্য হয়ে উঠছে তার, এতে মনোহর এক ধরণের গর্বই অনুভব করছিল মনে মনে। এমনকি, সমব্যবসায়ী দু'একজনের কাছে এ কথা সে বলেওছে। নির্মলা যে সত্যিই খুব দামী মেয়ে একথা নীরদের মত উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত রুচি, ভদ্র সমাজের ছেলের মুখে শুনলে স্ত্রীর সম্বন্ধে অহংকারের ভিত্তিটা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।"[৯৪] শুধু তাই নয়, মনোহরের মনে হয় – নিজের ঔৎসুক্যে ও আগ্রহে নীরদ যেন তাদের ব্যবসাকে নতুন মূল্য দিয়েছে, গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে তার আর নির্মলার। আসলে গল্পে মনোহর উপলক্ষ মাত্র। লেখকের মূল লক্ষ্য অপর দুটি চরিত্র। মনের কোন্ অনুভূতি দুটি মানুষকে কীভাবে কাছে আনে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের রূপরেখা কি দাঁড়ায়। আবার কোন্ পরিস্থিতিতে মনের আবেগ-অনুভূতির পরিবর্তন ঘটে যার ফল পূর্ব সম্পর্কে কেমন প্রভাব ফেলে তাই মুখ্য হয়ে উঠেছে গল্পে। গল্পের দ্বিতীয় পর্বে আছে পট পরিবর্তন। সেখানেই এই গল্পের মূল নির্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

সম্পর্কের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ দু-ই অধিকারে নীরদ নির্মলাকে কলকাতায় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। নীরদের মনের চাহিদা একটি বিষয়ে স্পষ্ট হয় – নির্মলা যখন সিনেমার পর্দায় দৃশ্যে মগ্ন তখন পাতলা অন্ধকারে নির্মলার অস্পষ্ট তনু-দেহটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নীরদ। যাই হোক, সিনেমা হলে ঘটনাক্রমে এক আইসক্রীম বিক্রেতা উপস্থিত হয়। নীরদ দুটি আইসক্রীম কেনে। তা খেয়ে নির্মলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে – "বা:! বেশ চমৎকার হয়েছে তো। অবশ্য আমিও যে এমন না পারি তা নয়। দামী মালমশলা যদি পাই স্বাদে গন্ধে আমার কুলপী বরফ কেবল বেলঘরিয়া কেন কলকাতার বাজারকেও টেক্কা দিতে পারে।"[৯৫] পরম আত্মপ্রসাদে নির্মলা নীরদের দিকে তাকায়। পাশের বহু কৌতূহলী দৃষ্টি তাদের উপর পড়লে নীরদের মান-সম্মানে আঘাত লাগে। আর তাতেই তার অন্তরের গোপন অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে – "মুহূর্তের জন্য লজ্জায় আর অপমানে আরক্ত হয়ে উঠে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল নীরদের মুখ। চাপা ধমকের স্বরে বলল - 'ছিঃ রক্ষা করো, কুলপী বরফ এখন থাক।"[৯৬] নীরদ মূলত নির্মলার সাহচর্য চেয়েছিল; নির্মলাকে চেয়েছিল তবে তার বৃত্তি বা আচরণকে সে ভিতরে ভিতরে কোনদিন গ্রহণ করতে পারেনি। নীরদ তার কর্মব্যস্ত জীবনে শুধুমাত্র তার সাহচর্য গ্রহণ করে আনন্দ পেয়েছিল। এ ছিল তার কাছে রবিবারের ছুটি কাটানোর এক মনোরম উপায়। কিন্তু সেই সম্পর্ক যে দশজনের কাছে তাকে ছোট করবে তা সে ভাবতে পারেনি। তবে এবার নির্মলা ভাবতে পেরেছিল। এই সময়ে নির্মলার অবস্থা এরূপ – "নীরদের কথা শুনে ভারী একখানা পাথর যেন নির্মলার হৃদয়ের উপর সশব্দে গিয়ে পড়েছে। বিস্মিত বেদনার্ত চোখ দুটি নীরদের দিকে

তুলে ধরে নির্মলা। পুরু চশমার ভিতর দিয়ে নীরদের আরক্ত ঘোলাটে চোখদুটি দেখা যাচ্ছে। সে চোখে মোহ নেই, মাধুর্য নেই, অদ্ভুত ঘৃণায় আর বিদ্বেষে চোখ দুটি পূর্ণ হয়ে রয়েছে। খানিক বাদে নির্মলার ঠোঁটেও তীক্ষ্ণ একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। আস্তে আস্তে নির্মলা বলল – "আমার ভুল হয়েছিল ঠাকুরপো।" নীরদ কোন জবাব দিল না, তার চোখের দৃষ্টি তখন অন্যদিকে। নির্মলাও ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে নিল।"[৯৭] এ শুধু মাত্র চোখ ফেরানো নয়। একজনের মনের গোপন ভাবনা তথা দৃষ্টিভঙ্গির হঠাৎ প্রকাশ, অপর জনের মোহভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গ এবং নিজের সম্পর্কে অন্যের আসল ধারণার সম্মুখীন হওয়া। এই পরিস্থিতি উভয়ের মনেই বিপরীত অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, যা তাদের দুজনের দ্বারা গঠিত সম্পর্কে প্রভাবিত করবে।

'চোরাবালি' গল্পটি ১৩৫২ বঙ্গাব্দে 'কলিকাল' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি গল্পকারের 'গল্পমালা-৪' এর অন্তর্গত। গল্পটি 'দাম্পত্য সম্পর্কের উত্থান-পতন' শীর্ষক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হলেও এর কাহিনীর সূত্রপাত বিবাহ পূর্ববর্তী সময় পর্ব থেকে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তা দাম্পত্য জীবন বলয়ে প্রবেশ করে। একটি স্তরে এসে একটি নারীকে কেন্দ্র করে দু জন পুরুষের সম-মানসিকতার যে পরিচয় তাই গল্পের মুখ্য বিষয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কম-বেশী থাকে। কারও জীবনে তা পূরণ হয় না, আবার কারও কারও হয়েও থাকে। যার জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তির সমান্তরালে তার চাহিদা বোধ হয় আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে ক্রমশ অনেক বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এই পর্যায় সেই মানুষটির মানবিক অবনমনকে ত্বরান্বিত করে থাকে। অন্তরের অনুভূতি ও সম্পর্কের বন্ধন মহিমা তার কাছে হারিয়ে যেতে থাকে। এই গল্পের দুটি প্রধান চরিত্র – একজন স্বামী ও একজন পিতা। এই দুজন মানুষকে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। উক্ত গল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবেশ করলে পাওয়া যায় পিতার সঙ্গে কন্যার সম্পর্কের অবনমনের দিকটি।

গল্পের কাহিনীতে দেখা যায়, অনাদি তার পরিবার নিয়ে এক ভাড়া বাড়িতে থাকে। সেই একই বাড়িতে গৌরাঙ্গ তার মাকে নিয়ে ভাড়া থাকে। গল্পে গৌরাঙ্গের চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে তথাকথিত 'ফাজিল ছোকরা' হিসাবে। সে তার স্বভাব মত অনাদির মেয়ে রাণুকে দেখলে শিষ্ দেয়, চেয়ে চেয়ে হাসে, কখনো গান ধরে। তার চোখ সর্বদা রাণুর উপর স্থিত। রাণু বিষয়টিকে এড়িয়ে যায়। গৌরাঙ্গ সম্পর্কে তার মনের ধারণা এই ভাবে ব্যক্ত হয়েছে – "গৌরাঙ্গের

কাণ্ড দেখে তার কখনো বা রাগ হয় কখনো বা হাসি পায়। অনুরাগ মুহূর্তের জন্যও আসে না। আসবার কথাও নয়, কেবল রঙটাই যা গৌরাঙ্গের ফরসা। কিন্তু এই বয়সেই চোয়াল ভেঙেছে, চোখ দুটো কোটরগত, বিড়ি খেয়ে খেয়ে ঠোঁটের রঙ হয়েছে ঘন কৃষ্ণ। দশআনি ছআনি চুলের ছাঁট, ঠোঁটের উপর গোঁফ রাখা সূক্ষ্ম রেখায়। এরপর একটা ছাই রঙের স্যুট পরে বেরোয়কাজে।.... শুধু বাইরের নয়, লোকটির মনের চেহারাও যে অমনি তা তার হাব-ভাব আদব কায়দায় রাণুর কাছে গোপন থাকে না। গৌরাঙ্গের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি প্রতিটি পদক্ষেপ রাণুর দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, রুচিকে ক্লিষ্ট করে তোলে।"[৯৮] শুধু রাণু নয়, গৌরাঙ্গের এই স্বভাব ব্যবহারে রাণুর বাবা-মা দু জনেই ক্ষিপ্ত। রাণুর বাবা অনাদি ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করে বলে – "ওকে মেরে যদি হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে না দিই তো কায়েতের বাচ্চা নই আমি।"[৯৯] রাণুর মাও গৌরাঙ্গের মায়ের কাছে নালিশ জানিয়েছে – "ছেলেকে বলে দিও দিদি, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে তো সেও। একি স্বভাব চরিত্র! আমরা হলে লজ্জায় মরে যেতাম।"[১০০] অর্থাৎ উক্তিগুলির মাধ্যমে এটুকু স্পষ্ট যে, গৌরাঙ্গকে অনাদির পরিবারের কেউই সহ্য করতে পারে না। এমনকি, তারা বাড়ি বদলানোর পরিকল্পনাও করে। গৌরাঙ্গের সঙ্গে অনাদির পরিবারের সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক নয়; একপ্রকার বিরক্তি ও ক্ষোভ মিশ্রিত ঘৃণার সম্পর্ক উভয় পরিবারের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু একটি ঘটনা অনাদির এই মানসিকতার পরিবর্তন করে। ঘটনাটি হল গৌরাঙ্গের ইনক্রিমেন্ট সহ প্রমোশন। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় – গৌরাঙ্গ ও অনাদি একই অফিসে কাজ করে। যাই হোক, গৌরাঙ্গের উন্নতি অনাদির মনে অন্যরকম হতাশার সঙ্গে ঈর্ষাবোধকে জাগ্রত করে। আর এই জায়গা থেকেই অনাদি উপলব্ধি করে গৌরাঙ্গকে তুষ্ট না করলে তার পদোন্নতি সম্ভব নয়। আর তা সম্ভব হতে পারে একটি মাত্র পথে; তা হল গৌরাঙ্গের হাতে রাণুকে সমর্পণের মাধ্যমে। এতে শুধুমাত্র অনাদির উন্নতি নয় তার পুত্র সন্তানটিরও কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। এই বিষয়টি অনাদির মুখেই ফুটে ওঠে – "ওকে খুশি না রাখলে ইনক্রিমেন্ট কোন কালেই হবে না। ওই তো প্রথম রেকমেণ্ড করবে। তাছাড়া সাহেবরা সত্যিই ওকে খাতির করে, শিগগিরই বোধ হয় ও সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে যাবে। অমন দেখলে কি হবে স্বয়ং অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে ওর দহরম মহরম। ওকে বলে প্রমথকেও ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে অফিসে।"[১০১]

নিজের ও পরিবারের স্বার্থের জন্য একজন পিতা হিসাবে আর এক সন্তানকে বিসর্জন দেওয়ার যে মানসিকতা তা রাণুর অন্তর্লোকে আঘাত হানে। পিতার আর এক যে নব রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে তাতে রাণু বিস্মিত। সেই বিস্ময়বোধ থেকেই রাণুর মনে বাবার প্রতি তীব্র

ক্ষোভ ও ঘৃণা সঞ্চারিত হতে থাকে। ফলে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনাদির সঙ্গে গৌরাঙ্গের বাহ্যিক যে সম্পর্ক তার উন্নতি ঘটতে থাকে। অপরদিকে তা সমান্তরালে পিতার সঙ্গে কন্যার সম্পর্কটি অন্তরালে অবনমিত হতে থাকে। কিন্তু সরমা যেহেতু মা, তাই তার কাছে বৈষয়িক চিন্তাভাবনার তুলনায় ভালোমন্দের বিচার অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। তাই সে প্রতিবাদ করে বলেছে – "কিন্তু গৌরাঙ্গের স্বভাবচরিত্রটা একটু কেমন ঠেকে না কি ?"[১০২] প্রত্যুত্তরে অনাদির পিতৃসত্তা নয়, বৈষয়িক সত্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। এককেন্দ্রিক মানসিকতা দৃঢ়তা লাভ করেছে। তাই সে বলেছে – "পুরুষের আবার স্বভাব-চরিত্র। বিয়ে করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিয়ো। তা ছাড়া ওই রকমই চাই আজকাল বুঝলে ? ফাজিল ফক্কর না হতে পারলে এ যুগে ভাত নেই।"[১০৩]

বাবার এমন মনোভাব, জীবনসংসারে রাণুর অবস্থান কোথায় ও কোন্ পর্যায়ে তা স্পষ্ট করে তোলে। জীবনবোধের চেনা ছকগুলি হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায়। জীবনের একটি পর্যায়ে এসে রাণু তার অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু সেই সচেতনতা তার জীবনের পরিণতিকে রোধ করতে পারেনি। কেননা, সে একজন স্বাবলম্বনহীন নারী। নিজস্ব কোন কর্ম-সংস্থান তার নেই, তাকে বাবার প্রতিপালনের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কাজেই বাবার ইচ্ছানুযায়ী তার গৌরাঙ্গকেই বিয়ে করতে হয়। তবে বাবার ইচ্ছা ও কার্যসিদ্ধি হলেও কন্যার সঙ্গে পিতার স্বাভাবিক যে সম্পর্কটি ছিল সেটি আর সুস্থ অবস্থায় থাকল না। সংক্রমিত হতে থাকল। ফলে পিতার সম্পর্কে কন্যার মানসলোকে যে আদর্শভাবনা, মনোভাব ও অবস্থান তা পরিবর্তিত হতে থাকে।

এই পরিবর্তিত মানসিকতা নিয়েই রাণু দ্বিতীয় জীবনে অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্কে প্রবেশ করে। ঐ মানসিকতার আলোড়ন নিজ জীবনের প্রতি ও বাবা-মায়ের প্রতি তার মনে একরকম ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা বোধের জন্ম দেয়। যে বিষয়টি তাকে প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তোলে। তাই গৌরাঙ্গের প্রতি রাণুর যে গা ঘিনঘিন ভাব ছিল তা সে জোর করেই কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। এবং সংকল্প করল সে গৌরাঙ্গকেই ভালোবাসবে। এই ভালোবাসাটা দেখানো ভালোবাসা। ভালোবাসার অভিনয় মাত্র। আসলে এই দেখানোটা শুধুমাত্র গৌরাঙ্গকে নয়, মূল লক্ষ্য রাণুর বাবা-মাকে দেখানো। এমনি করেই সে যেন বাবার উপর শোধ তুলবে। তাই অন্যদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে রাণু গৌরাঙ্গের হাতে পান তুলে দেয়, অনাদির সামনেই গৌরাঙ্গের সঙ্গে সে কথা বলে। রাণুর এই ব্যবহারে গৌরাঙ্গ লজ্জিত হয়। লক্ষণীয় বিষয়, একসময় রাণুকে বিয়ে করার পর সে একান্তভাবে রাণুকে কাছে পেয়েছে; এখন আর আড়াল-আবডাল বা ইশারা-ইঙ্গিতের প্রয়োজন

হয় না। তাছাড়া বিয়ের পর রাণুর এমন বিপরীত আচরণও তার স্বাভাব-চরিত্রকে বদলাতে সাহায্য করেছে। এই পার্থক্য রাণুর চোখেও ধরা পড়েছে; তাই সে বলে – "কিন্তু এরই মধ্যে তুমি রীতিমত ভিতু আর শান্ত মানুষটি হয়ে উঠেছ। আমি ঠিক উল্টো। তোমার স্বভাব আমি পাচ্ছি আর আমার স্বভাব তুমি। শুধু মালা বদল নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব বদলও হয় নাকি বিয়ের পর ?"[১০৪] হয়তো হয়। পরিস্থিতি মানুষের মানসিকতা ও সেইসঙ্গে স্বভাবকেও বদলে দেয়। তাই রাণু শুধুমাত্র বেশী বেশী করে দেখানো নয়, স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় সে এই একই বাড়িতে থাকবে না। এই বক্তব্যে রাণুর মায়ের প্রতিক্রিয়া – "কি নিষ্ঠুর স্বার্থপর মেয়েটা। এতকাল খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করল যে মা-বাপ, বিয়ে হতে না হতেই তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সে চুকিয়ে দিতে চাচ্ছে। তাদের চোখের সামনে থাকাও তার সহ্য হয় না।"[১০৫] এমন আঘাতই বাবা-মায়ের মনে দিতে চেয়েছিল রাণু। তা আজ সার্থক হয়েছে। অপর দিকে অভিনয় করা সম্পর্কটা ধীরে ধীরে রাণুর জীবনে খানিকটা সত্যিই হয়ে উঠতে থাকে। ফলে রাণু ও গৌরাঙ্গের মধ্যে পূর্বে যে সম্পর্ক ছিল তার পরিবর্তন হয় এবং নব দাম্পত্য জীবন সুস্থ ও স্বাভাবিকতা লাভ করতে থাকে।

গৌরাঙ্গ আর্থিক দিক দিয়ে ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে থাকে। সেই সঙ্গে রাণুর সমস্ত রকম চাহিদা পূরণ করে। এই পর্যায়ে এসে রাণুর মনে বাবা-মা এর প্রতি যে বিদ্বেষ মনোভাব ছিল তা প্রশমিত হয়ে যায়। কিন্তু রাণুর মনে তবুও খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। কারণ সে উপলব্ধি করে শুধুমাত্র মাইনের টাকায় এমন রাজার হালে থাকা সম্ভব নয়। তাই নানা রকম প্রশ্ন তার মনে উঁকি দেয়। অবশ্য গৌরাঙ্গ সমস্ত প্রশ্নের স্বাভাবিক সমাধানের পথ দেখায়। যাই হোক, ঘটনাক্রমে দেখা যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমান্তরালে গৌরাঙ্গের জীবনে প্রাপ্তিও ঘটে। এবং এই প্রাপ্তি তার চাহিদার পরিমাণকে বাড়িয়ে তোলে। আর সেই চাহিদা মেটাতে এবারও একমাত্র রাণুই পারে। কেননা, গৌরাঙ্গের এক উচ্চপদস্থ সহকর্মীর দৃষ্টি পড়েছে রাণুর প্রতি। নানা দ্বন্দ্ব টানাপোড়েন কাটিয়ে এবারও স্ত্রীকে নয়, চাহিদাকেই প্রাধান্য দিয়েছে রাণুর স্বামী গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের প্রস্তাবে রাণুর মনের প্রতিক্রিয়া এই ভাবে প্রকাশিত হয়েছে – "অনাদির কন্ঠই শুধু নয়, তার মুখের আদলও যেন দেখা যাচ্ছে গৌরাঙ্গের মুখে। রাণু এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে, তারপর অদ্ভুত বিবর্ণ হেসে বলে, – "আমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিল।"[১০৬] এবারও রাণুর জীবনে সেই একই আঘাত নেমে আসে। সেবার রাণু বাবা-মার সংসার ত্যাগ করে নানা কৌশলে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলো। কিন্তু এবার কীভাবে তা সম্ভব। এবারও সে নিজের স্থান ও অস্তিত্বকে আবার একই ভাবে স্বামীর চোখ দিয়ে দেখে নিল। এই আত্মহীনতা কি তার মনে তথা

দাম্পত্য সম্পর্কে প্রতিফলিত হবে না ? এবারও রাণুর কিছুই করার থাকবে না। শুধুমাত্র সমাজ প্রদত্ত সম্পর্কের 'নাম' নিয়ে বেঁচে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হল সেই সম্পর্কে রাণুর মন থাকবে তো ....?

'দ্বিরাগমন' গল্পটি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'বসুমতী' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি গল্পকারের 'গল্পমালা-২' এর অন্তর্গত। আলোচ্য গল্পে একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে উপলক্ষ করে চারটি চরিত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের রূপরেখা উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ চারটি চরিত্রের মধ্যে চতুষ্কোণ সমন্বিত বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক রচিত হয়েছে। আমরা জানি, একটি চতুর্ভুজের মধ্যে একটি কর্ণ টানা হলে প্রধান দুটি ত্রিভুজ পাওয়া যায়। এই গল্পে একটি ত্রিভুজ অর্থাৎ তিনটি চরিত্রের মধ্যেকার সম্পর্কের যে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা তা প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু অপর ত্রিভুজের তিনটি চরিত্রের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা 'না-বলা'-ই থেকে গিয়েছে। উভয় দিক মিলিত হয়ে চারটি চরিত্রের মধ্যে যে চতুষ্কোণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তারই পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ রূপ বিশ্লেষিত করা হচ্ছে।

গল্পের মধ্যে গল্প বলার ঢঙে আলোচ্য গল্পের কাহিনী অগ্রগতি লাভ করেছে। কাজেই একজন কথক চরিত্র সেখানে বর্তমান। আতোয়ার ও রোশনা দুজন দম্পতি। তাদের মনোমালিন্য ও দাম্পত্য কলহ দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। তাদের মধ্যে এই মনোমালিন্যের কারণ খুঁজতে হলে আমাদের গল্পের কাহিনীতে প্রবেশ করতে হবে। আলোচ্য গল্পে রোশেনা চরিত্রটি উপলক্ষ মাত্র। গল্পের আসল ও প্রধান চরিত্র হল – কুসুম। সে রোশেনার বিধবা দিদি। কুসুমের সঙ্গে রোশেনার শুধুমাত্র চেহারা ও গুণের দিক থেকে আশ্চর্যভাবে মিল নেই, কুসুম তার আদর্শবোধ, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোনকে গড়ে তুলেছে। অর্থাৎ রোশেনা যেন কুসুমেরই ছায়া-প্রতিমা। এই সূত্র ধরে কুসুম রোশেনার জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রীও বলা চলে। যাই হোক, এই পর্যন্ত আমরা চারটি চরিত্র পেলাম যথা – আতেয়ারা, রোশেনা, কুসুম ও কথক যতীশ। গল্পের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে বসবাস করার সমাজজীবন।

গল্পের কথক যতীশ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের ছেলে। তার বাবার বন্ধু মুসলমান চৌধুরী সাহেবের মেয়ে কুসুম ও রোশেনা। সেই সূত্রে যতীশের সঙ্গে কুসুম ও রোশেনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যতীশ ঐ দুই বোনের গৃহশিক্ষক ছিল একসময়। শুধুমাত্র তাই নয়, তাদের পরিবারের সমস্ত সুখ-দুঃখের অংশীদার যতীশ। কাজেই যতীশের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গতার মূল অনেক গভীরেই নিমজ্জিত হয়েছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর কুসুম যখন নিজের বাড়িতে ফিরে আসে তখন সংসারের সমস্ত দায়-

দায়িত্ব নিজের কাঁধেই নেয়। একটা কর্তব্য তথা দায়িত্ব বোধ থেকে সে বোনের বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দের দায়িত্বও কুসুম নিজের মত করে নেয়। তাই নিজের পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করার আদেশ দেয় বোনকে। এই প্রসঙ্গে বোন রোশেনা হেসে বলে – "এতই যখন পছন্দ হয়ে থাকে, তুমিই কর।"[১০৭] উত্তরে কুসুম বলে – "দূর, আমার হাতে পড়লে বেচারা অকালে প্রাণ হারাবে। একবার তো ক'রে দেখলাম, বছর খানেকও টিকল না। পরের ছেলের ওপর দিয়ে বারবার এমন পরীক্ষা নিরীক্ষা ভালো নয়।"[১০৮] কুসুমের উক্তি থেকে একথা স্পষ্ট যে পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় না থাকলে সে-ই বিয়ে করত। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিয়ে করার চাহিদা তার মনেও আছে।

বাধ্য হয়ে রোশেনা অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও আতেয়ারকে বিয়ে করে। ঘটনাক্রমে দেখা যায়, তাদের মনের মিল হয়নি। দুজনে বিপরীত ধারার মানুষ। ফলে আতেয়ার যত তার অধিকারের প্রয়োগ ঘটায় রোশেনা তত তিক্ততায় দূরে সরে যায়। আসলে মানুষের জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও মানুষের মনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় – এই সত্য কুসুম উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার ভুল ভাঙে। রোশেনার দাম্পত্য জীবনে অসুখীর কারণ সে উপলব্ধি করে। আসলে কুসুমের জীবনের প্রতিরূপ হল রোশেনা। সে কুসুমের দোসর। কাজেই রোশেনার দুঃখ কষ্ট যেন তারই দুঃখ কষ্ট। রোশেনার জীবনের জটিলতাই কুসুমের জীবন যন্ত্রণা। তাই হয়তো রোশেনা স্বামীগৃহে যেতে অস্বীকার করলে কুসুমও বিষয়টি সমর্থন করে। আবার আতেয়ার যখন জোর করে রোশেনাকে টানতে টানতে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় তখন যেন কুসুম অনেক বেশী কষ্ট পায়। আতেয়ারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে তার মন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। আবার একটা সূক্ষ্ম বিষয়ও এখানে কাজ করতে পারে; হয়তো আতেয়ারের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা ছিল কুসুমের মনে। এই জায়গা থেকে সে বোনকে তার কাছে পাঠাতে নারাজ। যাই হোক, কুসুমের মনের এই পরিস্থিতি লক্ষ করে কথক যতীশ বিস্মিত হয় এবং তার বিস্ময়বোধ তার বর্ণনাতে এইভাবে ধরা পড়ে – "কিন্তু ছোট বোন শ্বশুরবাড়িতে গেলে কোন দিদির মনে যে এরকম মৃত্যুশোক উপস্থিত হয় তা আজ আমি এই প্রথম দেখলাম। বাড়িতে গিয়েও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কুসুমের সে কি কান্না!"[১০৯] আতেয়ার রোশেনার স্বামী। স্বাভাবিক ভাবে একজন স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রতি তার অধিকার আছে। এবং স্ত্রী হিসাবে রোশেনারও স্বামীর পাশে থাকা উচিত। এই বিষয়টি যতীশ কুসুমকে বুঝিয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছে – "আতেয়ার শিক্ষিত, ভদ্র রুচির ছেলে। রোশেনাকে এতদিন পায়নি বলেই সে এমন হিংস্র নির্মম হয়ে উঠেছে।"[১১০] আর তাতে কুসুম আরও ক্ষেপে গিয়ে বলেছে –"ছাই চিনেছ তুমি, ও একটা পশু, একটা জানোয়ার।

ও না করতে পারে এমন কাজ নেই। কোন মেয়ে ওকে কোনদিন ভালোবাসতে পারবে না।"[১১১] একথা শুনে যতীশ বলেছে – "এরপর আমার আর কি বলার থাকতে পারে। তার সেই রাগ, সেই কান্নার দিকে তাকিয়ে তোমাকেও চুপ করে থাকতে হত প্রশান্ত। তুমিও কোন কথা খুঁজে পেতে না।"[১১২] যাই হোক, কুসুমের উক্তির মাধ্যমে তার সঙ্গে বোন রোশেনা ও আতেয়ারের মধ্যে যে সম্পর্কের স্বরূপ তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অপর দিকে, আতেয়ারের ধারণা – রোশেনার সঙ্গে যতীশের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক। তাই হয়তো রোশেনা তার কাছে যেতে চায় না। এই বিষয়টি আতেয়ারের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। আসলে সে রোশেনা ও যতীশের সহজ সরল সম্পর্কের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। তাই আতেয়ার যখন রোশেনার উপর জোরজুলুম করে সেই পরিপ্রেক্ষিতে যতীশ বলে – "আতেয়ার সাহেব আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান, বড় বংশের ছেলে – আপনার কি এসব খাটে ?"[১১৩] উত্তরে আতেয়ার শ্লেষ করে বলে –"সে তো বটেই। বিদ্বান বুদ্ধিমানেরা কি আর সবাই বউ নিয়ে ঘর করে। পরের ভোগের জন্য তারা বউকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখে যায়। আপনি বলে ফের শালিশি করতে এসেছেন। কোন মুসলমানের বাচ্চা হলে সরমে ঘর থেকে বেরোতে পারত না।"[১১৪] অন্যদিকে আতেয়ারের এমন আচরণে কুসুম ক্ষোভ প্রকাশ করলে যতীশ কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলে –"ছিঃ কুসুম, ঝগড়া করে চেঁচামেচি করে কিছু লাভ আছে ?" উত্তরে কুসুম বলে – "তুমিও এই কথা বলছ যতীশদা! রোশেনাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে দেখেও তুমি কথাটি বলছ না, উল্টে আমাকে দোষ দিচ্ছ।"[১১৫] কুসুমের আয়ত সুন্দর চোখে এতক্ষণ যে জল থমকে ছিল, যতীশের কথায় তা গাল বেয়ে পড়তে লাগল। আসলে যতীশের সঙ্গে কুসুমের গভীর নির্ভরতা, গভীর আবেগ-ভালোবাসার ও অভিমানের সম্পর্ক। সেই প্রচ্ছন্ন সম্পর্কেরই এক ঝলক তাদের দুজনের কথোপকথনের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। আলোচ্য গল্পে এই পর্যন্ত আমরা চারটি চরিত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এই ভিন্ন ভিন্ন সীমারেখা পেলাম।

গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, রোশেনা তার স্বাধীন সত্তাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। সে আতেয়ারের কাছ থেকে তালাক নিয়ে ফিরে এসেছে। শ্বশুরবাড়ি যাবার পর দুজনের মধ্যে অশান্তি, মতান্তর, মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই সূত্রে আতেয়ার রোশেনার উপর হাতও তোলে। এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে ছাড়াছাড়ির সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এবার রোশেনার চরিত্রে ও মানসিকতায় বহু পরিবর্তন ঘটে। আর সেই পরিবর্তন কুসুমের চোখে এইভাবে ধরা পড়েছে – "রোশেনা ফিরে এল কুসুমের কাছে। কিন্তু আগের মত সেই দিদি

সর্বস্বতা আর নেই। মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে রোশেনা। ঘরের নির্জন কোণে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মাঝে মাঝে অন্যরকম মেজাজও আবার দেখা যায়। দেখা যায় পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে খুব হৈ-হল্লা করছে।"[১১৬] বিষয়টি কুসুমকে চিন্তিত করে তোলে। মূলত রোশেনা উপলব্ধি করেছিল তার জীবনে এমন পরিণতির জন্য তার দিদি-ই দায়ী, যা তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তা থেকেই তার মানসিকতার এমন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে বোধ হয়, ইচ্ছাকৃত ভাবেই দিদির সামনে এমন আচরণ করে দিদিকে অনুতপ্ত করতে চায়। যাই হোক, ঘটনাক্রমে পুনরায় রোশেনা নিজে পছন্দ করে বিয়ে করে এবং সুখী হয়। গল্পে এই পর্যন্তই রোশেনার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। পরবর্তীকালে কিছুটা সময়ের ব্যবধানে কুসুমের জীবনের পট পরিবর্তন ঘটে; সেই সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের সমীকরণও পরিবর্তিত হয়। আসলে এই গল্পে রোশেনা উপলক্ষ্য মাত্র, কুসুমের আর একটি সত্তা। মূলত কেন্দ্রিয় চরিত্র এই কুসুম। পরে যে ঘটনা কুসুমের জীবনে ঘটেছে তার বর্ণনা স্বয়ং কুসুম নিজের মত করে ব্যাখ্যা করেছে যতীশের কাছে। সেই সূত্রে দেখা যায়, কিছু সময়ের ব্যবধানে আতেয়ারের সঙ্গে কুসুমের দেখা হয়। ততদিনে যতীশও অন্যত্র বিবাহ করেছে। আতেয়ারের উস্কোখুস্কো চুল, রোগাটে মুখ সব মিলিয়ে শরীরের এই অবস্থা দেখে কুসুমের মনে তার প্রতি করুণা হয়। আবার বলা যায়, বোনের জন্য কুসুম আতেয়ারকে পছন্দ করেছিল, সেই সূত্র ধরে এই অবস্থায় দেখে কুসুমের মনে আতেয়ারের প্রতি সহানুভূতি সঞ্চারিত হয়। তাই সে আতেয়ারকে তাদের বাড়িতে এনে খুব আদর যত্ন করে। অপরদিকে এই আদর যত্নের বাড়াবাড়ির মধ্যে যে গোপন আঘাত লুকিয়ে আছে, আতেয়ারের তা বুঝতে দেরী হয়নি। যাই হোক, সময় আতেয়ারের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কুসুম কথায় কথায় জানতে পারে – আতেয়ার রোশেনাকে ভালোবেসেছিল, তাকে সে আজও ভুলতে পারেনি। সে ভুল করেছে, তাই নিজের অপরাধ স্বীকারও করেছে কুসুমের কাছে। কুসুম বলে –"কিন্তু আপনি তাকে এত ভালোবাসতেন"[১১৭] উত্তরে আতেয়ার জানায় – "সে কথা কাউকে বোঝাতে পারিনি এই দুঃখ রয়ে গেল। নিজেও কি এমন করে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম ?"[১১৮] এই কথায় রোশেনার জন্য মনে মনে এক অদ্ভুত ধরণের আনন্দ ও গর্ব বোধ করে কুসুম – "ত্যাগ করেও আতেয়ার যে তাকে ভুলতে পারেনি বরং নতুন করে মূল্যবোধ করতে শুরু করেছে এতে কুসুমদেরই জয়। রোশেনার যাতে সুখ, যাতে আনন্দ যাতে অহংকার তাতো কেবল রোশেনারই নয়, তাতে কুসুমেরও অংশ আছে যে। আচার-আচরণে, শিক্ষায়-দীক্ষায় রোশেনা যে তাকেই অনুসরণ করেছে। এমনকি সাজসজ্জাটি পর্যন্ত কুসুমের কাছ থেকে শিখেছিল রোশেনা।"[১১৯] আসলে শুধুমাত্র রোশেনা নয়, রোশেনার মাধ্যমে কুসুমেরই

অস্তিত্ব এখনো আতেয়ারের কাছে আছে এবং তার মূল্য সে নতুন করে উপলব্ধি করতে পেরেছে – এটিই কুসুমের আনন্দের মূল কারণ। রোশেনা সেতু স্বরূপ এখানে।

অপরদিকে, আতেয়ার রোশেনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় কুসুমের উপর। রোশেনার প্রতি সে অন্যায় করেছে। সেই ভুল আর সে করতে চায় না। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে ও তার ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে কুসুমকে রোশেনা হিসাবে পুনরায় পেতে চায়। দুজনের মনে নব-উত্থিত এই ভাবাবেগ পরস্পরকে পরস্পরের কাছে আনে। আর এই মানসিক মিলনের মধ্যস্থতা করেছিল রোশেনার পরোক্ষ অস্তিত্বের উপস্থিতি। তাই হয়তো আতেয়ার যখন কুসুমের কাছে আসত তখন তার মনে হত রোশেনাকে সে একেবারে হারায় নি। ধীরে ধীরে দুজনেই দুজনকে বুঝতে পারল। মুখে স্বীকার না করলেও কথাটা কারও কাছে গোপন রইল না। আসলে নেপথ্যচারিণী রোশেনা উপলক্ষ্য, তাদের দুজনের মধ্যে আলাপের সেতু। তাই একদিন আতেয়ার বলল – "রোশেনার কথা থাক। সে এখন পরস্ত্রী।"[১২০] কুসুমও তাই চাইছিল। বোনের ছদ্মবেশ পরে থাকতে তার আর ভালো লাগছিল না। আরেক জনের ওড়না সরিয়ে এবার সে নিজের মুখ বার করল। এবং এর পরিণাম হিসাবে দুজন দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হল। ফলে আতেয়ারের সঙ্গে কুসুমের পূর্বের সম্পর্কও পরিবর্তিত হল। এই পর্যন্ত রোশেনা আতেয়ার ও কুসুমের সম্পর্কের নানা আবর্তমানতা পরিস্ফুট হল।

কিন্তু অপর ত্রিভুজের তিনটি চরিত্র অর্থাৎ কুসুম যতীশ ও আতেয়ার এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম সম্পর্কটি ছিল বা নতুনভাবে স্থাপিত হল তা খানিকটা অন্তরালেই থেকে গিয়েছে। কুসুম ও যতীশ পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসত। হয়তো সেভাবে মুখে স্বীকার করেনি তারা। পুনরায় বিয়ে করে সংসার করার ইচ্ছা কুসুমের মনের কোণে ছিল তা আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান যতীশের পক্ষে এক বিধবা মুসলমান নারীকে বিয়ে করা সম্ভব নয় তা কুসুম উপলব্ধি করেছিল। তাই যতীশের উপর একরকম জেদ করেও সংসার করার বাসনায় সে আতেয়ারকে বিয়ে করে। এবং মুসলমান সমাজে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার রীতিও প্রচলিত; তাই আতেয়ারকে বিবাহ করার মধ্য দিয়ে কুসুমের মনে যতীশের সঙ্গে সংসার করবার যে সুপ্ত বাসনা ছিল তাও খানিকটা সে পূর্ণ করতে চেয়েছিল। তবে, কুসুমের প্রতি যতীশের যে দুর্বলতা ও অভিমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার একটি উক্তিতে – "মেয়েদের মন, বন্ধু, দেবতারাই জানে না। আর কুতঃ যতীশঃ!"[১২১] তার এই দুর্বলতা ঢাকতেই তাই দেখা যায় গল্পের শ্রোতার এক কথার উত্তরে যতীশের স্ত্রী বলে – "সূত্রধর না আরো কিছু, আসলে

কুসুম জেদ করে এই বিয়ে করেছে। তার এক ভীরু মুরোদহীন মাস্টারমশাইর উপর রাগ করে।"[১২২] তখন যতীশ বলে ওঠে –"যতসব আজগুবি গল্প।"[১২৩] এবং জোরে জোরে হাসতে থাকে। এই হাসি আসলে সত্যিকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই প্রদর্শন করা হয়। নর-নারীর সম্পর্ক যে কোন জাত-ধর্ম মানে না, অথচ সমাজ বলে একটা বিষয় আছে; সেক্ষেত্রে সম্পর্কের জটিলতা কোন্ মাত্রায় পৌঁছোয় এবং তার পরিণামও কত ভিন্ন রূপ নিতে পারে তারই পরিচয় এই 'দ্বিরাগমন' গল্পে পাওয়া গেল।

একটি জীবিকা ও তার প্রতি গভীর ভালোবাসা তথা একনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক কীভাবে গতিমুখ পরিবর্তন করে তারই একটি দিক ধরা পড়েছে **'আতসকর'** গল্পে। এটি ১৩৫২ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় দোল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গল্পে প্রধান পুরুষ চরিত্র হিসাবে যাকে পাওয়া যায় সে একজন নামকরা 'আতসকর'। আতসবাজি তৈরীতে সে ভীষণ পারদর্শী। এটি শুধুমাত্র তার জীবিকা নয়, এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা আছে। ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতাই তাকে বিখ্যাত আতসকর হিসাবে সুনাম অর্জন করতে সাহায্য করেছে। আর তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই সে গর্ববোধ করে। তবে দেখা যায় স্বামী জগৎ ভুঁইমালীর এই জীবিকা স্ত্রী পদ্মা পছন্দ করে না। কিন্তু তাতে জীবিকার কোন দোষ নেই, আসলে এই অপছন্দের মূল কারণ ছিল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর চরম উদাসীনতা। একজন পূর্ণ যৌবনবতী স্ত্রী যার রূপ আছে, যে মানুষকে আদর-আহ্লাদ করতে জানে, স্বামী তারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে তাই সে চায়। অথচ তাকে উপেক্ষা করে স্বামী কেবল আতসবাজিতেই মগ্ন। কাজেই জগৎ ভুঁইমালীর এই আচরণ স্ত্রী পদ্মা সহ্য করতে পারেনি। তার অভিযোগ জগতের কাছে নিজের নেশা ও খেয়ালই সবচেয়ে বড়। তার উপরে আর কিছু নেই। শুধু তাই নয়, বিয়ে হওয়া অবধি সে পদ্মার সঙ্গে ভালো মুখে দুটো কথা বলেনি; এমনকি, দুটো ভালো জিনিস এনে দেয়নি। তার মুখের দিকে একটু ভালো করে তাকিয়ে মায়াও দেখায়নি। অর্থাৎ এই অভিযোগের মূলে আছে একজন সাধারণ নারী হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে স্বামীর প্রতি গভীর অধিকারবোধ। সেই অধিকার থেকেই সে চায় স্বামী তাকে আদর-সোহাগ করে ভালো মুখে দুটো কথা বলবে, কাছে টানবে। এ চাওয়া একজন নারীর স্বাভাবিক চাহিদা। কিন্তু আলোচ্য গল্পে স্ত্রী পদ্মা স্বামীর কাছ থেকে সেই চাহিদা থেকে বঞ্চিত। স্ত্রীর বিষয়ে স্বামীর কোন খেয়াল নেই, বরং জগৎ সবসময় বাজির গল্পে-ই মত্ত। বাজি তৈরী করে যে টাকা সে রোজগার করে তার চেয়ে বেশী টাকা ব্যয়

করে বাজির জন্য নিত্য-নতুন মাল-মশলা কেনার কাজে। বিভিন্ন মশলা দিয়ে সে নতুন নতুন পরীক্ষায় মগ্ন। শুধুমাত্র নিজের গাঁটের টাকা নয়, প্রয়োজনে পদ্মা বাড়ির সব্জি বিক্রি করে যে দু -চার টাকা জমায় তাও কেড়ে নেয় জগৎ। কাজেই পদ্মার মনে ক্ষোভ বাড়ে।

জগৎ নিজের কাজের প্রশংসা পেলে আত্মগর্বে আপ্লুত হয়। তা দেখে পদ্মার মনে হয় বাজি বাঁধবার ক্ষমতাই সংসারে সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। একজন স্ত্রী হিসাবে স্বামীর প্রতি এই অভিমান স্বাভাবিক। আর তাই তাদের মধ্যেকার এই মান-অভিমানের সম্পর্ক গল্পের শুরুতেই আমরা লক্ষ করি। যেখানে দেখা যায় জেলা শহরে বাজি প্রদর্শনীতে জগৎ ভুঁইমালী প্রথম স্থান অধিকার করে রূপোর মেডেল জয় করেছে। আর তা দেখতে সকল প্রতিবেশী এগিয়ে এসেছে, কৌতূহলী হয়ে পদ্মাও সগর্বে তা দেখতে ছুটে আসে। এই পরিস্থিতিতে জগৎ তার ভগ্নীপতি নন্দকে আদেশ দেয় পদ্মাকে মেডেল ও সার্টিফিকেট দেখাতে। সেই সঙ্গে সে জানায় – তার ক্ষমতা আছে কিনা তা যেন পদ্মা বোঝে। আত্মীয়র কাছে স্বামীর এই কথার ধরণে সে বিরূপ হয় আর সেখান থেকে চলে যায়। তবে জগৎও তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। তাই সে শুধু মেডেল ও সার্টিফিকেট নয়, পদ্মার জন্য একখানা শাড়িও আনে। তাই সে শাড়িখানা নন্দের হাতে দিয়ে বলে – "মেয়ে মানুষের রাগ কেবল মেডেলে ভাঙবে না হে।"[১২৪] লক্ষণীয়, জগৎ সবই জানে অথচ নিজে গিয়ে স্ত্রীর হাতে শাড়িখানা ধরে দেয় না, প্রতিনিধিকে পাঠায়। আসলে জগৎও স্ত্রীকে ভালোবাসে কিন্তু সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই পদ্মার কাছে ধরা দিতে চায় না। অপরদিকে পদ্মাও তার স্বামীকে ভালোবাসে ও তারই গর্বে গর্বিত হতে চায়। তবে তা অভিমানের মুখোশের আড়ালে থাকে। তাই দেখা যায়, নন্দ যখন জিনিসপত্র দিয়ে যায় তখন সে তার প্রতি উদাসীনতা দেখালেও নন্দের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে কিন্তু প্রথমে মেডেলটিই কৌতূহলী হয়ে দেখে। আবার পরক্ষণেই জগৎ ছুটতে ছুটতে এসে পদ্মার হাত থেকে মেডেল নিতে চায় কারণ অন্যান্য প্রতিবেশীরা তা দেখতে চায়। এক্ষেত্রে স্বামীর কাছে ধরা পড়ায় পদ্মা একদিকে যেমন লজ্জিত হয় অপরদিকে স্বামীর উপেক্ষাও তাকে ক্রুদ্ধ করে। তাই দেখা যায় সে মেডেলটি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং জানায় –"আমি পারব না, পারো তো নিজে সেজে দাও গিয়ে।"[১২৫] অর্থাৎ স্বামীর এই সংসারের প্রতি তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। সেও স্বামীর সম্পর্কে উদাসীন। এই বিষয়টিই পদ্মা প্রকাশ করতে চায়। এর পিছনে আরও একটি কারণ ছিল – পদ্মা তার জমানো টাকা না দিতে চাওয়ায় জগৎ জানিয়েছিল সে টাকা তারই এবং তা নষ্ট করবার অধিকারও তার। এই প্রসঙ্গে জগতের উক্তি –"আমার টাকা, আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমি নষ্ট করি, পুড়িয়েছি তাতে

তোর কি, টাকা কি তোর বাবার ?"[১২৬] এই কথায় গভীর অভিমানে পদ্মা টাকা দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল জগতের বাড়ি, জগতের ঘর, পদ্মার এখানে কিছুই নেই। জগতের নিন্দা-প্রশংসায়ও কোন অংশ নেই পদ্মার। এই মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ স্বামীর সামনে সে করতে চেয়েছে।

এরপর ঘটনাক্রমে দেখা যায় – বাজির বায়না পেয়ে তা তৈরীর কাজে জগৎ আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতের পর রাত সে কাজে নিযুক্ত থাকে। অপরদিকে স্ত্রী পদ্মাও তো একজন রক্ত-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ। তার মধ্যেও শারীরিক চাহিদা জন্মে। সে স্বামীর শারীরিক সাহচর্য চায়, বিশেষত, মাঘের এই কন্‌কনে শীতে। এই প্রসঙ্গে তার মনের ভাব এরূপ –"মানুষের গায়ের গরম ছাড়া এত শীত কি কেবল লেপ কাঁথায় কাটে। অথচ এমনই কপাল পদ্মার, মানুষ তার থেকেও নেই। স্বামী বাড়ি থাকতেও একা একা এই দুঃসহ শীতে তাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। জগতের অনাদর অবহেলার কথা ভেবে দুঃখে ক্ষোভে চোখে জল আসে পদ্মার, বুকের ভিতর জ্বলে যেতে থাকে।"[১২৭] একটা সময় দেখা যায় পদ্মা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে কারখানা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে সে কখন শুতে আসবে। এর উত্তরে জগৎ পদ্মাকে শুয়ে পড়তে বলে; কেননা, তার এখনো অনেক কাজ বাকী। স্বামীর এই কথায় পদ্মা লজ্জিত ও অপমানিত হয়। তার আত্মসম্মানে বাঁধে। কারণ স্বামী হিসাবে তারই তাগিদ বেশি থাকা প্রয়োজন সেখানে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয় তাকে নিজের কাছেই হীন করে। এই পরিস্থিতিতে তার মনের ভাব ব্যক্ত হয় –"ছি ছি ছি হ'লই বা স্বামী। তবু তার কাছেও পদ্মার একটা মান অপমান আছে। জগতের নিজেরই যদি আসবার কথা মনে না থাকে, পদ্মারই বা কি দায় পড়েছে যে সেধে সেধে তাকে ডেকে নিয়ে আসবে।"[১২৮] এই ঘটনার পর পদ্মার অনুভূতির পরিবর্তন হয়। তাই শেষ রাতে যখন জগৎ আদর করতে আসে তখন পদ্মা গভীর অভিমানে তাকে ঠেলে ফেলে দেয়।

এইভাবে রাতের পর রাত উপেক্ষিত হওয়ার পর একদিন পদ্মা ইচ্ছাকৃত ভাবে স্বামীর সামনে থেকে নন্দকে ঘরে ডেকে আনে। এর পিছনে ছিল শুধুমাত্র স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবারই উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায় – ঘরে ডেকে পদ্মা নিবন্ত মাটির প্রদীপটা আর একটু উসকিয়ে দেয়। তার মনের গোপন কথাটি জানা যায় এইভাবে – "পদ্মা মিষ্টি গলায় জবাব দেয়, 'আছে, এসো। নন্দের পা কাঁপে, তবু আস্তে আস্তে বিছানার পাশে এসে বসে। ঘেঁষে বসে পদ্মার দিকে, পদ্মা সরে যায় না। গর্বে, আত্মপ্রসাদে তার মন ভরে ওঠে। জগৎ দেখুক তার আতসবাজির চেয়েও

বেশি ভোজবাজি জানে পদ্মা, তার রঙ, তার রূপ জগতের আতসবাজির চেয়ে হাজারো গুণ বেশি।"[১২৯] পদ্মা যে তার উদ্দেশ্যে সাফল্য অর্জন করেছে তারও প্রমাণ পাওয়া যায় –"পদ্মা আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। জগৎ পারতপক্ষে তার দিকে তাকায় না। কিন্তু যখনই চোখাচোখি হয় দুচোখ যেন জগতের জ্বলতে থাকে। পদ্মা জানে এ জ্বালা কেবল চোখেই নয়, এ জ্বালা বুকের ভিতর থেকে উঠছে। তা উঠুক, পদ্মাও কি কম জ্বলছে।"[১৩০] অর্থাৎ জগৎ পদ্মাকে ভুল বুঝেছে। ফলে সে তাকে আরও অবহেলা করতে থাকে। জগতের মনে হয় স্ত্রীর মত তার বিদ্যা কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবে সে যতই নিজেকে সান্ত্বনা দিক না কেন তথাপি তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্ত্রীর জন্য মনের এই চঞ্চলতা ভালোবাসারই নামান্তর। অপরদিকে শীতের রাতে উত্তাপহীন ঠান্ডা বিছানায় শুয়ে পদ্মার মনে প্রশ্ন জাগে সে সত্যি জিতেছে কিনা। এমনই মান-অভিমানের মাঝে ঘটনাক্রমে দেখা যায়, এক রাতে বিস্ফোরণে জগৎ তার এক হাতের আঙ্গুল হারায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর অভিমুখ পরিবর্তন হয়; সেই সঙ্গে দুজন দম্পতির সম্পর্কও অন্য মাত্রা লাভ করে।

দেখা যায়, পদ্মা সমস্ত মান-অভিমান ভুলে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করে। তার দু'হাতে সে দশ হাতের কাজ করতে থাকে। স্বামীকে সান্ত্বনা দেয় নানা ভাবে। পদ্মার এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জগতের মান ভাঙে। সে উপলব্ধি করে, স্ত্রী তাকেই একমাত্র ভালোবাসে। তাই সেও অভিমানে স্ত্রীকে জানায় – "তিনি আমার একখানা হাত নিয়ে শুধু দুখানা হাত কেন পদ্মা, একটা গোটা মানুষকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। সেও তো যেতে বসেছিল। ..... না পদ্মা বউ, শাস্তিও না পরীক্ষাও না, তোকে আর আমি অবিশ্বাস করি না। তুই আমার খাঁটি সোনা। আমার বাজির আগুনে আমিও পুড়েছি তুইও পুড়েছিস।"[১৩১] এই সত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ তার স্বপ্নের কথাও স্ত্রীকে জানায়। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে নন্দকে পুনরায় কাজে লাগাতে চাইলে পদ্মা তাদের মাঝে আর কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে চায় না। তাই সে নিজেই মাল-মশলা নিয়ে স্বামীর কাছে এসে তার শিষ্যপদ গ্রহণ করতে চায় – "বাইরের সাকরেদে তোমার আর কি দরকার ওস্তাদ। ঘরের পুরোন বাঁদীকেই তোমার সাকরেদ করে নাও।"[১৩২] এর প্রতিক্রিয়ায় শেষে আমরা দেখি – জগৎ স্ত্রীর কথার জবাবে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। এক্ষেত্রে তার মনে পড়েনি যে তার একখানা হাতের পাতা আজ আর নেই। অর্থাৎ যে আতসবাজি একদিন দু'জনকে পরস্পরের কাছ থেকে মানসিক ভাবে পৃথক করেছিল আজ সেই বাজিই পুনরায় দু'জনকে একাত্ম করে। এবার দুটি মানুষই মান-অভিমানের মুখোশ পরিত্যাগ করে পরস্পর পরস্পরের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়।

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র এইভাবে নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা, চাওয়া-পাওয়াকে নানান জটিল পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দেন, যা আসলে বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'দিগন্ত' পত্রিকায় বার্ষিক সংখ্যায় **'চাঁদ মিঞা'** গল্পটি প্রকাশিত হয়। এটি গল্পকারের 'গল্পমালা-১' এর অন্তর্গত। মানব-মানবীর বিচিত্র সম্পর্কের আর একটি দিক এই গল্পে ধরা পড়েছে। মূলত পুরুষ মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। আর সেই মানসিকতাকে কেন্দ্র করে তিনটি চরিত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণ নির্ণীত হয়েছে।

মানব মনের বিভিন্ন অনুভূতিগুলির মধ্যে একটি অনুভূতি হল ঈর্ষাবোধ। ঈর্ষা যখন ধীরে ধীরে হিংসায় পরিণত হয় তখন তার উগ্রতা অনেক বেশী ভয়ানক আকার ধারণ করে। এর প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ধ্বংসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বোধ শুভ ও নমনীয়বোধের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। আসলে অন্যকে দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়ার পেছনে থাকে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা। নিজের দুর্বলতা ও অপ্রাপ্তির সমান্তরালে যদি অন্যের সফলতা, সক্ষমতা দৃষ্ট হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই মন বিকৃত হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র তাই নয় সেই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কও বিকৃত রূপ লাভ করে। তবে একথা ঠিক, সময় মানুষের জীবনে নানা রকম পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করে থাকে। আবার এই পরিস্থিতি মানব মনে বিচিত্র অনু ভূতির জন্ম দেয়, যা বিচিত্র মানব সম্পর্কের উৎসস্থল। তবে সময় পরিবর্তনশীল কাজেই মনের অনুভূতিও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ একই অনুভূতি তথা একই সম্পর্ক মানুষের জীবনে দীর্ঘদিন ধরে চলে না, তা পরিবর্তিত হয়। তাই বলা যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিচিত্র সম্পর্কের সমষ্টি নিয়ে এই মনুষ্য জীবন অতিবাহিত হয়। এই জীবনেরই এক খণ্ড চিত্র আলোচ্য গল্পটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

'চাঁদ মিঞা' গল্পে প্রধান তিনটি চরিত্র হল – নশরৎ আলী, রাবেয়া ও চাঁদ মিঞা। নশরৎ আলী ও রাবেয়া দুজন দম্পতি। চাঁদ মিঞা নশরৎ আলীর দুধবরণ ঘোড়ার জন্য রাখা এক সওয়ার। এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের টানাপোড়েন আবর্তিত হয়েছে। গল্পের নাম 'চাঁদ মিঞা' হলেও আসলে এই গল্পের মূল চরিত্র নশরৎ আলী। এই চরিত্রটির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, তিনি একজন শৌখিন স্বভাব বিশিষ্ট মানুষ। জমিদার এই নশরৎ আলী মৃধা নানারকমের পশু-পাখি পালন করতেন। বিচিত্র রঙের ও বিচিত্র রকমের পাখি যেমন তার সংরক্ষণে ছিল তেমন ছিল ঘোড়া। তিনি বেছে বেছে নানা আকারের নানা রঙের ঘোড়া

আনতেন। শুধুমাত্র তাই নয়, ঘোড়ার রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রাখতেন সহিসদের। এবং ঘোড়ার নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে সেই সহিসদের নামও রাখতেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তিনি তার সবচেয়ে সুন্দর দুধবরণ ঘোড়ার জন্য অপুর্ব সুন্দর সোনারঙের চাঁদ মিঞাকে সওয়ার হিসাবে নিযুক্ত করেন। এমনকি দাতা হিসাবেও এই মানুষটির সুখ্যাতি ছিল। পৌষ মাসে ঘোড়া দৌড় উপলক্ষে তার এলাকায় যখন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হত তখন তিনি প্রত্যেক ঘোড়াওয়ালাকে কলস দিয়ে সম্মান দেখাতেন এবং তিনি তার সওয়ারদের দামী শাল বিতরণ করতেন। একটি মানুষের মধ্যে দোষ-গুণ উভয় দিকই বর্তমান থাকে। কাজেই নশরৎ আলীর চরিত্রের এই শুভ দিকের বিপরীতে আছে অন্ধকার দিক। তা হল তার মনের অন্ধ কু-সংস্কার বোধ। জমিদার নশরৎ আলীর কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল সন্তানের। প্রায় ষাটের কাছাকাছি যখন তার বয়স তখনও গুটি চারেক বিবি তাঁর ঘরে ছিলেন এবং আর গুটি চার পাঁচ মরে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। অসম্ভব জেদী এই চরিত্রটির মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে – "ছেলে যতদিন না হবে ততদিন কেবল বিবির পর বিবি এনে ঘর ভরে ফেলব, দেখি ছেলে না হয়ে যায় কোথায়। আমি জানি, আমার নিজের কোন দোষ নেই, ছেলে যে হয় না তা কেবল এই বিবিদের দোষ।"[১৩৩]

এরকম মানসিক অবস্থায় অপূর্ব সুন্দরী বিধবা রাবেয়াকে দেখে নশরৎ আলী মুগ্ধ হন এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাবেয়া চরিত্রটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। গল্পে পাওয়া যায় আঠারো-উনিশ বছরের অপরূপা তন্বী মেয়ে রাবেয়া সদ্য স্বামীকে হারিয়েছে। সেই হারানোর যন্ত্রণার ছাপ তার দেহ ও মনে স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে নশরৎ আলীর মত একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রস্তাব রাবেয়ার পরিবারের কাছে অভিশাপের মত। পিতা-মাতা হিসাবে একজন সন্তানকে তারা এভাবে বিসর্জন দিতে নারাজ। তাই এই মুলুক ছেড়ে তারা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের সন্তান হিসাবে রাবেয়া নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে, পরিবারের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিসর্জন করে নশরৎ আলীর হাতে। কেননা, সে জানে এই প্রভাবশালী জমিদারের হাত থেকে কোনও ভাবেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের দু'জনের বিয়ে হয় এরকম একটি মানসিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। তাহলে উপলব্ধি করা যায় – রাবেয়া ও নশরৎ আলী এই দুটি মানুষ যে দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হল সেখানে রাবেয়ার 'মন' নেই, শুধুমাত্র তার শারীরিক উপস্থিতিটুকু বর্তমান। কেবলমাত্র সম্পর্কের চিহ্নকে জীবনে বয়ে নিয়ে চলা, এছাড়া সেই সম্পর্কে কোন আবেগ বা

আন্তরিকতা নেই। তবে রাবেয়া স্ত্রী হিসাবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে কোনও খামতি রাখেনি। অপরদিকে রাবেয়াকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে যেন নশরৎ আলীর জীবন নতুন পথে ধাবিত হয়। রাবেয়া যেন তার জীবনের ভিত্তিস্তম্ভ। কারণ নশরৎ আলীর মনে এতদিন ধারণা ছিল, নারী শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। এছাড়া তাদের কোন নিজস্ব সত্তা নেই, কোন মূল্য নেই। কিন্তু রাবেয়াকে দেখে তার মানসিকতার পরিবর্তন হয়। এবং তিনি এই প্রথম কোন নারীকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখলেন। তার এই মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন; তাই রাবেয়াকে একদিন বললেন – "এতকাল ছেলে ছেলে করে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি। ভেবেছি স্বামীর কোলে ছেলে ধরে দিতে না পারলে স্ত্রীর রূপ বৃথা, তার মেয়ে জন্মটাই অর্থহীন। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ভুল এতদিনে ভেঙেছে। শুধু তুমিই যথেষ্ট। তুমি যে আছ এই সব চেয়ে বড় লাভ, পুত্রলাভ এর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তোমার কাছে আলাদা করে আমি কিছু চাই না, ছেলে নয়, মেয়ে নয়, আমি কেবল তোমাকেই চাই।"[১৩৪] প্রেমের দীপ্তি তথা ভালোবাসার আলোকে তার মনের সমস্ত অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হয়েছে। তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে তার কাছে প্রেম মুখ্য এবং প্রয়োজন গৌণ হয়ে ধরা দিয়েছে। তাই তার কাছে সমস্ত চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছ। তিনি শুধুমাত্র রাবেয়াকে চান। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম হল – প্রত্যেকটি মানুষ তার পছন্দের বিষয়কে একান্তভাবে নিজের করে পেতে চায়; কুক্ষিগত করতে চায় এবং তার মনে সেই পছন্দের বিষয়কে হারিয়ে ফেলার একটা ভয় সবসময় কাজ করে। এই জায়গা থেকেও মানুষের এককেন্দ্রিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ নিজ সত্তার চাহিদা পূরণের দিকেই মানুষ লক্ষ্য রাখে। এই মানসিকতা থেকেই বোধ হয় মানুষের প্রতি মানুষের তীব্র অধিকার বোধের জন্ম হয়। এই মনস্তত্ত্বের দিকটি নশরৎ আলীর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। আবার বলা যায় – যাকে মন পছন্দ করে বা ভালোবাসে, তার জন্য সবকিছু বোধ হয় করা যায়, তাকে খুশি রাখতে সবসময় মন চায়। তাই নশরৎ আলী রাবেয়ার চোখের জল মোছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। সোনাদানায় রাবেয়ার গা ভরে দিলেন, দাসী-বাঁদীতে ঘর ভরলেন। কিন্তু রাবেয়ার মন-কে পরিপূর্ণ করতে পারলেন না। তা যেমন শূন্য ছিল তেমন শূন্যই থেকে গিয়েছে। তবে নিজের ধন, ঐশ্বর্য দিয়ে রাবেয়ার জীবনকে পূর্ণ করতে পারলেও যৌবন ও রূপ দিয়ে যে পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয় সে বিষয়ে নশরৎ আলী অবহিত ছিলেন। এই দুর্বলতা সম্পর্কে ক্রমশ তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন।

এমত পরিস্থিতিতে রাবেয়ার সেই শান্ত বিষন্ন রূপ চাঁদ মিঞার গোচরে আসে। সে সেই

রূপ দেখে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। তাই ঘটনাক্রমে দেখা যায়, চাঁদ মিঞা রাবেয়াকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়, তখন রাবেয়া তা দেখে আপন খেয়ালেই হেসে ওঠে। শুধু তাই নয় পরক্ষণেই নিজেকে সংবরণ করে সে চাঁদ মিঞার পরিচর্যা করে। এই বিষয়টি নশরৎ আলীর কানে যায়। ফলে একদিকে বিগত যৌবনসম্পন্ন প্রৌঢ় পুরুষ নশরৎ আলীর দুর্বলতার বিপরীতে চাঁদ মিঞার পৌরুষ, যৌবনের উচ্ছলতা স্বাভাবিক ভাবে নশরৎ আলীর মনের ঈর্ষাবোধকে জাগ্রত করে। সে রাবেয়াকে প্রশ্ন করে – "সাদা ঘোড়ার পিঠে চাঁদ মিঞাকে বেশ মানিয়েছে না ?"[১৩৫] উত্তরে রাবেয়ার মনের প্রসন্নতাও ধরা পড়ে যায়, যখন রাবেয়া মৃদু হেসে বলে – "মানাবে না ? মানাবার জন্যই তুমি তো এমন করেছ। অমন খুবসুরৎ সওয়ারকে তুলে দিয়েছ অমন চমৎকার খুবসুরৎ ঘোড়ায়।"[১৩৬] রাবেয়ার এই প্রসন্নতা, চাঁদ মিঞার সম্পর্কে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা নশরৎ আলীকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করে। কথোপকথনের সময় দেওয়ালে টাঙানো আয়নার দিকে তারা দুজনেই তাকিয়ে ছিল। দেখা যায়, রাবেয়া দুটি বিস্মিত বিষন্ন চোখ মেলে আছে এবং স্বামীর দিকে চোখাচোখি হতেই সে চোখ নামিয়ে নিয়ে মাঠের দিকে তাকায়। এই সময় নশরৎ আলী দেখলেন – "সেই মুহূর্তে সমস্ত ঘোড়া গুলিকে পিছনে ফেলে চাঁদ মিঞার ঘোড়া বিদ্যুতের মত পাল্লা দিয়ে আর এক প্রান্তে মিলিয়ে গেল। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে নশরৎ আলী আবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন, তাকালেন অন্যদিকে মুখ ফেরানো রাবেয়ার দিকে। মনে হল, 'জোড় ঠিক মেলেনি'[১৩৭] এই মনোভাব থেকে এটা স্পষ্ট, সমস্ত ঘোড়াকে পেছনে ফেলে চাঁদ মিঞার দ্রুত ছুটে যাওয়া আসলে নশরৎ আলীকে পেছনে ফেলে রাবেয়ার মনকে জয় করে চাঁদ মিঞার জয়ী হওয়া। এবং নশরৎ আলী যে তার রূপ, পৌরুষ, যৌবন সব দিক দিয়ে রাবেয়ার মনকে জয় করতে ব্যর্থ, সে সম্পর্কে তিনি সচেতন। পরাজয় নশরৎ আলীকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। ফলে তার মনে ঈর্ষাবোধ ধীরে ধীরে হিংসায় পরিণত হতে থাকে। এই সময় তুমুল কলধ্বনিতে নশরৎ আলীর চমক ভাঙ্গে। শোনা যায় – "চাঁদ মিঞা জিতেছে। চাঁদ মিঞা জিতেছে।" এই পরিপ্রেক্ষিতে নশরৎ আলী অদ্ভুত হাসলেন; তার মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় এইভাবে – "তাঁরই ঘোড়া, তাঁরই সওয়ার, তবু জিত চাঁদ মিঞারই। নশরৎ আলীর নামগন্ধ কোথাও নেই।"[১৩৮] আর এই জয়লাভে রাবেয়ার পুলক তাঁকে আরও বিদ্ধ করে। ফলস্বরূপ, তাঁর মনের হিংস্রতা ভয়ানক আকার ধারণ করে; তিনি চাঁদ মিঞাকে চাবুকের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে গুহায় আবদ্ধ করে রাখেন।

চাঁদ মিঞার সর্বাঙ্গ বিশেষ করে মুখ নির্মম চাবুকের আঘাতে ছিঁড়ে ফেটে যায়। ক্ষতের

মুখে রক্ত কালো হয়ে জমে থাকে। স্ফীত মুখখানা এমন বিকৃত আর কুশ্রী দেখাচ্ছে যে মানুষের মুখ বলে চিনবার উপায় নেই। এই অবস্থায় চাঁদ মিঞাকে দেখে রাবেয়া আর্তনাদ করে ওঠে। সে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলে – "না, না আমি দেখতে চাই নে।"[১৩৯] রাবেয়ার এই প্রতিক্রিয়ায় নশরৎ আলী আত্মপ্রসাদে মগ্ন। – "সঙ্গে সঙ্গে নশরৎ আলী তার ক্ষীণকম্পিত দেহ দুহাতে তুলে নিলেন। ....শুধু চাঁদ মিঞা নয়, খোদার সমস্ত দুনিয়াটাকে যদি তিনি এমনি চাবুকের ঘায়ে বিকৃত করে দিতে পারতেন। .....রাবেয়ার শিহরিত কোমল বাহুখানির ওপর আস্তে নিজের দীর্ঘ প্রশস্ত হাতখানি রাখলেন নশরৎ আলী। সমস্ত সত্তা দিয়ে রাবেয়ার সেই শিহরণ তিনি যেন অনুভব করবেন, সমস্ত অনুভূতির মধ্যে সেই শিহরণটুকুকে তিনি যেন চিরকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখবেন।"[১৪০] এটি আসলে হিংস্রতা তথা বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ।

নশরৎ আলী ভেবেছিলেন – চাঁদ মিঞার দেহ ও মুখকে বিকৃত করলে বোধহয় রাবেয়া আর তার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। তাকে ঘৃণা করে দূরে সরে যাবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যায়, রাবেয়া আহত চাঁদ মিঞার সেবা শুশ্রূষা করে এবং ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করে। যদিও প্রথমদিকে চাঁদ মিঞা রাবেয়ার প্রতি গভীর অভিমানে তার পরিচর্যা গ্রহণ করতে চায় নি। তখন রাবেয়া তাদের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে তার নিজের হাতের আংটি চাঁদমিঞাকে পরিয়ে দেয়। যাই হোক, রাবেয়াকে শুশ্রূষা করা অবস্থায় দেখে নশরৎ আলী ক্রোধকে সংবরণ করতে না পেরে তাকে বাইরে এনে হত্যা করে। শুধু তাই নয় তিনি চাঁদ মিঞাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে তার হাতে রাবেয়ার আংটি দেখে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। আসলে মানুষের মনে একই আবেগ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। একরকম হীনমন্যতা, দুর্বলতা বোধ নশরৎ আলীকে ক্রুদ্ধ ও হিংস্র করে তোলে সাময়িক সময়ের জন্য সেই পরিস্থিতিতে, সেই মানসিকতায় সে তার ভালোবাসা তথা সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে পর্যন্ত হত্যা করে। কিন্তু চাঁদমিঞার হাতের আংটি দেখে তার পুনরায় মানসিকতার পরিবর্তন হয়। এবং তিনি উপলব্ধি করতে পারেন তার প্রিয় রাবেয়া একমাত্র চাঁদ মিঞাকে ভালোবেসেছিল। আর এই চাঁদমিঞাই রাবেয়ার একমাত্র ও শেষ চিহ্ন। তাই নশরৎ আলী তার ভালোবাসার মানুষের ভালোবাসার চিহ্নকে অর্থাৎ চাঁদ মিঞাকে বাঁচিয়ে রেখে আসলে রাবেয়াকেই মনে মনে সবসময় তিনি জীবন্ত রাখতে চেয়েছেন। তাই চাঁদ মিঞাকে তিনি আর হত্যা করতে পারেন নি এবং তাই হয়তো শেষ বয়সে চাঁদ মিঞাই নশরৎ আলীর একমাত্র প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল। আবার অন্যভাবে বলা যায়, নশরৎ আলী তার প্রিয়জনকে হারিয়ে যে কষ্ট ভোগ করছেন বা করবেন সেই সমান কষ্ট যেন চাঁদ মিঞাও সারাজীবন পায় তাই হয়তো

তাকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখানে ঈর্ষাবোধের আর এক দিকও কাজ করতে পারে।

'শুভদৃষ্টি' গল্পটি **'রান্না'** নামে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'ঊষা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পটিতে দেখা যায়, বিবাহ পূর্ববর্তী একটি সম্পর্ক দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিস্তৃত সময় পর্বে দুটি নর-নারীর মানসিকতার বিভিন্ন পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়, আর সেই সূত্র ধরে তাদের সর্ম্পকে নানা জোয়ার-ভাঁটার ঢেউ দোলায়িত করে।

গল্পে প্রধান দুটি চরিত্র – একজন নর - অনন্ত ও অপরজন নারী - বিশাখা। আমরা জানি নর ও নারী তাদের চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় বা নিজেকে বিপরীত পক্ষের কাছে আকর্ষিত করে তোলার চেষ্টা করে। এই বিষয়টিই আলোচ্য গল্পে নারী চরিত্র অর্থাৎ বিশাখার মানসিকতায় কাজ করেছে। সে তার বাবার রাঁধুনে বামুন অনন্ত কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে সেই ঘটনার মজা দেখতে চেয়েছে। আসলে সে অনন্তকে নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল। তার মনের ভাব তার মুখে ফুটে উঠেছে এইভাবে – "একটু হাসি-ঠাট্টা, একটু ছোঁয়া-ছুঁয়ি, চাওয়া-চাওয়ি মাত্র তো এই! সে সব তো ইচ্ছা করে করেছে বিশাখা মজা দেখবার জন্য, ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্য অনন্তকে।"[১৪১] এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু এই বিষয়টি অনন্তর মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ বিশাখার আচরণ-চোখের ভাষা তথা শারীরিক প্রতিভাষা অনন্ত -এর হৃদয়ে প্রেমানুভূতি সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছে। তার মন ভালোবাসার রঙেই রঞ্জিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশাখা ও অনন্ত উভয়ের প্রতি পারস্পরিক আচরণকে বিশাখার বাবা নর-নারীর স্বাভাবিক প্রণয়ঘটিত আচরণ বলেই ধরে নিয়েছেন। এবং তার নিজের এই বিশ্বাসের বা আশ্বস্তের উপর নির্ভর করে তিনি উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। আর তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং বিশাখার আসল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাবার এই সিদ্ধান্তকে সে তীব্র প্রতিবাদ জানায়; কেননা, বিশাখা জানে বিয়ে মানে কি ? বিবাহবন্ধন সম্পর্কে তার মনোভাব এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে – "এ যে কেবল একটু ছোঁয়াছুঁয়ি চাওয়া-চাওয়ি নয়, কেবল হাসি-ঠাট্টা ইশারা-ঈঙ্গিত নয়। এ যে অত্যন্ত স্পষ্ট অতি উচ্চারিত। এ যে চিরদিনের জন্য সমস্ত জীবন আর একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া, তা বুঝতে বিশাখার বাকি নেই। এক-আধ সময়ের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু আধটু হাসি-পরিহাস অনন্তের সঙ্গে চললেও আলো জ্বেলে বাসর সাজিয়ে সমাজের দশজনের সামনে বাপের রাঁধুনী বামুনের সঙ্গে যে বিয়ে চলে না, একথা কি বিশাখাকে শিখিয়ে দিতে হবে ?"[১৪২]

আসলে এই সম্পর্ক গ্রহণের আপত্তির মূলে ছিল বিশাখার আত্মসম্মানবোধ। সে জানে রাঁধুনি বামুনকে একজন পুরুষ হিসাবে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা গেলেও সমস্ত জীবনের জন্য তার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া যায় না। তাতে তার সামাজিক স্টেটাস তথা অবস্থান অবনমিত হয়। শুধুমাত্র সমাজে নয়, তার বিবাহিত দিদির সঙ্গে তার তুলনাটা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। যার দিদির স্বামী একজন বি.এ.বি.এল. উপাধিধারী প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান মানুষ, সেখানে অনন্তর মত একজন অনাথ রাঁধুনি বামুনের অবস্থানটি, বা, বলা যায় পার্থক্যটি অতি অসামঞ্জস্য – যা স্বাভাবিক ভাবে বিশাখার মনকে পীড়া দেয়। এই মানসিকতা বিশাখার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। সেই আহত হৃদয়েরই উত্থিত প্রশ্ন অনন্তের প্রতি – "তুমি বুঝি ওঁর কথা সব বিশ্বাস করেছ? বাবার সাথে সাথে তোমারও কি মাথা খারাপ হয়েছে ? তোমার সঙ্গে সত্যিই আমার বিয়ে হতে পারে ?"[১৪৩] এই প্রশ্নবাণে এতক্ষণে অনন্তের চমক ভাঙল। সেও বিশাখার বিয়ে করার আপত্তির মূল কারণ সম্পর্কে অবহিত হল। আর এই বিষয়টি তার আত্মসম্মানবোধকে আঘাত করে এবং সে নিজে অপমানিত বোধ করে; এই বোধ তার মনের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করে, যা থেকে তার মধ্যে এক তীব্র জেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব কাজ করে। তাই সে বলে – "দেখা যাক পারে কিনা।" এই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিশাখা যেন আর্তনাদ করে ওঠে – "কক্ষনো নয়, এ কি করে হবে? লোকের কাছে, আমার দিদি, জামাইবাবুদের কাছে মুখ দেখাব কি করে ? তুমি চলে যাও, পায়ে পড়ি তোমার; তুমি এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে।"[১৪৪] বিশাখার এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার মনোভাব অনন্তের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে শেষ পর্যন্ত অনন্ত-ই জয়ী হয়।

বিশাখার বাবা অনন্তর সঙ্গেই তার বিবাহ দেন। এই বিবাহের বন্ধন বিশাখার কাছে তার ভুলের শাস্তিস্বরূপ। বিশাখা এই সম্পর্কটিকে তার সামান্য ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গ্রহণ করেছে, বা, বলা যায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে এই সম্পর্কের প্রতি তার কোনরকম শ্রদ্ধা বা আন্তরিকতা ছিল না; বরং এই সম্পর্কটি তার পরাজয়ের স্মারকস্বরূপ, যা প্রতিনিয়ত আত্মযন্ত্রণা তথা আত্মগ্লানির জন্ম দেয়। তাই অনন্ত স্ত্রীর প্রতি স্বামীত্বের অধিকার যত প্রয়োগ করতে গিয়েছে বিশাখা তত বিরক্ত হয়েছে। ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের যে প্রকৃতি তা তাদের ক্ষেত্রে বিকৃত আকার ধারণ করেছে। তবে অনন্তের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। অনন্তের উৎসাহ আর উল্লাসে বিশাখার সমস্ত অন্তর যেন রাগে আর অপমানে জ্বলতে থাকে। সে মনে মনে ভাবে – "অনন্ত তো খুশি হবেই, উল্লাস তার মনে আসবেই। প্রভু কন্যাকে সে বিয়ে করে এনেছে। কিন্তু দাসের দাসী সেজে বিশাখার আনন্দ কোথায়, গৌরববোধের হেতু কোথায় তার ? .....বিশাখার

মনে পড়ল মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও রান্নার এসব নির্দেশ উপদেশ অনন্তকে সে আর তার মা-ই দু-বেলা দিয়েছে। আর আজ দু'ছত্র সংস্কৃত মন্ত্রে ভোজবাজির মত দুনিয়া গেছে উল্টে। বাড়ির ঠাকুর অনন্ত হয়েছে কর্তা আর বিশাখা হয়েছে তার রাঁধুনী।"[১৪৫] বিশাখার এই উপলব্ধি তাদের সম্পর্কে শুধুমাত্র তিক্ত করে তোলেনি সেই সঙ্গে তাদের মানসিক দূরত্বের পরিধিকে বৃদ্ধি করেছে। অনন্তও তার ধৈর্য্যকে স্থির রাখতে পারেনি। স্ত্রীর প্রতিক্রিয়ায় সেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তাই বিশাখা যখন বলেছে – 'রাঁধতে আমি জানি যে রাঁধব ?' এর উত্তরে অনন্ত তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলেছে – "হারামজাদী, নচ্ছার মাগী, রাঁধতে জানিস নে – স্বামীর সামনে সেকথা বলতে লজ্জা হয় না তোর ? .... তুই না রাঁধিস, তোর ঘাড় রাঁধবে, তোর বাপ এসে রেঁধে দেবে হারামজাদী।"[১৪৬] তাদের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়, সেসময় বিশাখার দিদি তার ভাসুরঝির বিয়ে উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ জানায়। অনন্ত -এর মত স্বামীকে আত্মীয়ের সামনে উপস্থিত করা বিশাখার পক্ষে মান-সম্মানের প্রশ্নই বড় হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে সেখানে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তবে শেষ পর্যন্ত সেখানে গেলেও অনন্তকে সমস্ত বিষয় শিখিয়ে পড়িয়ে সে নিয়ে যায় এবং সবসময় চোখে চোখে রাখে। এই বিষয়টি অনন্তর কাছে অপমানজনক বলে মনে হলেও সাময়িকভাবে সে স্ত্রীর কথাই মেনে নেয়। এবং ঘটনাক্রমে দেখা যায়, বিয়েবাড়ির রান্নার দায়িত্ব পড়ে রান্না বিষয়ে অনভিজ্ঞ বিশাখার উপর। এমত অবস্থায় অনন্ত বিশাখার পাশে এগিয়ে এসে যথার্থ জীবনসঙ্গীর দায়িত্ব পালন করে। যে বিষয়টি বিশাখার মানসিকতা পরিবর্তনে সাহায্য করে। আর এই মুহূর্ত থেকেই তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের যথার্থ প্রকৃতিটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এবং এখানেই দুটি শুদ্ধ মনের প্রথম শুভদৃষ্টি হয়। একটি সমান্তরাল অর্থাৎ সত্যের আড়ালে মিথ্যা সম্পর্ক দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল তা মুখোশ খুলে দাম্পত্য সম্পর্কে পদার্পণ করেছিল সেখানে সেই মিথ্যা অনুভূতির বিকৃত রূপের প্রভাবে সম্পর্কটি ভগ্নপ্রায় পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সেই মুহূর্তের একটি ঘটনার মাধ্যমে। লেখক যেন লাগাম টেনে ধরলেন দুটি চরিত্রেরই মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে। ভগ্ন সম্পর্কটি পূর্ণতা লাভ করল। এখানেই একটি সম্পর্কের বৈচিত্র্য। এবার বিশাখা ও অনন্ত-এর দাম্পত্য সম্পর্কটি সত্যিকারের অনুভূতি তথা ভালোবাসার রসে সিক্ত হয়ে যেন নবজন্ম লাভ করল।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'দিগন্ত' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় **'একূল-ওকূল'** গল্পটি **'এপিঠ-ওপিঠ'** নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তন করা হয়।

একটি নারী চরিত্রের আত্মকথনের মাধ্যমে গল্পের কাহিনী অগ্রগতি লাভ করেছে। গল্পটিকে 'দাম্পত্য সম্পর্কের উত্থান-পতন' শীর্ষক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত; কারণ – গল্পের কাহিনীতে দেখা যায়, বিবাহ বহির্ভূত একটি সম্পর্ক দাম্পত্য সম্পর্কে পদার্পণ করে এবং সম্পর্কের এই গোত্রান্তর পর্বে এসেই চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায় নানা মানসিক টানাপোড়েন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে চরিত্রগুলির আত্মোপলব্ধি ঘটে এবং তার উপর ভিত্তি করেই তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণটি নির্ণীত হয়।

আলোচ্য গল্পে মূলতঃ তিনটি চরিত্র। দু'জন নারী - সুরমা ও মীরা এবং একজন পুরুষ - নীরদ। কাহিনীর সুদর্শন পুরুষটি বিবাহিত, শিক্ষিত ও শিল্পবোধ সমন্বিত একজন মানুষ। তার স্ত্রীও অপূর্ব সুন্দরী। তবে তার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি নেই। এই বিষয়টি পুরুষ চরিত্র অর্থাৎ নীরদবাবুর মনে অভাববোধের জন্ম দেয়। রুচিশীল এই মানুষটি চেয়েছিলেন – তার স্ত্রী একই সঙ্গে রূপ সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে সে তার স্ত্রীকে পায়নি। কাজেই এই অপূর্ণতার জায়গা থেকেই নীরদবাবু চাকরীসূত্রে শহরে এসে বন্ধুর রুচিশীলা বুদ্ধিদীপ্তি সম্পন্না বোনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাকে দেখে নীরদবাবুর মনে হয়েছে বুদ্ধির একটা আলাদা রূপ আছে। বুদ্ধিদীপ্ত রূপ। রূপ পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিন্তু দীপ্তিটুকু থাকে। সেই সঙ্গে রূপ সম্পর্কে তার মতও ব্যক্ত হয়েছে এই ভাবে – "প্রচলিত অর্থে রূপ আমি দেখেছি। দেখে দেখে চোখ যেন বড় বেশী অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে রূপ শিমূল পলাশের রূপ কেবল চোখের সামনেই জ্বলে, মনের ভেতরে নয়।"[১৪৭] এ প্রসঙ্গে বলা যায় লেখক দুটি নারী চরিত্রকে পরস্পরের বিপরীত আদলে গড়ে তুলেছেন। নীরদবাবুর স্ত্রী সুরমা অপরূপা, অপরদিকে অন্য নারী চরিত্রটি অর্থাৎ মীরা একজন রূপহীনা রূচিশীলা বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী নারীসত্তা। মীরার বুদ্ধিদীপ্তির ছটা তার রূপহীনতার খামতিকে পূর্ণ করেছে। তবে রূপের অভাব মীরার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে হীনমন্যতার জন্ম দেয়; তার উপর এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মানুষের সহানুভূতি প্রদর্শন যেন আরও বিরক্তির উদ্রেক করে। কাজেই নিজের জীবনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের কোণে ছিল গভীর রূপতৃষ্ণা। এটাই স্বাভাবিক, যা নিজের মধ্যে নেই তাকেই মানুষ আপন করে পেতে চায়। তাই এই অসীম রূপতৃষ্ণা থেকেই প্রথম দিন সুদর্শন নীরদবাবুকে দেখে মীরা আকৃষ্ট হয়েছিল। এই আকর্ষণের মূলে ছিল নীরদবাবুর অসীম রূপ সৌন্দর্য। তা মীরার আত্মকথনেই ধরা পড়েছে – "লুকিয়ে লাভ নেই নিজের মনকে আঁখিঠারার অভ্যাস নেই আমার। ওঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লোভ আমার উদ্দাম হয়ে উঠেছিল।"[১৪৮]

অপরদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে মীরার বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার প্রতি নীরদবাবু আকৃষ্ট হলেও

এই আকর্ষণের সমান্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল আর একটি আকর্ষণ, তা হল – গভীর যৌন আকাঙ্ক্ষা। তা ধীরে ধীরে সময়ের ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাল মিশিয়ে স্পষ্ট হতে থাকে। মীরার আকর্ষণেরও মূলে ছিল নীরদবাবুর দেহকেন্দ্রিক রূপ-যৌবন। কাজেই উভয়ের আকর্ষণ যখন উভয়ের বাহ্যিক ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে দেহে এসে উপস্থিত হয় তখন দুটো শরীরই মিলনের মত্ততায় উদ্‌ভ্রান্ত । এ যেন শরীর দিয়ে শরীরকে জেনে নেওয়া। আর জানার মত্ততাকে আরও বিস্তৃত করেছে পরস্পরের সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডী এবং এই গণ্ডীকে এড়িয়ে সামান্য একটু স্পর্শের সুখ। কেননা, এই সামান্য ছোঁয়াছুঁয়ি যেন ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অল্প একটু খাদ্যের স্বাদ তুলে দিয়ে খাবার সরিয়ে নেওয়ার মত ব্যাপার। ফলে এই দুই বিষয় যখন তাদের মিলনের উন্মত্ততাকে বাড়িয়ে তোলে তখন তাদের সামনে শুধুমাত্র তাদের সম্পর্কটিই অচ্ছেদ্য; বাকী সবরকম বাধাবিঘ্নকে তারা অবাধে ধ্বংস করেছে নিজেদের মত করে। আর সেই উদ্দামতা-উচ্ছ্বলতাকে স্বীকৃতি দিতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই পর্যায়ে এসে দেখা যায়, দেহ-রূপ নিয়ে মীরার মনে যে গ্লানি ছিল তা অনেকটা দূর হয়ে যায়। সে যেন তার দেহের গুরুত্ব ও মূল্যকে নতুনভাবে উপলব্ধি করে নীরদবাবুর চোখ দিয়ে। এই বিষয়ে মীরার মন্তব্য – "জন্মাবধি নিজের দেহকে মনে মনে ধিক্কার দিয়ে এসেছি। বলেছি, সুন্দরই যদি না হল এই দেহের প্রয়োজন ছিল কি ? এর চেয়ে নিরাবয়ব কতগুলি ধারণার পুঞ্জ করে কেন বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করল না ? তাহলে তো রূপহীনতার এমন লজ্জা আর গ্লানি আমাকে বয়ে বেড়াতে হত না। কিন্তু সে ক্ষোভ আজ আমার নেই। আজ এই দেহের জন্যও আমি গৌরব বোধ করছি। দেহ না থাকলে কি করে চলত। তোমাকে এমন সম্পূর্ণ করে পেতাম কি করে ?" মীরার এই মতান্তরকে স্বীকৃতি দিয়ে নীরদবাবু বলেছে – "প্রথম প্রথম আমারও তাই ভয় হয়েছিল। কেবল একরাশ কথা, কেবল কতগুলি মত, কতগুলি ধারণা। তোমাকে বুঝি হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না হৃদয় দিয়ে। কিন্তু নিজের তুমি অমন করে নিন্দা করতে পারবে না। এখন আমার, এ দেহ আমার সম্পদ।"[১৪৯]

কিন্তু একটা বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে নিজের বলে পাওয়ার জন্য সেই মুহূর্তের পর্বটিতে একটি মানুষের মধ্যে যে উদ্দীপনা তথা আকাঙ্ক্ষা কাজ করে, বিষয়টি নিজ কেন্দ্রভূত হলে পূর্বের সেই আবেগ ও কৌতূহল হারিয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক কারণ – সময় বদলায়, অনুভূতি বদলায় ও মন বদলায়। মানুষ একে অপরকে বড় বেশী জেনে ফেলে। পরস্পরের প্রতি কোন রহস্য আর অবশিষ্ট থাকে না। আর তখনই মূল সমস্যা সৃষ্টি হয়, দেখা যায় মনান্তর, মতান্তর। আলোচ্য গল্পে নীরদ ও মীরার বিবাহ পরবর্তী জীবনে এই বিষয়টিই প্রতিক্রিয়া করেছে।

মীরা নীরদবাবুকে নিজের মত করে ধরে রাখতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি। নীরদবাবুর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে তাকে দূরে সরিয়ে এনে মীরা নিজের বন্ধুবর্গের ঘেরাটোপে নীরদবাবুকে আবৃত করেছে। সাংসারিক কাজের মাধ্যমে পূর্বের স্মৃতিকে বিস্মৃত করার চেষ্টা করেছে। তবে প্রতি মুহূর্তে হারানোর ভীতির তাড়নায় মীরাও ক্লান্ত। অপরদিকে নীরদবাবুও বন্দী জীবনের একঘেয়েমিতায় ক্লিষ্ট। সেও যন্ত্রের মত সংসারে অবস্থান করে এবং তার মন নিজকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। এইক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্তির গাঢ়তা তার কাছে বোঝা-স্বরূপ। তাই রূপের স্নিগ্ধতার পরশ পেতে মন বড় উতলা হয়ে ওঠে। ফলে মীরার কুরূপ তার কাছে অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। নীরদবাবু মীরাকে বলে – "তোমার শরীর ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"[১৫০] শরীর সম্পর্কে স্বামীর মনের পরিবর্তন এবারও মীরা নীরদের চোখেই দেখতে পায়। তবে স্বামীর কথায় মীরা আবার পড়াশুনা শুরু করে। একসময় তাদের অন্তরঙ্গতার মূলে এই বইপত্রই ছিল মূল মাধ্যম। তাই পূর্বের সম্পর্কের মধুর নির্যাসকে ফিরে পেতে পুনরায় যখন পর্যালোচনায় বসল তখন দেখা গেল পূর্বের তুলনায় বর্তমান সম্পর্কের বিস্তর পার্থক্য। এই বিষয়টি মীরার আত্মকথনে উঠে এসেছে এইভাবে – "পড়াশুনা আরম্ভ হল। কিন্তু সময় বদলে গেছে, বদলে গেছে জীবনের স্বাদ। তখন অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সম্পূর্ণ মন সংযোগ সম্ভব হয়নি। বইয়ের পাতার আড়ালে দুজনে দুজনকে দেখেছে, পাতা ওল্টাতে হাতে হাত ঠেকেছে, আঙুল ছুঁয়ে গেছে আঙুল। আজ আর সেই লুকোচুরি উঞ্ছবৃত্তির প্রয়োজন নেই। দূরে তীরে বসে আজ এক ফোঁটা জলের জন্য কাঙালপনা করবার দরকার হয় না। অতল গভীর সমুদ্র রয়েছে সামনে। যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেই চলে। কিন্তু উৎসাহ কই, ঔৎসুক্য কই ? এ যেন তীরে ঘেরা দুই আলাদা লবণ সমুদ্র। সেই তীরের বেড়া কে ভাঙবে ? ভেঙ্গে লাভই বা কি ? কারো অন্তরের তৃষ্ণাই কি এই লোনাজলে মিটবে ?"[১৫১] তাদের অবনমিত সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মীরার এই কথা প্রসঙ্গে নীরদবাবুর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে – "চুপ কর। কথা বলতে পার বলেই যে সব কথা তোমার মুখে সুন্দর শোনায় তা ভেবো না। আমার ভুল হয়েছিল। মুখরা মেয়ের মত তুমি কেবল কথা বলতেই জানো, থামতে জানো না। ভাষার মত জীবনে আভাসেরও যে প্রয়োজন আছে একথা তোমার জানা নেই।"[১৫২] একদিন মীরার মুখের কথার মায়াজাল নীরদকে মুগ্ধ করেছিল। আজ এই প্রেক্ষাপটে এসে তা তার মনে শুধুমাত্র বিরক্তি উৎপন্ন করে। নীরদ তার ভুল বুঝতে পারে। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে তার ধারণা ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে – "প্রায়শ্চিত্ত জীবনের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তার জন্য হাসতে হয়, ভান করতে হয়

ঘর সংসারের, বেশ ধরতে হয় সুখী দম্পতির। প্রায়শ্চিত্ত কেবল মুখের কথায় চলে না মীরা।"[১৫৩] স্বামীর মুখে এই চরম সত্য কথাটি শোনার পর মীরার কাছে তাদের সম্পর্কের নগ্নরূপটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং সেই প্রাণহীন সম্পর্কের প্রকৃতির আঘাত তার হৃদয়রাজ্যকে আলোড়িত করে তোলে। নিজ অস্তিত্ব সেখানে বিপন্ন। তাই মীরা আপন মনে বলে – "এতদিন যা তিনি আভাসে ইঙ্গিতে বলেছেন আজ তা স্পষ্ট কথায় বললেন। আমার কাছে যা স্বপ্ন বা সাধ যা পরম আনন্দের ওঁর কাছে তা ভুলের প্রয়শ্চিত্ত মাত্র, আর কিছু নয়। একথা শুনবার পরেও আর কি বাকি রইল ? কিন্তু বাকি আছে। জীবনের প্রয়োজন তো কেবল কথায় শেষ হয় না। রঙবাতির রঙটুকু মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার দগ্ধ শলাকাটি অবশিষ্ট থাকে। তার ক্ষয় নেই।"[১৫৪] স্বামীর মনে নিজের সম্পর্কে নব মানসিকতা জানার পর মীরা চাকরি নিয়ে দূরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে মীরা আশা করেছিল তার দূরে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গে স্বামী বাধা দেবে বা এই সিদ্ধান্তে কষ্ট পাবে। কিন্তু আশা নিয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখে সে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, যা মীরার মনকে আরও আঘাত হানে। অভিমানে সে সমস্ত কিছু ছেড়ে দূরে চলে যায়। সম্পর্কের রূপরেখা এই পর্যায়ে এসে তাদের শুধুমাত্র মানসিক দূরত্বকে বৃদ্ধি করেনি, শারীরিক দূরত্বও সৃষ্টি করেছে।

মীরার চলে যাবার পর নীরদবাবুর প্রথম স্ত্রী সুরমা তার সন্তানদেরকে নিয়ে স্বামীর কাছে চলে আসে। এই কথা শুনে মীরার অভিমানী সত্তা আরও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। স্বামীর এই পরিবর্তনকে স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে মীরা ফিরে আসে। এবং ঘটনাক্রমে সেই খবর শুনে সুরমা মীরার সঙ্গে দেখা করে। প্রথমটায় সতীনের উপস্থিতি মীরার কাছে আরও বেশী যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কিন্তু মীরা যখন শুনলো – নীরদবাবু তারই ভাবনায় সবসময় আনমনা হয়ে থাকে, তাই এই উদাসীন স্বামীকে নিয়ে সংসার করার চেয়ে সতীন নিয়ে সংসার করা অনেক ভালো ভেবে সুরমা মীরাকে নিয়ে যেতে এসেছে। এই কথায় স্থূলবুদ্ধিসম্পন্না সুরমার হৃদয়ের যে যন্ত্রণা ধরা পড়েছে, তাতে মীরাও একাত্মতা অনুভব করেছে। মীরার মনে হয়েছে – এই সুরমা তারই যেন প্রতিনিধি। সে নিজেকে যেমন করে চেনে, এই সুরমাকেও যেন বিশেষভাবে চেনে। এই একই অনুভূতিতে দুটি সত্তা একাকার হয়েছে। তবে মীরা একথা শুনে খুশিও হয়েছে এই কারণেই যে তার স্বামী তাকে ভুলে যায়নি। তাকে ভেবেছে। এই সত্যটুকু মীরার জীবনে পরম পাওয়া। মনের এই সত্যিকারের অনুভূতি দেহ তথা সমস্ত রকম প্রয়োজন ও চাহিদাকে অতিক্রম করে একটি গভীর সত্যের অনুভূতিকে লাভ করা। আসলে নীরদবাবু রূপ ও বুদ্ধিদীপ্ততা এই দুটো

সত্তাকেই ভালোবেসেছিল। এবং দুটোকেই একত্রিত ভাবে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তা তার জীবনে সম্ভব হয়নি। তাই যে সত্তা তার কাছে থেকেছে তখন সে অন্য সত্তার অস্তিত্বের অভাব বোধ করেছে। অন্যদিকে সুরমা সাধারণ একটি গ্রাম্য মেয়ে। সে হয়ত রুচিহীন স্থূলবুদ্ধির অধিকারী, তথাপি স্বামীর মনের টানাপোড়েন তথা অন্যের জন্য ভাবনার বিষয়টি তার মনকেও পীড়িত করে। সেও অস্তিত্বহীনতায় ভোগে, যা একজন রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। তাই হয়তো সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করে সে মীরাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। মীরাও তার জীবনের শেষ অনুভূতিকে পাথেয় করে দূরে চলে যায়। আসলে এই পর্যায়ে এসে প্রত্যেকটি চরিত্রের আত্ম উপলব্ধি ঘটে। সম্পর্কের নব সমীকরণ নির্মাণ লাভ করে। একজন পুরুষ চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে দুটি নারীর সঙ্গে পারস্পরিক যে সম্পর্ক নিয়ে কাহিনীর সূচনা হয়েছিল তা নানা খাতে বাহিত হয়ে এক বিশেষ অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে এই কাহিনীর আপাত সমাপ্তিকে ঘোষণা করেছে।

কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'রস'** (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) গল্পটি কেবলমাত্র তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসেই নয়, সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি 'মাইলস্টোন'। ভিন্ন এক স্বাদের গল্প এই 'রস'। আপাতদৃষ্টিতে এখানে রূপাসক্তির সঙ্গে জীবিকা তথা ক্ষুন্নিবৃত্তির সংঘাত আছে বলে মনে হলেও আসলে প্রধান দুটি মানুষের হৃদয়-রসের টানাপোড়েন তুলে আনাই ছিল লেখকের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই গল্পে নানা ঘটনার পর্যায়ক্রমের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত হৃদয়ানুভূতি তথা জীবনরসেরই উৎসরণ ঘটেছে।

আলোচ্য গল্পের চরিত্রগুলি মুসলমান সমাজ থেকে উঠে এসেছে। এই সমাজের 'বহুবিবাহ' প্রথাকে গল্পকার বিশেষভাবে ব্যবহার করে কাহিনী-জাল বয়ন করেছেন। সেই সূত্রেই এখানে বেশ কয়েকটি দাম্পত্য সম্পর্কের বলয় পরিলক্ষিত হয়। তবে মূলত দুটি দাম্পত্য সম্পর্ক-ই তথা মানব-মানবীর সম্পর্কই এখানে আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়। এই দুটি সম্পর্কের কেন্দ্রে আছে নায়ক মোতালেফ এবং দু'পাশে দুই নায়িকা মাজু খাতুন ও ফুলবানু। অতীতের কিছু ঘটনাসহ এই গল্পের কাহিনীকাল প্রায় দু'বছর সময় ব্যাপী বিস্তৃত। কাহিনীর সূচনা কার্তিক মাসে। প্রথম দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন অর্থাৎ বয়সে বড় মাজু খাতুনকে মোতালেফের বিবাহ করবার মূলে ছিল 'প্রয়োজনের' তাগিদ। তবে সে প্রয়োজন মিটবে পরোক্ষভাবে। বিষয়টি কীরূপ তা বুঝে নেওয়া যাক। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ বিপত্নীক মোতালেফ চরকান্দার গাঁয়ের এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানুর রূপ-যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাকে

ঘরে আনতে গেলে মোটা অর্থের প্রয়োজন। তবে 'গাছি' মোতালেফের শুধুমাত্র খেজুর রস সংগ্রহ করলেই চলবে না, তা জ্বাল দিয়ে ভালো মানের গুড় তৈরী করতে হলে একজন দক্ষ মানুষের দরকার। আর তা গাঁয়ের রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজু খাতুনের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। সুতরাং ব্যবসায় ভালো আয় করতে হলে মাজু খাতুনকে বিবাহ করা অত্যন্ত জরুরী। আর অর্থ জোগাড় হলে তার আসল প্রয়োজনও খুব সহজেই মিটে যাবে। তাই যে মোতালেফ গাছের রস নিংড়ে নেওয়ার কৌশল জানে, নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্ত্রীলোককে কোন্ কথায় আঘাত করলে 'রস' নিঃসৃত হবে সেটাও সে ভালোভাবেই জানত। এই কারণেই মোতালেফ মাজু খানুনকে জানায় – "তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশান কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?"[১৫৫] অর্থাৎ বলতে চেয়েছে ক্ষুধা ও প্রবৃত্তির চাহিদা এই দুই-এর সমাধান হল মাজু খাতুন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, মাজু খাতুনের স্মৃতিচারণায় উঠে আসে যে স্বামী রাজেক মৃধা একটু কঠিন ও কাঠখোট্টা ধরণের ছিল, ভারি কড়া-কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় – মাজু খাতুন হয়তো স্বামীর কাছ থেকে এমন ধরণের কথা কখনো শোনেনি। কাজেই মোতালেফ-এর মুখ থেকে এমন কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই মাজু খাতুনের মন দোলায়িত হয়। তাই দেখা যায়, মোতালেফ এই কথাগুলি বলে তখনকার মত বিদায় নিলেও অন্ধকার নিঃসঙ্গ সজ্জায় তার কথাগুলি মাজু খাতুনের মনের কোণে তোলপাড় করতে থাকে। তাই বলা যায় – মাজু খাতুন যে মোতালেফের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল সেখানে তার 'মন'-এর প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি। অপরদিকে সেখানে মোতালেফের ছিল কেবলমাত্র হিসাবী সত্তা। অর্থাৎ দুই বিপরীত ধরণের মানসিকতা একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। তবে প্রয়োজনের উদ্দেশ্যেই তাদের সেই দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল।

মাজু খাতুনকে মিথ্যে ভালোবাসার প্রলোভন দেখিয়ে তার 'হাতের গুণ' কিনেছিল মোতালেফ কেবলমাত্র এক শীতের মাস গুলির জন্য। সেই মানসিকতা থেকেই তার মনে ভাবনা জাগে –"গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজু খাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে।"[১৫৬] তবে এই কেনা-বেচার আবহ ভঙ্গ হয় একদিন। অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই মাজু খাতুনকে তালাক দিয়ে ফুলবানুকে মোতালেফের নিকা করবার মধ্য দিয়েই কাহিনীতে দ্বিতীয় দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা ঘটে। মোতালেফ তার কাঙ্ক্ষিত মানুষকে কাছে পেয়ে রূপ ও শরীরের তৃষ্ণা মেটায়। তবে আমরা জানি – এক, নিরবিচ্ছিন্ন ভোগ মনে একঘেয়েমির ক্লান্তি বয়ে আনে।

দুই, যৌন চাহিদার মত খাদ্যের চাহিদাও মানুষের একটি প্রধান প্রবৃত্তি। এই দু'ইয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান। আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য এই দুয়েরই প্রয়োজন আছে। ফুলবানু চরিত্রটি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে সে রূপ-যৌবনের উন্মত্ততায় বিভোর একজন নারী। তার মধ্যে রোমান্টিকতা, উচ্ছ্বলতা বয়সের কারণেই বেশি। মোতালেফের ভাষায় সে 'কাঁচা রসের হাড়ি'। তবে মোতালেফ ফুলবানুকে রূপের সঙ্গে সঙ্গে গুণের অধিকারীও করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। কেননা, ফুলবানু একজন দেহ সচেতন লাস্যময়ী নারী, সে শিল্পী নয়। এই জায়গায় দাঁড়িয়েই ফুলবানুর সঙ্গে মাজু খাতুনের তুলনাটা স্বাভাবিকভাবেই মোতালেফের মনে উঁকি দেয়। সুতরাং এই মানসিকতার প্রেক্ষাপটে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক যে স্বাভাবিকতা হারিয়ে জটিল রূপ ধারণ করবে তা বলাই বাহুল্য।

এক্ষেত্রে বলতে হয় – মোতালেফ জানে - যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলাতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। অর্থাৎ গাছ কাটার ব্যাপারে মোতালেফ একজন দক্ষ মানুষ। সেও একজন শিল্পী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এই শিল্পীর চোখই একদিন ভালো গুড় তৈরী করতে পারে এমন একজন শিল্পীকে চিনতে পেরেছিল। তবে প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সেই চেনা সেদিন গভীরতা লাভ করেনি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একটি শিল্পী মন-ই আর একটি শিল্পী মনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তার শিল্প-গুণকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, ফুলবানু যদি 'কাঁচা রস' হয় তবে সেই রসের গাঢ় জমাট বাধা রূপ 'গুড়' -এর প্রতীকে মাজু খাতুন চরিত্রটি বিশ্লেষণ করা যায়। এই গুড় শুধু মাত্র ক্ষুধা নিবারণ করে তাই নয়, তাতে থাকে এক শিল্পীর হাতের গভীর ছোঁয়া, তার হৃদয়াবেগের স্পর্শ। তা বোধহয় মোতালেফ এই পর্বে এসে অনুভব করে। কাজেই বলতে হয়, সময় নিজেকে আবর্ত করে, জীবন রস তার নিজের গতিপথ তৈরী করে। হৃদয়ানুভূতি জাগ্রত হয় নিঃশব্দে। তাই একদিন যাকে 'পেত্নী' বলে সম্বোধন করেছিল তার বাড়ির উঠোনেই আবার মোতালেফকে ফিরে যেতে হল। হৃদয়ের গহন গভীরে যে 'রস' আজ চোরাস্রোতে বইছে মোতালেফের শরীরে তার পরিণতি কি হয় তা পাঠকের কাছেও উৎসুক্যের কারণ।

ঘটনাক্রমে দেখা যায় – মোতালেফ মাজু খাতুনকে তালাক দেওয়ার পর নাদির শেখের সঙ্গে মাজু খাতুনের আবার নিকা হয়। এদিকে ফুলবানু ভালো গুড় তৈরী করতে না পাড়ায়

মোতালেফ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি মাজু খাতুনের হাতের গুণকে সে বুঝতে পারে। আসলে জীবন যে কী চায়, আবার নতুন কী আস্বাদের পথে ঠেলে দেয় তা কেউ আমরা জানি না, শুধু পরিবর্তনটুকুই বুঝতে পারি। তাই নাদির শেখের বাড়িতে স্বয়ং মোতালেফ উপস্থিত হওয়া মাত্রই মাজু খাতুন তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ে। যা ছিল খুবই স্বাভাবিক। মাজু খাতুন-এর এমন প্রতিক্রিয়ায় মোতালেফের মনে যে ভাবনা জেগে ওঠে তা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় – "কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে; মাজু খাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।"[১৫৭] অর্থাৎ মোতালেফ মাজু খাতুনের মনে অভিমানের সন্ধান পেয়ে যেন স্বস্তি বোধ করে। কেননা, খেজুর গাছের দেহে শক্ত আবরণ থাকলেও ছ্যানের ছোঁয়ায় সেই শক্ত খোলসের নীচ থেকে বেরিয়ে আসে সুস্বাদু মিষ্টি রস। কঠিন মাজু খাতুনের অন্তরালেও যে হৃদয়রসের ফল্গুধারা বইছে সে বিষয়ে মোতালেফ নিশ্চিন্ত হয়। এ বিষয়ে বোধ হয় সকলেই একমত যে মাজু খাতুন তীব্র অভিমান বশতই মোতালেফের প্রতি এমন বিরূপ আচরণ করে। আর এই অভিমান আসলে গভীর ভালোবাসা থেকেই জন্ম নেয়। মাজু খাতুন মোতালেফকে ভালোবেসেছিল বলেই তার তালাক দেওয়ার বিষয়টিতে সে ভীষণ আহত হয়। আর এই হৃদয়যন্ত্রণা থেকেই বোধহয় যখন পাড়াপড়শীরা ফুলবানুর প্রতি মোতালেফের সোহাগ-ভালোবাসার কথা জানিয়ে যায়, সে সময় বুকের ভেতরটা জ্বলে ওঠে মাজু খাতুনের। শুধু তাই নয়, রাজেক মৃধার বড় ভাই এই নাদির শেখের সম্বন্ধ নিয়ে এলো, তখন মাজু খাতুন জানতে চায় – সে গাছি কিনা, খেজুর গাছ কাটতে যায় কিনা। নারী হৃদয়ের এই মান-অভিমান-এর উৎস কোথায় তা আমাদের পাঠককুলের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

অপরদিকে মোতালেফ জানিয়ে দেয় যে সে রস নাদির শেখকে দেওয়ার জন্য আনেনি, মাজু খাতুন যেন সেই রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করে দেয় সেই জন্যই এনেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে মোতালেফ -এর কাছে এবার বোধ হয় জীবিকা রক্ষা করা বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা আসলে নয়, এর অন্তরালে তার হৃদয়বৃত্তির টানাপোড়েনই বড় হয়ে উঠেছে। মোতালেফ আসলে মাজু খাতুনের শিল্পগুণকেই স্বীকার করেছে। অর্থাৎ বলতে হয়, একটি শিল্পীমন আর একটি শিল্পী মনকে স্পর্শ করতে পেরেছে। আর তা মাজু খাতুনও অনুভব করতে সক্ষম হয়। যা

তার চোখে জল আনে। অন্তরের গাঢ় রস বাষ্পপুঞ্জে পরিণত হয়ে সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। তারই অল্প কিছু তার দু'চোখে জল হয়ে জমে ওঠে –"বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে।" আর তা দেখেই মোতালেফের অনুভব – "না মেঞাভাই, নেবে নাই।"[১৫৮] নাদির শেখের কাছে এ ছিল নিছকই হুঁকোর আগুন। কিন্তু অতীতের মোতালেফ আর আজকের জীবন রসে প্লাবিত মোতালেফের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে মোতালেফ উপলব্ধি করল – কথার জালে যে 'প্রেমানুভূতির আগুন' মাজু খাতুনের অন্তরে সে জ্বালিয়েছিল তা আজও ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে, হয়তো দু'দিকেই। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই জীবনরসের উৎসরণ ঘটে। তাই বলা যায় – সামাজিকভাবে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ছেদ ঘটলেও উভয়ের হৃদয়ে জাগৃত এই 'রস' তাদের একসূত্রে বেঁধে রাখবে। আলোচ্য গল্পে মূলত এই দুটি চরিত্রের হৃদয় দ্বন্দ্ব তুলে ধরতেই ফুলবানু চরিত্রটির অবতারণা করা হয়েছে। কেননা, রূপের মোহ সাময়িক, এক হৃদয়ের প্রতি আর এক হৃদয়ের মোহ চিরন্তন, যা একটি সম্পর্কের মূলে সঞ্জীবনী শক্তি। কাজেই, বলতে হয়, বিবাহ কেবলমাত্র সামাজিক প্রথা। তা দিয়ে দুটি মনের বন্ধন স্থাপন করা যায় না, মানুষের হৃদয় গাঁথা রচিত হয় না। দুটি মনের মধ্যে বয়ে চলা অনুভূতির চোরা স্রোত মাত্র সেই দুই মন-ই উপলব্ধি করতে পারে। কারণ দেহের বসন্ত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনের বসন্ত অবিনশ্বর, শাশ্বত। সেই অর্থে সামাজিক বন্ধন না থাকলেও এই বোধ-ই আলোচ্য গল্পের দুই মানব-মানবীকে নামহীন এক বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে।

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় **"জৈব"** গল্পটি প্রকাশিত হয়। এটি গল্পকারের গল্পমালা-২ এর অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটি মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য গল্পটিতে। যেখানে আবেগ তথা অনুভূতিকে অতিক্রম করে এক বৈজ্ঞানিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসই প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে দুটি নর-নারীর চলমান সম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছে। আর এই প্রভাবিত সম্পর্কের প্রকৃতি কেমন তা কাহিনী বিশ্লেষণ-এর মাধ্যমে দেখে নেওয়া যাক্।

গল্পে ধরা পড়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তর্গত দুজন মানব-মানবীর জীবন জটিলতা। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের দুটি সমান্তরাল রূপ এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে। যেমন, প্রাথমিক পর্যায়ে আছে – এক অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক। অপর ক্ষেত্রে আছে – ঐ সন্তানকে কেন্দ্র করে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক। কাহিনীর প্রাথমিক পর্যায়ে আসা যাক। এই

গল্পে লেখক চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের দাঙ্গা কবলিত পরিস্থিতিকে প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেখানে একজন সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ বাঙালী গৃহবধূ উত্তর ভারতের দাঙ্গার শিকার হয়। সেই সময়ে এক দুর্ঘটনার ফলস্বরূপ স্ত্রীটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। মাস তিনেক পরে তার স্বামী সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই দুর্ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের সাধারণ জীবনযাত্রা ও সম্পর্ককে আলোড়িত করবে। একজন নারী যখন একজন পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে যখন শারীরিক মিলন সংগঠিত হয় তখন তাতে থাকে উভয়ের মানসিক সম্মতি। এমনকি, তা সামাজিকভাবেও স্বীকৃতি লাভ করে। সেটিই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বর্তমান। এইভাবেই মানুষ জীবন থেকে জাত জীবজ ধারণার মাধ্যমে বংশবিস্তারের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে এবং জীবনধারণের এই পদ্ধতি থেকেই মানুষের মনে ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে নানা ধারণা ও সংস্কারবোধ। আর এই বোধের আওতায় আছে কিছু বৈধ ও অবৈধ বিষয়ের শ্রেণীকরণ। যেমন ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে কোন নারীর দেহ যখন অন্য কোন পুরুষ ভোগ করে তখন তা প্রবলভাবে সংস্কার বিরুদ্ধ হয়ে থাকে। শুধুমাত্র তাই নয়, মেয়েটির পবিত্রতা নষ্ট হয়। মৃত্যু ঘটে তার সতীত্বের। তা মেনে নেওয়া নারীটির পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিষয়টিকেই আলোচ্য গল্পের স্ত্রী চরিত্র অর্থাৎ সুদত্তার মানসিকতায় প্রতিক্রিয়া করেছিল, যা শুধুমাত্র তার মনের শুভ বোধকেই অবলুপ্ত ঘটায় নি সামাজিক অবস্থানকে অবনমিত করেছে, স্বামীর সঙ্গে তার বন্ধনের স্বাভাবিকতাকে বিনষ্ট করেছে। সংস্কার বোধ-এর এই জায়গা থেকে সুদত্তার যে আচরণ তা স্বাভাবিক; এমনকি, গর্ভের সন্তানকে সহ্য করা তার পক্ষে ভীষণ কঠিন। কেননা, এই সন্তান তার 'নষ্ট হয়ে যাওয়ার' চিহ্ন স্বরূপ। কাজেই তার থেকে মুক্তি পেতে সে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে সে ছুটে বেড়িয়েছে। কিন্তু সমস্ত ডাক্তার যখন 'হাতের বাইরে' বলে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তখন যেন সুদত্তার মনে ধৈর্য্য হ্রাস পেয়েছে সেই সঙ্গে সন্তানের প্রতি, নিজের প্রতি, বিদ্বেষ, ক্ষোভ ও ঘৃণা বোধ আরও প্রশমিত হয়েছে। সুদত্তার এই মানসিকতারই প্রতিক্রিয়া একজন ডাক্তারের (বাসববাবু) সম্মুখে প্রতিফলিত হয়েছে এইভাবে – "যেন অসহায় ভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন সুদত্তা, আপনি তো জানেন না প্রতিমুহূর্তে পলে পলে আমি কিভাবে দগ্ধ হয়ে মরছি। সব সময়ের জন্য গা ঘিন ঘিন করছে আমার, গা বমি বমি করছে। খেতে শুতে উঠতে বসতে কাঁটার মত বিঁধছে আমাকে। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, কিছুতেই না। দয়া করে আপনি আমাকে বাঁচান। অশুচিতার হাত থেকে রক্ষা করুন।"[১৫৯] এছাড়াও এই পর্যায়ে সুদত্তার আচার আচরণ তথা মানসিক যন্ত্রণার নানা দিক ডাক্তারবাবুর

আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে – "সবসময় একটা অশুচি অপবিত্রতার ভাব সুদত্তা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। এমনকি, স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যেও সুদত্তা শিউরে উঠতেন, কিংবা আড়ষ্ট থাকতেন।....এই অবস্থায় শরীরের পক্ষে যত রকম অনিয়ম অত্যাচার করা সম্ভব সবই তিনি করতেন।"[১৬০] আসলে সুদত্তা তার ভিতরে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা জীবনটার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাকে বিনষ্ট করতে চায়। তাই সে ডাক্তারবাবুকে বলে – "বাসববাবু, এমন কিছু করা যায় না, ভিতরের জিনিসটা যাতে আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায় ? আর সহ্য করতে পারছি না"[১৬১] সুদত্তার এই উক্তি তথা প্রশ্নের মাধ্যমে বোঝা যায়, তার মানসিক অস্থিরতা ও যন্ত্রণার গভীরতা কতখানি। যে সন্তানের ধারক সুদত্তা নিজে, যে সন্তানটির জীবনদাত্রী সে কিন্তু এই স্তরে এসে তার সঙ্গে সন্তানটির সম্পর্ক ঘৃণার, বিদ্বেষের, অশুচিতার ও পরম শত্রুতার। অথচ এই অনাকাঙ্ক্ষিত অপত্যটি উক্ত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নয়। সে কেবলমাত্র এক নব প্রাণসত্তা – যে মাতৃগর্ভে লালিত হচ্ছে। পৃথিবীর রূপ দর্শনের আশায়। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা যায়, জীবনের এই জটিল পরিস্থিতিতে সুদত্তার স্বামী মৃগাঙ্কবাবু সবসময় মানসিক ভাবে স্ত্রীর পাশে থেকেছে এবং তাদের সম্পর্কের স্বাভাবিকতাকে অটুট রাখবার চেষ্টা করেছে। গল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে এই দুটি সম্পর্কের ধারা সমান্তরালভাবে অবস্থান করেছে।

এবার গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আসা যাক। সুদত্তার মাতৃত্ব লাভের মধ্য দিয়ে এই পর্বের সূত্রপাত। 'স্ত্রী থেকে জননী' – সুদত্তার এই গোত্রান্তর শুধুমাত্র তার আত্মপরিচয়কেই পরিবর্তন করেনি, তার সাধারণ জীবন ছকটিকেও বদলে দিয়েছে। ফলে পূর্বোক্ত সম্পর্কের যে স্রোতধারা বাহিত হচ্ছিল তা এই পর্বে এসে ঠিক বিপরীত খাতে অনুপ্রবেশ করল। এই স্তরে মূলত অবাঞ্ছিত সন্তানকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত মাত্র দুজন মানব-মানবীর সম্পর্কে কত রং-এর সংমিশ্রণ তারই একটি দিক এই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

এই গল্পের নায়ক সুদত্তার স্বামী মৃগাঙ্কবাবু-ই। জীবনে চলার পথে মানুষ নব অভিজ্ঞতা ও নব বোধ আহরণ করে থাকে এবং তা থেকেই তার পূর্ব ধারণা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যে ধারণা পরবর্তীকালে তার মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। এই সত্যটি গল্পের দু জন দম্পতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুদত্তা-মৃগাঙ্কবাবুর দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। কিন্তু দেখা যায়, উত্তর ভারতের এক দাঙ্গার কবলে পড়ে সুদত্তা। এই সময় মৃগাঙ্কবাবু হয়ত তার স্ত্রীকে উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজছে। এবং গল্পে উল্লেখ আছে এই ঘটনার তিনমাস পর সে তার স্ত্রীকে খুঁজে পায় এবং চরম দুর্ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। এখন প্রশ্ন হল – এই দুঃসংবাদ একজন স্ত্রীর

স্বামী হিসাবে তার মনকে কি আলোড়িত করবে না ? অবশ্যই করা উচিৎ, কারণ সবচেয়ে বড় কথা সে একজন 'মানুষ'। মৃগাঙ্কবাবুর মনও আহত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়, সবার পরিবর্তন তথা প্রতিক্রিয়ার রূপ এক নয়। মৃগাঙ্কবাবু সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত উচ্চমানের ব্যক্তি। তার পক্ষে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত আচার-আচরণ করা সম্ভব নয়। কারণ এর মধ্যে তার সম্মান ও ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তাই বাইরে তার পরিবর্তনের ছাপ না পড়লেও অন্তরালে তিনি অনেকখানি বদলে গিয়েছিলেন। আর সেই বদল ছিল অনেক বেশী জটিল ও ভয়ানক। এই দুর্ঘটনা মৃগাঙ্কবাবুর মানবিক অনুভূতিগুলির মৃত্যু ঘটায়। আর এখান থেকেই জাগ্রত হয় তার নিজের আর এক সত্তার। তা হল যুক্তি ও তথ্যের সমন্বয়ে গঠিত বৈজ্ঞানিক সত্তা। সেখানে হৃদয়ানুভূতির কোন জায়গা নেই। তার এই মানসিক বিকার সমস্ত সম্পর্ককে তুচ্ছ করে শুধুমাত্র নিজ স্বার্থকে ও নিজ লক্ষকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করে। তার কাছে মানুষ কেবলমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপাদান। আর এই মানসিকতা থেকেই মৃগাঙ্কবাবু চেয়েছিলেন ঐ অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানটি পৃথিবীতে আসুক। তাই বিভিন্ন ডাক্তারবাবু যখন সুদত্তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে তখন সুদত্তা ক্রোধে-ঘৃণায় জর্জরিত হলেও মৃগাঙ্কবাবুর কোন প্রতিক্রিয়া উঠে আসেনি। বরং সে বিপরীত ক্রিয়াই করেছে। মানসিকভাবে স্ত্রীর পাশে সব সময় থেকেছে। গর্ভাবস্থায় সুদত্তার কোনরকম অসুবিধা যাতে না হয় তার দায়িত্ব নিয়েছে। মৃগাঙ্কবাবুর এই দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ডাক্তারবাবুর জবানীতে জানা যায় – "মৃগাঙ্কবাবুও চাইতেন আমি তাঁদের ওখানে যাই। সুদত্তা এসব কথা আলোচনা করুন আমার সঙ্গে। কারণ এভাবে সুদত্তার মনের ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ওই ধরণের চিন্তা প্রকাশের পথ পাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদত্তাও খানিকটা তৃপ্তি আর স্বস্তি বোধ করবেন।"[১৬২] শুধুমাত্র তাই নয়, ডেলিভারির পরে শিশুটিকে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেওয়া হবে, কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থাপনায়, ডাক্তারের কাছে মৃগাঙ্কবাবুর অনিচ্ছা প্রকাশ হয়েছে এইভাবে – "কিন্তু যাই বলুন, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না বাসববাবু। জীবনে সজ্ঞানে কোনদিন কোন মিথ্যার আশ্রয় নিইনি। আর এসব নোংরামির মধ্যে আমাকেই কিনা জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।"[১৬৩]

তাই গল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে মৃগাঙ্কবাবুর এই বিপরীত মনোভাব এবং মহানুভবতায় হয়তো পাঠকবর্গ বিস্মিত হয়ে থাকবে। আবার কখনো মনে সংশয়ও জেগে ওঠে একজন স্বামী হয়ে এতটা উদারতা থাকা কি সত্যিই সম্ভব ? আসলে মৃগাঙ্কবাবুর এই অভিনয়ের আড়ালে ছিল তার গোপন স্বার্থকে চরিতার্থ করবার চেষ্টা। আর আশ্চর্যের বিষয় তার এই অভিনয় স্ত্রী সুদত্তাও

উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে মাতৃত্ব লাভের পর সুদত্তার মানসিকতার পরিবর্তন মৃগাঙ্কবাবুর সুপ্ত বাসনাকে প্রকট করবার ইন্ধন জোগায়। জন্মের পর সুদত্তার মনোভাব গল্পে ফুটে উঠেছে এইভাবে – "সুদত্তা অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সন্তানকে। তার চোখে ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, অস্বস্তি অশান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। গভীর শান্তি আর পরিতৃপ্তিতে সুদত্তার মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুন্দর আর প্রশান্ত।"[১৬৪] মৃগাঙ্কবাবু হয়তো তাই চেয়েছিলেন। লক্ষণীয় বিষয়, নার্সটি সন্তানটিকে দামী তোয়ালেতে জড়িয়ে সুদত্তার সম্মুখে এনেছিল। আর সেই সুব্যবস্থা যে মৃগাঙ্কবাবুই করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সুদত্তার মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করে শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। এতে জটিলতা আরও বাড়বে বলে ডাক্তারবাবু জানায়। তাতে দেখা যায়, মৃগাঙ্কবাবু সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। এই সিগারেট ধরিয়ে হাসির মাধ্যমে কথা বলার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় – সে হয়তো শিশুর জন্মের পর সুদত্তার যে মানসিক পরিবর্তন হবে তা জানত। আবার হয়তো বা এই পরিবর্তন আসলে পরোক্ষভাবে তারই লাভ ভেবে মৃগাঙ্কবাবু এমন নিশ্চিন্ত ও অবিচলিত। সে উত্তর দেয় – "জটিলতার তো কিছু নেই। মাতৃত্ব সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে প্রাঞ্জল" সত্যিই কি মাতৃত্ব এত সহজ ? আসলে মৃগাঙ্কবাবুর কাছে সম্পর্কের জটিলতা, মানবিক দুঃখ কষ্টের কোন গুরুত্ব নেই। তার গুরুত্ব জীবজ উপাদানের উপর সবচেয়ে বেশী। তাই জটিলতা সম্পর্কে সে এমন উদাস। তার এই কথায় ডাক্তারবাবু প্রতিবাদ করে জানায় – "না না না, কি বলছেন আপনি। এখনকার মাতৃত্ব তো অবিমিশ্র নয়। তার সঙ্গে সমাজ, সম্মান, কত রকমের সংস্কার, সুবিধা, অসুবিধা বোধ জড়িয়ে আছে। মিসেস মজুমদারের যে বাৎসল্য আপনি দেখলেন, তা হয় তো নিতান্তই ক্ষণিক, নিতান্তই ফিজিক্যাল" এর উত্তরে মৃগাঙ্কবাবু হেসে জানায় – "সবই তো তাই"[১৬৫] অর্থাৎ আবেগ, অনুভূতি তার কাছে নিতান্তই ক্ষণিক এবং তুচ্ছ, মূল্যহীন। শরীরটাই আসল। সেটিই মূল বস্তু ও উপকরণ বিশেষ। তবে ধীরে ধীরে সুদত্তার কাছে মৃগাঙ্কবাবুর আসল চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে জানে তার স্বামীর এখন মেইন সাবজেক্ট বায়োলজি, হেরিডিটি। তাই এই সন্তানটিকে সুদত্তা অন্য জায়গায় পাঠাতে চাইলেও মৃগাঙ্কবাবু রাজী হয়নি। কেননা, এটিই তার পরীক্ষার মূল উপাদান। তাই তার জন্য দামী পোষাক, খাদ্য, খেলনার ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়, মৃগাঙ্কবাবু তাকে আদর করে চুমুও খায় এবং হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখে আর কলম খুলে নোট নেয় পকেটবুকে। একজন মা হিসাবে তা সহ্য করা কোনও নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়। ফলে স্বামী সম্পর্কে সুদত্তার মন তিক্ততায় ভরে ওঠে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি এবং সে এখানেই থেমে

থাকেনি। আমরা জানি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কোন একটি বিষয়ের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়কে ধ্রুবক হিসাবে ধরে নিতে হয়। এই পরিস্থিতিতেই বাৎসল্য ও পিতৃসুলভ আচরণ হল এখানে ধ্রুবক। ভিন্ন ঔরসজাত দুটি সন্তান হল উপকরণ। মৃগাঙ্কবাবুও দেখতে চেয়েছিল – দুজন পুরুষের ঔরসজাত সন্তান একই গর্ভে ধারণ করলে তাতে দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া-পরিবর্তন কেমন হয়। এই তুলনামূলক বিষয়টিকে তুলে আনতে চেয়েছিল। তাই হয়ত সে নিজের স্ত্রীকে সন্তানসম্ভবা করে তোলে। স্ত্রীকে গর্ভবতী করার পেছনে আছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, সেখানে কোন মানবিক অনুভূতি নেই। তাই হেরিডিটি সম্পর্কে মৃগাঙ্কবাবুর এই বক্তৃতা দিয়ে গল্প শুরু হয়েছে – "....সুতরাং হেরিডিটি বা বংশানুক্রমন সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত ধারণা.....। প্রকৃতপক্ষে পিতামাতা এবং ঊর্দ্ধতন পিতৃকূল মাতৃকূলের শারীরিক গঠনবিন্যাস থেকে শুরু করে মানসিক গুণাগুণ, বৃত্তি-প্রবৃত্তির কতখানি অংশ বংশানুক্রমের সূত্রে উত্তরপুরুষে এসে পৌঁছাতে পারে, আবার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব মানে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যই বা সেই বংশানুক্রম ও মানুষের জীবনযাত্রাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে....."[১৬৬] স্বামীর মনোভাব-মানসিকতা সুদত্তার কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এবং সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুদত্তার স্ত্রীসত্তা ও মাতৃসত্তা আত্মপীড়নে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তাই পুনরায় তার মধ্যে পূর্বের উন্মত্ত দৃষ্টি লক্ষ করা যায়। আজও সে ক্রোধে-ক্ষোভে ব্যাকুল হয়ে ডাক্তারবাবুকে বলেছেন – "আমি যা চাই তা আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কম্প্যারেটিভ স্টাডির মেটেরিয়াল জোগাতে চাইনে।"[১৬৭] সুদত্তার এই বক্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বর্তমান সমীকরণটি এবং সেই সঙ্গে উন্মোচিত হয় মৃগাঙ্কবাবুর মানসিক সংক্রমণের গভীরতা।

"অবতরণিকা" গল্পটি ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা - ১' এ স্থান পেয়েছে। এই গল্পেও আছে নিটোল দাম্পত্য জীবনের কাহিনী। সেখানে দুজন দম্পতির জীবনকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার খেলা আবর্তিত হয়েছে। তবে এইক্ষেত্রে তৃতীয় কোন নারী-পুরুষের আগমন নয়, আর্থিক সংকট এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি-ই তাদের সম্পর্কের জোয়ার-ভাঁটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে একই সম্পর্কের শাখায় নানা প্রশাখার জন্ম হয়েছে। সেই প্রশাখাগুলির প্রভাব-প্রকৃতি চরিত্র দুটিকে কীভাবে পরিচালিত করেছে তা কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখে নেওয়া যাক।

সুব্রত ও আরতি অসচ্ছল একান্নবর্তী-মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত দুজন দম্পতি। মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তানদেরকে নিয়ে তাদের সংসারে দারিদ্র্য নিত্য বর্তমান। এমতাবস্থায় সংসার চালাতে এক বন্ধুর কাছে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করতে গেলে সুব্রত অসফল হয়। তা যেমন তার মনে আঘাত হানে তেমনি আর একটি বিষয় তাকে ভাবায় বা বলা যায় খানিকটা ঈর্ষাবোধ জাগ্রত করে, তা হল – বন্ধুর স্ত্রীও চাকরি করে। তাই হতাশ হয়ে সুব্রত বাসায় ফিরে এলে আরতি প্রশ্ন করে – 'দেখা হল না বুঝি ?' এর উত্তরে সুব্রত বিরস মুখে বলে – "দেখা আর হবে না কেন ? পরিমল দুঃখ জানিয়ে বলল, তার হাতও এখন ভারি ঠেকা। বলল, দুজন মিলে চাকরি করছে, তবু সংসারের খরচের সঙ্গে পেরে উঠছে না।"[১৬৮] 'দুজনে' কথাটি আরতির কানে বেঁধেছিল। তাই প্রশ্ন করে "দুজনে মিলে মানে ?" উত্তরে সুব্রত জানায় – "দুজনে মিলে মানে মাধুরীও চাকরি করে আজকাল। মাস্টারি করে কি একটা গার্লস স্কুলে। সবাই তো আমাদের মত নয়"[১৬৯] এই শেষ বাক্যটিতেই সুব্রত-এর মনের আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। এবং তা সে আরও স্পষ্ট করে বলে – পুরুষই হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো?" তার মনের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে একরকম অনুরোধ করে তার স্ত্রীকে – "চেষ্টা চরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হতো না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হতো আমার"[১৭০] এছাড়া সুব্রত তার আরও কয়েকজন বন্ধু-পত্নীর চাকরির খবর দেয় স্ত্রীকে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত স্বামীর ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিয়ে ও প্রয়োজনের তাগিদে চাকরির সন্ধান শুরু করে আরতি। আর সেই উদ্যোগের সহযাত্রী ছিল স্বামী-ই। এর মধ্যে দিয়ে তারা তাদের গতানুগতিক একঘেয়েমি জীবনে নতুনত্বের স্বাদ পায়। তাদের এই যৌথ প্রচেষ্টা যেন প্রয়োজনের আড়ালে তাদের সম্পর্কের শাখায় নবরসের সিঞ্চন করে। নতুনভাবে পুনরায় এই একাত্মতার অনুভূতিতে ভয়েই সিক্ত হয়েছিল। আর তাই বোধ হয় সুব্রতকে তার সংস্কারাচ্ছন্ন বাবা-মার সম্মুখে দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছিল। কেননা, ঘরের বৌ-দের বাইরে গিয়ে চাকরি করাবার বিষয়টি ছিল সুব্রত-এর বাবা-মার নিকট নীতিবিরুদ্ধ ও সংস্কার-বিরুদ্ধ কাজ। যাই হোক, গল্পে উঠে আসে – শেষপর্যন্ত সুব্রতই জয়ী হয়, এবং আরতি চাকরি জোগাড় করতে সক্ষম হয়। ফলে সুব্রত-র দৈনন্দিন জীবনের রুটিনের আওতায় আরতিও চলে আসে। তাই কেবলমাত্র একই সময়ে স্নান-খাওয়া সারা নয়, আরতি স্বামীর খানিকটা পথের সঙ্গিনীও হল। একই ক্রিয়া-নিয়ম ও সহযাত্রিণীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উভয়ে তাদের সম্পর্কের একটি বিশেষ দিক আবিষ্কার করল। নব-আবিষ্কৃত সম্পর্কের ধারা রোমান্স ও পুলকে আবিষ্ট ছিল। জীবনের এই পর্বের সম্পর্কের যে

প্রকৃতি তথা অনুভূতির এক বিশেষ পর্যায় গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে এইভাবে – "প্রথম দিন কয়েক অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে একই ট্রামে উঠত সুব্রত।ট্রামের হাতলে ঠেকত পরস্পরের হাত, একই বেঞ্চে দুজনে বসত পাশাপাশি। ঠিক গা ঘেষে যে তা নয়, বরং একটু দূরে দূরে ফাঁক রেখে। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু ভরে উঠত রোমান্সে। রোমান্সে - হ্যাঁ - বিবাহিতা স্ত্রীর পাশে বসেও রোমান্স হয়েছে সুব্রতর।.... যেন সবে সামান্য পরিচয় হয়েছে খুলতে শুরু করেছে অসামান্য রহস্যের আবরণ।.....প্রেমজ বিবাহ নয় তাদের। বিবাহজ প্রেমের স্বাদ প্রথম বছর যা ছিল দ্বিতীয়, তৃতীয় বছরে তা যেন অনেকখানি গিয়েছিল পানসে হয়ে। অফিস যাত্রার প্রথম ক'দিন নতুন করে যেন সেই প্রথম বছর ফিরে এল। একেকবার এমনও মনে হল এ কেবল বিয়ের প্রথম বছর নয়, প্রাক-বৈবাহিক কোন প্রেমের প্রথম বছর। আরতি যেন শুধু আর অতি পরিচিতা নিত্যকার জীবনসঙ্গিনী নয়, সেই সঙ্গে মাত্র আধ ঘন্টার যাত্রাসঙ্গিনীও। সহজলভ্যা স্ত্রীর পরস্ত্রীর সুদূর দুর্ভেদ্য রহস্যময় রূপ প্রথম কদিন দেখতে পেল সুব্রত।"[১৭১] তবে সময়ের ব্যবধানে যেমন নদীবক্ষে জোয়ার-ভাঁটা সংঘটিত হয়, তেমনি জীবন সংসারেও সময়ই নব নব পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করে। যার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানসিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

অফিসের সময় বদল হওয়ায় অবসান হল আরতি ও সুব্রতর যৌথ যাত্রার রোমান্স। পার্থক্য ঘটল পরস্পরের দৈনন্দিন জীবনের রুটিন। আর এই পার্থক্য শুধুমাত্র স্বামীর চোখেই ধরা পড়ল না, মনের মাঝেও দাগ কাটল। ফলে পূর্বের জীবন-যাত্রার সঙ্গে বর্তমান জীবনযাত্রার তফাৎ স্বাভাবিকভাবে সুব্রতর মনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তখন সে নানা স্মৃতির মাঝে খুঁজে পায় – পূর্বে সুব্রত ছুটির দিনে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরে দেখত সকলে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও আরতি অভুক্ত আছে, তাতে সুব্রত শাসন করত ঠিকই কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুশিও হত অনেক বেশী। আর এখন সুব্রতর খাওয়ার আগেই আরতি যখন আঁচিয়ে এসে তোয়ালেতে মুখ মুছতে থাকে তখন বর্তমান দিনের সঙ্গে যে তুলনা উত্থিত হয় তা তার হৃদয়াকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে। এখানেই শেষ নয়, বিকালে বেশীরভাগ দিনই চা করে ও বিছানা ঝাড়ে ঝি কুমুদিনী। কেননা, আরতির ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে যায়। এবং এসে সে হাঁপায়। এরপর তাকে বিশ্রাম করতে দেওয়া একান্ত আবশ্যিক। তবে কুমুদিনী ঝি সব ঠিকঠাক করলেও সুব্রতর মানসিকতা প্রকাশিত হয় এইভাবে – "তবু মনটা খুঁত খুঁত করে সুব্রতর। অকারণে বিরক্তি আসে, মেজাজ বিগড়ে যায়। বউয়ের কাজ কি ঝিকে দিয়ে চলে?"[১৭২] বর্তমান সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সুব্রত যতই তাল মিলিয়ে চলুক না কেন, এমনকি, যতই ভাবুক সে বর্তমান কালেরই প্রতিনিধি আধুনিক জীবনের

অধিকারী আসলে মধ্যবিত্তের সংস্করণ, বিধি-নিষেধের বৈধ-অবৈধতা তার রক্তে মিশ্রিত। কাজেই সেও চায় পূর্ব প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সারাদিন কাজের শেষে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা পাক্। তাই প্রয়োজনের তাগিদে তাদের জীবনধারা পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেও সুব্রত মূলত পূর্ব জীবনযাত্রায় বেশী স্বস্তি পায়। যদিও গল্পে পাওয়া যায় – সুব্রত উপলব্ধি করেছে – বউ যদি চাকরি করে, আর সে চাকরিতে যদি সময় আর সামর্থ্য দুই বেশী দিতে হয়, দাম্পত্য জীবনের চেহারা তো একটু আধটু বদলাবেই, তবুও তার মন দ্বিধান্বিত। আসলে এখানে সুব্রতর সনাতনী সংস্কারী মন ও আধুনিক জীবনের অধিকারী মনের টানাপোড়েন-ই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই সে আবার ভেবেছে আরতির শুধুমাত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার সূচী বদলায়নি, তার মনও পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ পূর্বে ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জার দিকে আরতির যেমন লক্ষ ছিল তেমনি শখও ছিল গান-সেলাই-মাসিক কাগজের গল্প পড়ার। কিন্তু তার সবই হ্রাস পেয়েছে সময়ের অভাবে নয়, সুব্রতর মনে হয়, তাতে আরতির মন নেই বলে। ঘর সংসার ছেড়ে বাইরে কাজ করবার বিষয়টি সুব্রতর বাবা-মা কখনোই সমর্থন করেনি। আগেও এই নিয়ে বলেছে এবং বর্তমানেও বলে। কিন্তু বর্তমানে যেন সুব্রতর মনে সেই কথাগুলিই বেশি প্রভাব ফেলে ও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। আসলে সুব্রতর মনের সংস্কারই যেন তার বাবা-মার কন্ঠে ধ্বনিত হয়। সংসারে সচ্ছলতা এসেছে ঠিকই, সুব্রত এখন ভালো সিগারেট খেতে পায় কিন্তু তাতে যেন আগের মত স্বাদ পায় না। কারণ এতদিন সে চাকরি করেছে অথচ অফিসের মাইনে থেকে পুরো টাকা কোনদিনই সুব্রত ঘরে আনতে পারে নি। অপরদিকে আরতি প্রথম মাসের মাইনে ছাড়া উপরিও এনেছে। তাতে স্বামীর মনে যে হীনমন্যতা বোধের জন্ম নিয়েছে তা মূলত বংশপরম্পরা অনুযায়ী বয়ে আসা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় আঘাত হানার প্রতিক্রিয়া। হয়তো বা বলা যায় – বস্তুসর্বস্ব জীবন হল রসহীন ছিবড়ের সমতুল্য। সেকথা বোধহয় সুব্রত উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই স্ত্রীর সবসময় কীভাবে বেশি আয় করা যাবে তার চেষ্টা চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করবার দিকটি সুব্রতর ভালো লাগেনি। এরকম-ই নানাবিধ কারণে বর্তমানে সুব্রত চায় – আরতি এই চাকরিটি ছেড়ে দিক। অথচ একদিন এই চাকরি করবার মূল উদ্যোক্তা ছিল সুব্রতই। তবে আরতি স্বামীর এই প্রস্তাবে রাজী হয়নি। ফলে তাদের মধ্যে মতানৈক্য চরমে পৌঁছোয়। আরতির এমন জেদী মনোভাব ও উদ্ধত আচরণ সুব্রতকে আরও ক্রুদ্ধ করে তোলে। ফলে চাকরিকে কেন্দ্র করে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে একদিন যে রোমান্স ও পুলকের জোয়ার এসেছিল তাই আজ এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিপরীত খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে

ওঠে। উভয়ে নিজ মতাদর্শে স্থির থাকে। এমত পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে আবর্তিত সম্পর্কের সমীকরণটি প্রকাশিত হয়েছে সুব্রতর মানসিকতার মাধ্যমে – "পেছন ফিরে শোয়া আরতির উদ্ধত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে এক একবার সুব্রতর হাত নিস-পিস করে ওঠে। অতিকষ্টে সংযত রাখতে হয় নিজেকে।"[১৭৩] এখানেই শেষ নয়, সুব্রত স্থির করে, তারা কিছুদিন আলাদা থাকবে। তাই সে তার শ্বশুর মহাশয়কে বলে –"কিছু দিন ওকে আপনি নিজের কাছে নিয়ে রাখুন। সব দিক ভেবে আমি এই প্ল্যান নেওয়াই ঠিক করেছি। আর এই last attempt মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে"[১৭৪] সুব্রতর এই সিদ্ধান্ত তথা বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠকবর্গের সম্মুখে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ভগ্নপ্রায় রূপটি খুব স্পষ্টভাবেই উদ্ভাসিত হয়। জীবনের এই পরিস্থিতিতে আর একটি আকস্মিক ঘটনা শুধুমাত্র সুব্রত ও আরতির জীবনের গতিকেই পরিবর্তন করেনি, বদলে দিয়েছে মানসিকতা যা তাদের বহমান সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে।

গল্পের কাহিনীতে পাওয়া যায় – নানা ঘটনার ফলস্বরূপ সুব্রতর চাকরিটি চলে যায়। স্বামীর পূর্বের আচরণে আরতি ক্ষুব্ধ থাকলেও এবার সে-ই আগে কথা বলে –"অত ভাবছ কেন? চলেই যাবে, একরকম করে।" দেখা যায়, সুব্রতও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সিগারেটের বদলে বিড়ি ধরাতে ধরাতে উত্তর দেয় – "আমি কি বলেছি যে চলবে না?"[১৭৫] এবারও সুব্রত ও আরতি একত্রিত হয়েছে সংসারের স্বাভাবিক সচ্ছলতাকে বজায় রাখবার তাগিদে। এবার তাদের লক্ষ্য একই। পুনরায় যৌথ উদ্যোগ তাদের মানসিক ঐক্যকে পুনরুজ্জীবিত করে। এবার সুব্রত বিভিন্ন জায়গায় চাকরির সন্ধানে ঘোরে। পরিস্থিতি একই হলেও আগের মত সেই উচ্ছ্বাসকে তারা কেউ-ই খুঁজে পায় না। আসলে এর পিছনেও আছে সুব্রতর মনের হীনভাব। কেননা, আরতির চাকরি চলে যায়নি বরং সুব্রতরই গিয়েছে। এবং তাকে স্ত্রীর উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই আগের উদ্যমকে তারা হারিয়ে ফেলেছে – "স্বামীর অন্যমনস্কতা দূর করবার জন্য মাঝে মাঝে অফিসের গল্পও করে আরতি। কিন্তু দুমাস আগের গল্পের সঙ্গে এখনকার গল্পের মিল নেই।"[১৭৬] এই অমিলের কারণ শুধুমাত্র সুব্রতর দিক থেকেই ছিল না, আরতির কর্মক্ষেত্রেও আগের মত সুখ শান্তির অভাব দেখা দেয়। তবে সুব্রত সবসময় আরতিকে পরামর্শ দেয় সে যেন তার মনিবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। কেননা, এই পরিস্থিতিতে তার চাকরিটিও গেলে তাদের জীবনে দুর্ভোগের আর শেষ থাকবে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে আরতি তার চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় সুব্রতর মা তীব্র তিরস্কার করলেও সুব্রতও যে আরতিকে ব্যঙ্গ ও তিরস্কার করতে পারে তা সে ভাবতে পারেনি।

আত্মসম্মানের বিনিময়ে চাকরি তথা প্রয়োজনই স্বামীর কাছে বড় হয়ে উঠেছে এই বিষয়টি উপলব্ধি করে চোখে জল আসে। আর সেই জল-ভরা দুটি চোখ যেন অপূর্ব সৌন্দর্য্যে সুব্রতকে মুগ্ধ করে। আসলে পুরুষেরা বোধহয় নারীর আত্মহীন কোমল করুণ রূপেই মুগ্ধ হয়। কেননা, নারীর সঙ্গে তাদের সম-মর্যাদা ও সম-আসনকে তারা মন থেকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল – সুব্রত আরতির অশ্রুসিক্ত নয়নে মুগ্ধ হলেও আরতির মনে স্বামীর মানসিকতা সম্পর্কে যে নববোধ সঞ্চারিত হল তা কি তাদের সম্পর্ককে আলোড়িত করবে না ?

আলোচ্য গল্পের মাধ্যমে আমরা দেখলাম কীভাবে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি দুটি মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার খেলাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ফলে সম্পর্কের একই ধারায় উত্থিত হয়েছে নানা বৈচিত্র্যের ঢেউ।

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'শাল'** গল্পটি ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'দিগন্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দাম্পত্য জীবনে কেন্দ্রীভূত দু'জন নর-নারীর মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কের গিঁট-বাঁধা ও গিঁট-খোলার পর্যায়ক্রমটি চলতে থাকে। ভাঙা-গড়ার এই সমষ্টি নিয়েই একটি জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। এরকমই একটি জীবনের খন্ডাংশের উদাহরণ হিসাবে 'শাল' গল্পটিকে নেওয়া যেতে পারে।

'শাল' একটি শীতকালীন বস্ত্র। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সাধারণ উপকরণ মাত্র। তবে আলোচ্য গল্পে একটি 'শাল' শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায়নি। এই শালকে কেন্দ্র করে দু টি মানুষের মানসিক অবস্থানের ভিত্তিমূল আন্দোলিত হয়েছে। গল্পে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্গত যে দু'জন স্বামী-স্ত্রীকে আমরা পাই, তাদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সহজ-সরল ও স্বাভাবিক। যদিও স্বামী অনিমেষের কাছে বিবাহের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল যে তার স্ত্রী একজন বিধবা রমণী। তথাপি বিবাহের সময় সেই সম্পর্কে জ্ঞাত হলেও এই বিষয়টি কোনদিন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেনি। একমাত্র সন্তানকে কেন্দ্র করে তাদের সুখী জীবনের-ই প্রতিচ্ছায়া উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এরকম পরিস্থিতিতে ঋতুচক্রের নিয়মে শীতের আগমন ঘটলে স্ত্রী বীথিকা স্বামীর কথা ভেবেই তার প্রাক্তন স্বামীর একখানা শাল গায়ে দিতে দেয় অনিমেষকে। এবং ঘটনাক্রমে দেখা যায়, অনিমেষের কর্মক্ষেত্রে তার সহকর্মীরা শালটির প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে একটি কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আর তাতে অনিমেষের মানসিক টানাপোড়েনের দিকটি আমরা পেয়ে থাকি এইভাবে যখন অনিমেষ ভাবে – "শালখানা যে বিজয়ের তা অবশ্য অনিমেষ

কাউকে বলেনি, কিন্তু তার কেমন যেন মনে হতে লাগল ওরা সবাই টের পেয়েছে। টের পেলেই বা কি ? একজনের জিনিস কি আর একজন ব্যবহার করে না ? মৃত আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহৃত জিনিস যদি ভোগ করা চলে, স্ত্রীর বিগত, মৃত স্বামীর একখানা শাল গায়ে দিতেই বা লজ্জা কিসের? তবু অযৌক্তিক কুন্ঠাটা যেতে চায় না। কোথায় যেন একটু হীনতা আছে এর মধ্যে, আছে নিজের দারিদ্রের অগৌরব"[১৭৭]

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের এই মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান হতেও দেখা যায়। কিন্তু স্ত্রীর কন্ঠস্বর ও ব্যবহারে অনিমেষের চমক লাগে, সে যেন অবাক হয়ে যায় অনেক বেশী। কেননা, বীথিকা স্বামীর কাঁধ থেকে শালটা নামাতে নামাতে হঠাৎ মৃদু কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তনাদের সুরে যখন বলে ওঠে – "একি? ...এ দশা হল কি করে ? স্ত্রীর এই ব্যবহার স্বামীর কাছে অচেনা, তাই একটু চুপ করে থেকে অপ্রতিভ ভঙ্গিতে উত্তর দেয় – 'ও। কিন্তু ফুটোটা বোধ হয় আগেই ছিল।" কিন্তু বীথিকা জানায় – "মিথ্যে কথা। সে কখনো সিগারেট খেত না"[১৭৮] বীথিকার প্রাক্তন স্বামী সম্পর্কে অনিমেষ একটি তথ্য জানতে পারল যে সে সিগারেট খেয়ে কোন দিন গায়ের শাল পোড়ায় নি। তবে এটি কেবল মাত্র তথ্য নয়, বীথিকার আর্তস্বর। তার অভিযোগের তীব্রতার মধ্য দিয়ে তার প্রাক্তন স্বামীর প্রতি গৌরববোধ, অহংবোধ এবং এর বিপরীতে বর্তমান স্বামীর প্রতি এক ক্ষোভ, তাচ্ছিল্যবোধ ও হীনতাবোধকেই উদ্ঘাটিত করে। দুই স্বামীর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ধারণার রূপটি এই একটি শালকে কেন্দ্র করে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে গেল।

এখানেই এই ছোটগল্পটির সার্থকতা। দু'জন স্বামী ও স্ত্রীর পরবর্তী জীবন পরিণতির আভাস লেখকের কলমেই ধরা দিয়েছে – "সিগারেটের আগুনে পোড়া শালের ছোট একটু ছিদ্র। কিন্তু তার ভিতর দিয়ে দুজনের কাছে কি দুটি অদৃষ্টপূর্ব জগৎই না উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে"[১৭৯] আলোচ্য গল্পে 'শাল'টি যেন নায়কের ভূমিকা পালন করেছে। স্বামী-স্ত্রীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই পর্বে শালটি দুটি মানুষের মানসিক রূপ পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক-স্বরূপ। যার মাধ্যমে স্বামীর মনোলোকে একটি সংশয়-এর ছিদ্রপথের দ্বার উদ্ঘাটিত হল। এবং তা যে তাদের পরবর্তী জীবনযাত্রা তথা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই হয়তো এই ঘটনার পর বীথিকা অনুশোচনা করে স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। তারপর সবই পূর্বদিনগুলির মতো গতানুগতিকভাবে এগিয়ে গিয়েছে; তথাপি আজকের দিনটি অন্যান্য দিনের মত লাগেনি অনিমেষের কাছে। এই পার্থক্যটি তার মনে দাগ কেটেছে, ফলে সে বীথিকাকে দেখে বিস্মিত হয়ে ভেবেছে – ''সব ভুলে সব বিলিয়ে দিয়েও একখানা শাল সে আজ অক্ষত রাখতে চায়। মনে

রাখতে চায় কে একজন সিগারেট খেত না। শতছিদ্র স্মৃতির ভান্ডারে তার এখনো এ কি স্বর্ণরেণু সঞ্চয়ের সাধ!"[১৮০] এই ভাবনা-ই মনান্তরের জন্ম দেবে। যার উপর নির্ভর করবে তাদের সম্পর্কের সমীকরণ।

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **"হেডমিস্ট্রেস"** (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) একটি ভিন্নমাত্রার গল্প। যেখানে গল্পের নামকরণও সম্পন্ন হয়েছে একজন নারীকে কেন্দ্র করে। হেডমিস্ট্রেস অর্থাৎ একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য, সহনশীলতা-ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি মহৎ উদারতাই আলোচ্য গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে সেই সঙ্গে এর সমান্তরালে আমরা একটি দাম্পত্য জীবনকে তথা একটি দাম্পত্য সম্পর্কের বিচিত্রতাকেও খুঁজে পাই।

'হেডমিস্ট্রেস' গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের যে চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে তাতে তৃতীয় কোন ব্যক্তি-মানুষের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। জীবিকা তথা জীবিকার প্রয়োজন অনুসারী আচার আচরণই দু'জন নর-নারীর মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলা যায়, প্রয়োজনের তাগিদে লব্ধ অভ্যাস বা পরিবর্তিত মানসিকতা-ই দুটি চরিত্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক। লেখক তাঁর নিপুণ দক্ষতায় কোন পরিস্থিতি উপস্থাপনের মাধ্যমে চরিত্রগুলির মনোলোকের বৈচিত্র্যময় টানাপোড়েনকে উত্থাপন করে তার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করেছেন এবং তার ফলস্বরূপ প্রদত্ত ক্রিয়ার পর্যায়ক্রমের রূপ কেমন বা কোন্ পর্যায়ে এনে তিনি চরিত্র দুটিকে পারস্পরিক সম্পর্কের সীমারেখা এঁকেছেন আলোচ্য গল্পে সেই বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা রয়েছে।

গল্পে পাওয়া যায়, শৈলেন ও সুপ্রীতি পরস্পরকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল। বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবনে প্রেমিকার গৌরবেই ছিল প্রেমিকের গৌরব। প্রণয়িণীর যশ-খ্যাতি যেন নিজেরই আত্মার জয়গান। তাই শৈলেন নিজের লেখা কিছু কবিতা সুপ্রীতির নামে ছেপে আনন্দ পেত। শুধুমাত্র তাই নয়, সুপ্রীতি নামটিকে পৃথিবীর কাছে বিখ্যাত করবার ক্ষেত্রে শৈলেনের ছিল নিরলস প্রয়াস। আসলে এর মধ্যে দিয়ে শৈলেন সুপ্রীতির প্রতি স্বত্ত্ববোধ তথা অধিকারবোধকে সুদৃঢ় করতে চাইত। তখন দুটি সত্তার মিলেমিশে একাকার হওয়ার মধ্যেই যেন সার্থকতা ছিল। কিন্তু এই দুটি মানুষ যখন পরবর্তী ক্ষেত্রে বাস্তব-সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ হল তখন তাদের কাছে সমস্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকল। প্রাথমিক পর্যায়ে সংসারের প্রয়োজনে বা সচ্ছলতার তাগিদে হয়তো সুপ্রীতি পাড়ার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে প্রয়োজনটি ঢাকা পড়ে যায়। দায়িত্ব কর্তব্য-ই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। সুপ্রীতি নিজের সংসারে যেমন গৃহিণী, সেখানকার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দায়িত্বও সে ভালোবেসে

গ্রহণ করতে থাকে। বিদ্যালয়টিও তার আর একটি পরিবার। এই দুই পরিবারের প্রতি তার সমান ভালোবাসা বর্তমান। দুটি পরিবারকেই সুপ্রীতি তার প্রাণসত্তা দিয়ে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চায়। কাজেই দুই দিকে সমান নজর দিতে গিয়ে সে হয়ত অনেক ভুল ত্রুটি করে ফেলে। পূর্বের তুলনায় তার আচার আচরণে স্বাভাবিকভাবে অনেক পার্থক্য দেখা দেয়। আর সেই পার্থক্যগুলি অনেক বড় হয়ে স্বামী শৈলেনের চোখে ধরা পড়ে। ফলে জটিলতার সূত্রপাত ঘটে।

শৈলেন স্ত্রী সম্পর্কে পূর্ব জীবনের সঙ্গে বর্তমান জীবনের তুলনা করে ভাবে – "মাত্র বছর দেড়েকের চাকরিতে মাস্টারনীর মুখোশ ওর মুখে শক্ত হয়ে আটকে বসেছে। সে মুখোশ ও কখনো যেন খুলতে চায় না, না কি চাইলেও পেরে ওঠে না। ওর ছাত্রী পড়ানো গম্ভীর মুখে আদর করে চুমো খেতে মাঝে মাঝে দ্বিধা হয় শৈলেনের, ভয় হয়। সে চুম্বন হয়তো ওর মুখোশে ঠেকে যাবে, মুখ স্পর্শ করবে না" এই আশঙ্কা যেমন তার মনের মাঝে বাসা বাঁধে ঠিক এর বিপরীত ভাবনাও তার মনে জায়গা করে নেয়। শৈলেন ভাবে – "এই মাস্টারনীর চাকরি থেকে স্ত্রীকে ছাড়িয়ে আনবে, ওর স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। আরো কষ্ট হয় ওর গলার স্বর, মুখের লাবণ্য বদলে যাচ্ছে দেখে। পেশার ছাপ পড়ে যাচ্ছে ওর চেহারায়, সে ছাপ দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।"[১৮১] স্বামীর এই উদ্বেগ স্ত্রীর প্রতি মায়া-মমতা, ভালোবাসার-ই স্মারক। তবে শৈলেন বাস্তবতা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই মনোভাবকে মনের মধ্যে বেশীক্ষণ স্থান দিতে পারে না। সব সময় স্ত্রীর স্কুলকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, কর্মপ্রয়াস শৈলেনের কাছে বিরক্তির উদ্রেক করে। তার মনে হয় সুপ্রীতি যেন দিনের পর দিন ঘরে-বাইরে হেডমিস্ট্রেস হয়ে উঠছে এবং স্বামীকে উপেক্ষা ও অবহেলা করছে।

শৈলেনেরও শখ-আহ্লাদের পরিচয় আমরা গল্পে পেয়ে থাকি। সেও সংসারের নানান সমস্যা-জটিলতাকে পেছনে ফেলে স্ত্রীকে নিয়ে মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটারে যাবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু সর্বদা কর্মব্যস্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ স্ত্রীর মধ্যে পূর্বের মত সেই প্রাণোচ্ছ্বলতা সে দেখতে পায় না। ফলে সেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আসলে সংসার জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে হয়তো শৈলেন অফিসে কেরানীর পদে কর্মরত; ফলে দৈনন্দিন জীবনে তার ক্রিয়া-কর্ম রুটিন মাফিক-ই আছে তাতে কোন বদল হয়নি। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের এই মধ্যপথে এসে সুপ্রীতি কাজে যোগদান করায় তার প্রাত্যহিকতায় নতুন রুটিন যুক্ত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন এসেছে। আর এই পরিবর্তনকে শৈলেন মেনে নিতে পারেনি।

স্ত্রীর কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে শৈলেন একবার ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা দেখে দিয়েছিল।

কিন্তু সে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে সুপ্রীতি পুনরায় খাতাগুলো দেখছে। স্ত্রীর এমন আচরণ ও স্বামীর যোগ্যতাকে অস্বীকার করবার দিকটি শৈলেন ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তার আত্মসম্মান আহত হয়। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর নিযুক্ত ঝি-টি একদিন একটি কথার পরিপ্রেক্ষিতে যখন অবজ্ঞার হাসি হেসেছিল তখন শৈলেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কেননা ঝি-টি যেন জানাতে চায় – শৈলেন ওকে কাজে বহাল করেনি, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়ার শক্তিও তার নেই। কোয়ার্টারটা স্কুলের। স্বয়ং সেক্রেটারী হেডমিস্ট্রেসের সেবা পরিচর্যার জন্য তাকে এখানে রেখেছেন। শৈলেন কথা বলবার কে ? এখানেই শেষ নয়, সে হেডমিস্ট্রেসের স্বামী – এ পাড়ায় এই তার একমাত্র পরিচয়। স্কুলের ছাত্রীরা, অভিভাবকরা, গোয়ালা, মুদি, কয়লাওয়ালা, রেশনশপের মালিক পর্যন্ত তাকে এই পরিচয়ে চেনে। অথচ বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, উপার্জনে শৈলেন স্ত্রীর চেয়ে অনেকটাই উঁচু স্তরে অবস্থান করে। স্ত্রীর পরিচয়ে এইভাবে বেঁচে থাকবার বিষয়টিতে শৈলেন নিজের কাছেই যেন অনেক নীচে নেমে যায়। এই হীনমন্যতা থেকেই স্ত্রীর প্রতি তার একরকম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তার মনে হয় সুপ্রীতিও যেন চায় না – শৈলেন এপাড়ায় পরিচিত হোক, তাকেও লোকে জানুক, চিনুক; বরং সে নিজের খ্যাতির আড়ালে স্বামীকে যেন সরিয়ে রাখতে চায়। আবার সেক্রেটারী অনুকূল সরকার যখন শৈলেনের নাম ধরে ডাকে তখন শৈলেনের মনে হয় – "তিনি এসেছেন হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতি মুখুজ্যের কাছে। গৃহস্বামীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, বিশেষ কোন কথাও নেই। স্কুলের দারোয়ান ভজন সিং এর মত শৈলেনও এই হেডমিস্ট্রেসের কোয়ার্টারের দ্বাররক্ষী মাত্র, আর কিছু নয়।"[১৮২] এইরকম ছোট ছোট ঘটনা ও খামতিগুলি শৈলেনের মনে দাগ কাটে, ফলে সে নিজের সম্পর্কে একরকম হীনভাব উপলব্ধি করে। সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি তার ঈর্ষা জাগে, যা উভয়ের মধ্যে এক অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দেয়। শৈলেন সুপ্রীতির চাল-চলনেও সন্দেহ করতে থাকে তাই সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার সময় সুপ্রীতি শাড়ি বদল করে নেওয়ায় শৈলেন বলে ওঠে – "কেবল কি শাড়ি বদলালেই হবে। মুখে পাউডারের পাফটা একটু বুলিয়ে নেবে না ? গলায় সরু হার ছড়াও পরে নাও, বেশ দেখাবে।"[১৮৩] এইভাবেই ভুল বোঝাবুঝি ও প্রয়োজনের তাগিদ পূরণের উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। শৈলেনও স্ত্রীর আচরণের প্রতিশোধ তুলতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে হেসে কথা বলেছে এবং সে যখন নিজ উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে তখন যেন অনেক বেশী খুশি হয়েছে এবং শান্তি পেয়েছে।

ফলস্বরূপ স্বাভাবিক সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির পথে এগিয়ে চলে। এমত অবস্থায় একটি ঘটনাক্রম সেই গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। দেখা যায়, সেক্রেটারী স্কুলের সকল

সহকর্মীদের সম্পূর্ণ বেতন প্রদান করতে অসমর্থ হলে হেডমিস্ট্রেস তার প্রাপ্য মাইনে থেকে সকলের প্রয়োজন মেটায় অথচ ঐ মাইনেটা তাদের সংসারের জন্য অত্যন্ত জরুরী। শৈলেন এতদিন স্কুল সম্পর্কে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এক কঠোর ও রুক্ষ হেডমিস্ট্রেসকে দেখেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তার অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে আজ প্রথম তার মধ্যে যে নিঃস্বার্থ দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ ও মহৎ উদারতার পরিচয় পায় তা যেন শৈলেনের মনের সমস্ত ক্ষোভ, অভিযোগ, অভিমানকে লুপ্ত করতে সাহায্য করে। ফলে সে গভীর আবেগে স্ত্রীকে কাছে টেনে নেয়। এখানেই গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রর শিল্প নৈপুণ্য। একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক যখন ধীরে ধীরে নানা জটিলতার পাঁকে আবদ্ধ হয়ে প্রায় ভাঙনের মুখে এসে উপস্থিত ঠিক তখন যেন লাগাম টেনে ধরলেন। বিপরীত খাতে স্রোতধারাকে বাহিত করলেন। ফলস্বরূপ সম্পর্কের বৈচিত্রময়তায় গল্পটি অনন্যতা লাভ করেছে।

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় **"দাম্পত্য"** গল্পটি প্রকাশিত হয়। 'দাম্পত্য' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল – দম্পতি সম্বন্ধীয় বা বিবাহিত অবস্থা। আমরা প্রত্যেকটি মানুষ শারীরিক ও মানসিক কাঠামোগত দিক থেকে প্রত্যেকের থেকে পৃথক। তথাপি আমরা সমাজবদ্ধ জীব; তাই সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের তাগিদে আমরা পারস্পরিক কোন না কোন সম্পর্কে জড়িয়ে। পাশাপাশি অবস্থান করে থাকা বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক হল দাম্পত্য সম্পর্ক। সেখানেও দুটি ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার মানুষ পরস্পরের মননকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। একজন হয়তো আর একজনকে নিজের শিক্ষা-রুচি অনুযায়ী গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। আর অপরজন তাতে সাহায্য করে। এইভাবেই উভয়ে নানা বিষয়কে গ্রহণ-বর্জন করে অভিযোজনের মাধ্যমে একসঙ্গে থাকে বা থাকবার চেষ্টা করে। একে অপরকে উপলব্ধির মাধ্যমে মানসিকতা ও পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করাটাই আসল। কিন্তু যেখানে রুচি-শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবনা অনেকটাই বিপরীতধর্মী হয় এবং মানসিক আদান-প্রদান ব্যাহত হয় সেখানে ধীরে ধীরে মানসিক দূরত্বও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তার প্রভাব পড়ে চলমান সম্পর্কের উপর।

আলোচ্য গল্পে একজন কথকের বর্ণনার মাধ্যমে যে দু'জন দম্পতির পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতার মূলে ছিল মানসিক বৈপরীত্যের সমান্তরাল চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতার বিষয়টি। কথক নির্মলের বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় – গল্পের পুরুষ চরিত্রটি অর্থাৎ বীরেনবাবু একজন সংসার সম্বন্ধে উদাসীন, কর্মভীরু মানুষ ছিলেন। তিনি কলকাতায় মেস

বাড়িতে নির্মলের সঙ্গে থাকতেন এবং গ্রামের বাড়িতে থাকতেন তার স্ত্রী ও কন্যারা। চিঠি-পত্র ছিল স্বামী-স্ত্রীর যোগাযোগের মাধ্যম। নির্মল বীরেনবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ রমা বৌদিকে কলকাতায় নিয়ে আসার কথা বললে উত্তরে বীরেনদা জানায় – "ক্ষেপেছ! স্থায়ী চাকরি-বাকরি নেই। শহরে বাসা করে কি মরব ? তাছাড়া অত জড়ানো সংসার আমার স্বভাবে সয় না। এই বেশ আছি। নিজেকে মাঝে মাঝে ব্যাচিলর ভাবতে পারি। তোমাদের মত ব্যাচিলরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে পারি। বাসা করলে তা আর পেরে উঠব না।"[১৮৪] বীরেনদার এই বক্তব্যের মাধ্যমে তার দায়িত্ব কর্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। শুধু তাই নয়, তার আত্মবিশ্বাসের অভাব তাকে কর্মভীরু করে তোলে ও তার মানসিক দুর্বলতাকে ক্রমশ বৃদ্ধি করে। সেই বিষয়টি নির্মলের আর একটি জবানীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইভাবে – "তাছাড়া বীরেনদারও দোষ যথেষ্ট। চাকরি করা ওঁর ধাতে নেই। মন দিয়ে কাজকর্ম করলেন না। এত বয়স হল, মন দিয়ে কোন কাজ শিখলেনও না, চিরকাল কেবল এড়িয়ে এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন। এমন কর্মভীরু লোক আমি আর দুটি দেখিনি।"[১৮৫] জানা যায়, বীরেনদা একজন বাঙ্ময় পুরুষ। একমাত্র উৎসাহ আছে তার বাক্যে। তবে সেটিও তিনি কাজে লাগাতে পারেন নি।

অপরদিকে তার স্ত্রী রমা বাস্তব সংসারের একজন বস্তুবাদী চরিত্র। ফলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য নানারকম বাসনা তার মনে বাসা বাঁধে। কিন্তু বিপরীতধর্মী মানুষ হিসাবে স্বামীর উদাসীনতা, দায়িত্ব-কর্তব্যকে অবহেলা করবার মানসিকতা ও কর্মদক্ষতার অভাব নিজের চাহিদা পূরণের মূল পরিপন্থী। এর ফলস্বরূপ স্বামীর প্রতি একরকম অসন্তোষ তার মনের মধ্যে জমা হয়। শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষা পূরণের অভাবই অসন্তোষের কারণ নয়, স্বামী দেখতে কালো ও কুৎসিত বলে তার মনে জাগে আক্ষেপ ও অনুশোচনা। আর সেই আক্ষেপকে আরও বৃদ্ধি করেছে তার পাঁচটি কন্যা সন্তানই বাবার মত চেহারা ও গায়ের রং-এর অধিকারিণী হয়েছে বলে। তাই স্বাভাবিকভাবে রমার মনের অনুশোচনা ও বিষাদের সুর কন্ঠে ধরা পড়ে এইভাবে – "যে লোকের হাতে পড়েছি তাতে নিজের ভবিষ্যৎ আমার আর জানতে বাকি নেই।..... বউদি ওদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, এও এক ভাগ্য, এতগুলি সন্তান হল, সবকটিই মেয়ে। চেহারাটাও সবকটির একেবারে বাপের মত। একটাও দেখতে শুনতে একটু অন্যরকম হতে পারত।"[১৮৬] বীরেন স্ত্রীর মনোভাব সম্পর্কে যেমন জ্ঞাত ছিলেন, ঠিক তেমনি নিজের সম্পর্কেও। এ যেন চরম উদাসীনতার সঙ্গে কঠোর বাস্তবতার দ্বন্দ্ব, এক রুচির সঙ্গে আর এক বিপরীত তথা স্থূল রুচির জোরপূর্বক মেলবন্ধন। দুটি মানুষের মানবিক মাত্রাগত পার্থক্যের সমস্যা উভয়কে

উপলব্ধি করবার পথে বাধা-স্বরূপ। আবার বলা যায়, সেই বাধাকে অতিক্রম করার কোন চেষ্টা দু'জনেই করেনি। ফলে তাদের মনের ক্ষোভ ও অতৃপ্তিবোধই জাগ্রত হয়েছে, সহনশীলতা নয়; পরস্পর পরস্পরের মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। কাজেই স্ত্রী রমা যখন আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মতো খাওয়া-পরা-বিলাসিতা ইত্যাদি দৈনন্দিন বিষয়ের চাহিদা পূরণের আবদার জানিয়েছে তখন স্বামীর কাছে মনে হয়েছে তা ব্যাভিচার ও স্থূলতা। এখান থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে মূল সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। আর তা আরও সংকটাপন্ন হয় যখন স্ত্রী একরকম জোর করেই সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। তাতে সংসারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার দায়িত্ব অর্পিত হয় স্বামীর উপর। কিন্তু তার কাছে তা এক কঠিন বিষয়। মুক্তিকামী মানুষটির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অস্বস্তি ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি চেষ্টা করেছেন। নানা জায়গায় চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারেননি। ফলে হতাশাগ্রস্ত হয়েছে।

অপরদিকে আমরা দেখি রমা শহুরে সংস্কৃতির অংশীদার হতে মেয়েদের কর্পোরেশনের ফ্রী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে সাধ্যমত নিজের সাধ মিটিয়ে চলতে থাকে। এমনকি, পাশের বাড়ির মহিলার সঙ্গে সিনেমা থিয়েটারে যায়। যেখানে দর্শন মুখ্য নয়। তারও যে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার সামর্থ আছে প্রতিবেশিনীকে সেইটি দেখানোই প্রধান বিষয়। আর তা সার্থক করবার প্রচেষ্টায় বীরেনদা সর্বদা ব্যস্ত। এবং দেখা যায় কখনো কখনো অসমর্থ হয়েছেন। তখন হয়তো স্ত্রী প্রেরণা দিয়েছে পুনরায় চেষ্টা করবার কিন্তু বীরেনদার কাছে সেই চেষ্টা তাড়নার সামিল। তার ব্যর্থতাকে স্ত্রী বারবার অক্ষমতা বলে ব্যঙ্গ করেছে। চাকরি যখন ছিল তখনই অভাব অনটন নিয়ে সংসারে ঝগড়াঝাঁটির অভাব ছিল না। চাকরি যাওয়ার পর তা আরও বাড়ল। আমরা জানি প্রত্যেকটি সম্পর্কেই জোয়ার-ভাঁটা আসে। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে দু'জন মানুষ যদি দু'জনের পাশে থাকে তবে যে কোন সমস্যা থেকেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। তবে বিষয়টি বিপরীত হলে সম্পর্কটিও ক্রমশ অবনতির দিকে এগোয়। বীরেন ও রমার সম্পর্কও প্রাণ-সত্তাকে হারিয়ে ফেলে। কথক নির্মল বীরেনদার মায়ের কাছে জানতে পারে – "টাকার জন্যে সে কোথাই বা না যেত। বাসায় একটু কালও কি তার সুস্থ মত থাকবার জো ছিল। ঘরে বউ আর দোরগোড়ায় পাওনাদার। এদের জ্বালায় সে রাতদিন অস্থির হয়ে পৃথিবীময় ছুটোছুটি করে বেড়াত।"[১৮৭] স্ত্রীর ক্রমশ নিত্য নতুন চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে ক্লান্ত বীরেনদা জীবনযুদ্ধেও একজন পরাজিত মানুষ। তার ব্যর্থতা তাকে আরও হীনমন্য করে তোলে এবং নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার মত বিতৃষ্ণাকেও মনের মধ্যে জন্ম দেয়। তার মনের অবস্থা

তিনি নির্মলের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন – "দেখ নির্মল, শুধু তোমরাই যে আমাকে অপছন্দ কর তাই নয়। আমিও করি। শুধু অপছন্দ নয়, ঘৃণা করি। নিজের অস্তিত্ব আমার কাছে অসহ্য। রমাই যে আমার চেহারাটা অপছন্দ করে তাই নয়। নিজের আকৃতিটাকে নিজেও আমি দুচোখে দেখতে পারি নে।"[১৮৮] এরকম একটা মনোভাব শেষ পর্যন্ত বীরেনদাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করে।

তবে আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীর মৃত্যুও রমার মনের ভাবান্তর ঘটায়নি। এই মৃত্যু তার কাছে একজন অক্ষম মানুষের কাপুরুষতা। বরং এতে তার মনের তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তা আরও বেশী বিস্তৃত হয়েছে যখন সে উপলব্ধি করেছে সে আবার অন্তঃসত্ত্বা। রমা অনুভব করেছে, তার উপর স্বামীর প্রতিশোধ নেবার এ এক পন্থা। এই প্রসঙ্গে কথক নির্মলের জবানীতে সম্পর্কতত্ত্বের এক জটিল ও গভীর সত্য উঠে এসেছে – "না কি ওঁদের ভিতরে গভীর প্রেমের অভাব ছিল বলে, পরস্পরের শিক্ষা আর রুচির ব্যবধান ছিল বলে ওঁরা পরস্পরের মনকে ছুঁতে চাইতেন, মনকে পেতে চাইতেন ? মনে পড়ল স্বজনবন্ধুদের মধ্যে আমি এমন আরো দু'একজনকে দেখেছি। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মনের মিল যত কম, দেহের মিলনাকাঙ্ক্ষা তত বেশী, সন্তান সংখ্যা তত প্রচুর"[১৮৯] তাই বোধ হয় বীরেন ও রমার সন্তানরা তাদের সমগ্র দাম্পত্য জীবনে মিলনের ঐ ক্ষণিক মুহূর্তের স্মারকচিহ্ন স্বরূপ। তবে রমা স্বামীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে রাজী নয়। তাই সে এই সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে চায়নি। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যায়, সে চেষ্টা তার সফল হয়নি। এবং সে এই প্রথম একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। আর তাকে দেখেই তার দুচোখে অশ্রুধারা বাহিত হয়। আর সে অশ্রু শুধুমাত্র তার স্বামীর জন্যই। রমা আক্ষেপ ও অভিমানের সুরে বলে ওঠে – "তার অনেক দিনের সাধ ছিল এ জিনিস দেখবে। দেখে যেতে পারল না। কেন অমন করে গেল, কেন অমন করে সে চলে গেল ঠাকুরপো ?"[১৯০] এই উদ্বেগেই লুকিয়ে আছে স্বামীর প্রতি সুপ্ত ভালোবাসা, যার উপলব্ধি ঘটে এই পুত্রসন্তানকে জন্মদানের মাধ্যমে। আজ প্রথম স্ত্রী তার স্বামীর অস্তিত্বের অভাবকে অনুভব করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে এতদিন ধরে যে ভাঁটার টান ছিল তাতে নবাগত পুত্রসন্তানটির মধ্যস্থতায় পুনরায় জোয়ার আসে।

"অপঘাত" নামক গল্পটি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে পূর্বে আলোচিত গল্পগুলির সঙ্গে উক্ত গল্পের খানিকটা পার্থক্য আছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই এখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেদিক

থেকে এটি ভিন্ন মাত্রার গল্প। তথাপি দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার খেলা এখানেও বর্তমান। আমরা শুধুমাত্র সেই সম্পর্কের গতি-প্রকৃতিটিই গল্প থেকে গ্রহণ করব। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের বৈচিত্রময় ধারার একটি উদাহরণ হিসাবে এই গল্পটিকে নেওয়া যেতে পারে।

কাহিনীর অন্তর্গত দু'জন মানব-মানবীর দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। অর্থাৎ বলা যায়, বাহ্যিক অবস্থা দু'জন দম্পতির সম্পর্কের প্রধান নিয়ন্ত্রক। কাহিনীসূত্রে রয়েছে – মূলত খাদ্যসংকটের প্রেক্ষাপট, যেখানে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে বেঁচে থাকবার প্রশ্নই বড় হয়ে ওঠে। এরই সমান্তরালে উঠে এসেছে কতগুলি ক্ষমতালোভী বিত্তবান মানুষের মানসিক বিকৃতির দিকটি। এই পরিস্থিতিতে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত গল্পের সুধীর ও তার স্ত্রী বেলার জীবনকেও আলোড়িত করেছে। প্রতিবাদের মিছিলে সামিল হয়ে বেলা প্রাণ হারায়।

গল্পের মূল দুটি চরিত্র – সুধীর ও বেলার সাংসারিক জীবন ছিল স্বাভাবিক। সিঁদুর পরাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাধারণ হাসি-ঠাট্টা পরিলক্ষিত হয়। স্বামীর এক প্রশ্নের উত্তরে বেলা জানায় –"সিন্দুর মেয়েরা কার জন্য পরে জানো না। সিন্দুরে পুরুষের আয়ুবৃদ্ধি।" প্রত্যুত্তরে সুধীর বলেছিল –"আর মেয়েদের বুঝি কিছুই বাড়ে না ?"[১৯১] কাজের এত তাড়ার মধ্যেও বেলা সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়াতে ভুলে যায় নি – একথা সুধীরের সেদিন ভাবতে ভালো লেগেছিল। স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথন ও আভাস ইঙ্গিতের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি গভীর আবেগ তথা ভালোবাসার দিকটিই আমাদের সম্মুখে উত্থাপিত হয়। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে সময় ও পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়, যাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মানসিকতারও রূপান্তর ঘটে। দেশ জুড়ে নেমে আসে দুর্ভিক্ষের ভয়াল প্রভাব। সুধীর ও বেলার দাম্পত্য সম্পর্কও তার স্বাভাবিকতা হারায়। অনাহারে থাকা সন্তানদের যন্ত্রণা মা হিসাবে বেলার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তাই কটু কন্ঠে সে স্বামীকে বলে – "কোন ভদ্রলোক ছেলেপুলে নিয়ে তোমার মত উপোস করে নেই।" তাতে সুধীর বিরক্ত হয়ে জবাব দেয় – "তা দেখতে না পার চোখ বুজে থাক। এক বেলা না খেয়ে থাকলেই তোমার ছেলেমেয়ে যদি মরে মরুক।"[১৯২]

এখান থেকেই তাদের সম্পর্কের জটিলতার সূত্রপাত ঘটে। এরপর চালের সন্ধানে বাইরে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে বেলা ক্রোধে অপমানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে যাত্রায় বেঁচে যায়। তবে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনমন ঘটে। সেই সঙ্গে বেলার জীবনের অন্যান্য সম্পর্ক – পারিবারিক ও সামাজিক – নানা সম্পর্কে

পরিবর্তন আসে। মধু পোদ্দারের বাড়ি চালের চেষ্টায় গেলে শুধু হাতে ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু মেয়েদের যা সবচেয়ে বড় জিনিস তা রেখে আসতে হয়। বেলা যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল তার মূলে নাকি এই সম্মান খোয়াবার লজ্জা – এরকম একটি গল্প-কাহিনী পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বেলা একটু সুস্থ হয়ে স্বামীর প্রতি পরম বিশ্বাসের জায়গা থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল – "তুমি এসব বিশ্বাস করছ ?" কিন্তু সুধীর উত্তর দিয়েছিল – "আমার বিশ্বাস করায় না করায় কিছু এসে যায় না। হাটে, বাজারে, অফিসে, আদালতে তোমার জন্য কোথাও মুখ দেখাবার জো নেই। দেশ থেকে আমাকে এবার চলে যেতে হবে।"[১৯৩] স্বামীর এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ বেলার অন্তরাত্মাকে আহত করেছিল। কেননা, সে ভেবেছিল – আর সবাই যা-ই বলুক বা ভাবুক না কেন, তার স্বামী অন্ততপক্ষে এই রটনা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে ভুল প্রমাণিত হয়; তাই অনুতপ্ত সুরে বলে ওঠে – "তার চেয়ে আমাকে কেন চলে যেতে দিলে না। কেন আমাকে বাঁচাতে গেলে। সব আপদ বালাই নিয়ে আমি মরে যেতাম, তোমাকে রেহাই দিয়ে যেতাম।"[১৯৪] কারণ সে জানে স্বামীর এই মনের ভুল ভাঙানো তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। এইভাবেই দুটি মানুষের মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। তবু এ জীবন কখনো থেমে থাকে না, তা আপন গতিতে এগিয়ে চলে বা বলা যায়, জীবনকে চালিয়ে নিতে হয়। তবে অতীতও সঙ্গে সঙ্গে চলে। তাই অভাব-অনটন নিয়ে কথান্তর হলেই সুধীর স্ত্রীকে খোঁটা দেয় – "তোমাকে কিছু বলতেই ভয় হয়, আবার কোন দিন দড়ি নিয়ে ঝুলে পড়বে।" শুধু স্বামী নয়, ছ'বছরের সন্তানও মাকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করে – "আচ্ছা মা, তুমি নাকি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলে ?.... ভারি মজার না ? আর একদিন দেবে গলায় দড়ি ? আমি দেখব।"[১৯৫] এখানেই বেলার জীবনের ট্র্যাজেডি ধরা পড়ে। এমনকি, শাশুড়ি নয়, পাড়ার নানা বয়েসী বউ-ঝিরাও সুযোগ পেলে কৌতূহল মেটাতে নানা প্রশ্ন করে। এককভাবে এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় বেলাকে। এই পরিস্থিতিতে স্বামীকেও সে সঙ্গী হিসাবে পায়নি। কিন্তু অনাহারে থাকা সন্তানের মা হিসাবে তাদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে ব্যর্থ বেলা কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল এই বিষয়টি কেউ উপলব্ধি করে নি। সেই মুহূর্তের যন্ত্রণা তথা হৃদয়ানুভূতিকে কেউ অনুভব করতে সক্ষম হয় নি। এই বিষয়টি-ই বেলাকে অনেক বেশী আঘাত করেছে। আর সেই আহত মনের প্রতিফলন যে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কগুলির উপর পতিত হবে এটাই স্বাভাবিক। পরিস্থিতি পরিবেশ জীবন যন্ত্রণাকে কোন্ মাত্রায় নিয়ে যায় এবং সুস্থ সম্পর্কে আঘাত হানে সেই বিষয়টি এই গল্পের সুবীর ও বেলা চরিত্রের দাম্পত্য সম্পর্কে ধরা পড়েছে।

রচনার কাল অনুযায়ী পরবর্তী গল্প হিসাবে **"এক পো দুধ"** গল্পটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এটি 'গল্পমালা - ১' এ অন্তর্ভুক্ত। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'মুখপত্র' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। এখানে আছে আর্থিক দীনতার প্রেক্ষাপটে সামান্য কিছু চাহিদা প্রাপ্তির দিক। যাকে কেন্দ্র করে একটি চরিত্রের আচরণের বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আর সেই বিষয়টি একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। অর্থাৎ বলা যায়, সময় ও অবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানসিকতার যে পরিবর্তন হয় তা নতুন আচার-আচরণের জন্ম দেয়। এই নবলব্ধ আচার-ব্যবহারই যেন তখন চরিত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলস্বরূপ চরিত্রটির সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কের উপর তার প্রভাব পড়ে। আলোচ্য গল্পের ক্ষেত্রেও এই দিকটি প্রতীয়মান। "এক পো দুধ" কে কেন্দ্র করে একটি দাম্পত্য সম্পর্কের উত্থান-পতনের নানা পর্যায় কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা কোন স্তরে উন্নীত হয়েছে তা আলোচনায় তুলে আনা হয়েছে।

গল্পের কাহিনীতে দেখা যায়, একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। যেখানে অর্থসংকটের কারণে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের জীবনে অসচ্ছলতা নিত্য সঙ্গী। তথাপি এই পরিস্থিতিতেও গল্পের নারী চরিত্রটি অর্থাৎ স্ত্রী লতিকার চোখে স্বামীর ভেঙে পড়া চেহারার দিকটি ধরা পড়ে। তার মনে হয় – "খাটতে খাটতে লোকটির চেহারা একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। এই তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর মোটে বয়স। এরই মধ্যে বিনোদের দু'গাল ভেঙেছে চোয়াল জেগেছে, কেমন যেন বুড়ো বুড়ো হয়ে গেছে দেখতে। লোকটির দিকে যেন আর তাকানো যায় না।"[১৯৬] তাই সে সংসারের অন্যান্য খরচকে খানিকটা কমিয়ে এনে স্বামীর জন্য এই যে ভাবনা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে লতিকা যে কার্যটি সম্পন্ন করল, তার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের একটি সূক্ষ্ম দিক লুকিয়ে আছে। তা হল পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার এক গভীর অনুভূতি। আর এই অনুভূতি জাত বোধ থেকেই তার মনে স্বামীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের জন্ম নিয়েছে। অপরদিকে গল্পের পুরুষ চরিত্র অর্থাৎ স্বামী বিনোদ সংসারের কর্তা। স্ত্রী, সন্তান ও ভাই -এর প্রতিপালক সে। কাজেই পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার সমস্ত রকম দায়িত্ব তার উপরেই অর্পিত হয়েছে। এরকম দিনযাপনের গতানুগতিক দিনলিপিতে সে যখন হঠাৎ করে এক কাপ দুধ পায় তখন মনে মনে আনন্দিত হয়ে ওঠে। এবং সে উপলব্ধি করে এই প্রাপ্যের উদ্যোক্তা তার স্ত্রী। বিষয়টি তার মনে ভাবান্তর ঘটায়। তার কাছে এ শুধু মাত্র এক কাপ দুধ নয়, যেন দুধসাগর, স্ত্রীর গোপন হৃদয়ের প্রেমসাগরের প্রতিরূপ। এই

ঘটনার মাধ্যমে স্বামী স্মৃতি রোমন্থনে খুঁজে পায় তাদের দাম্পত্য জীবনের সূচনাপর্বের রোমাঞ্চিত দিনগুলিকে, যা তার মনকে পুলকিত করে। অনেকদিন পর সে যেন স্ত্রীকে নতুনভাবে দেখতে পায়। আসলে এই দৃষ্টিতে ছিল স্ত্রীর প্রতি স্বামী বিনোদের গভীর ভালোবাসার অনুভূতি। তাতে লতিকার বর্তমান শ্রীহীন মুখটিও ধরা পড়ে। গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই – দাম্পত্য জীবনের সূচনার বারো বছর পরের এক অবস্থাকে নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। এই বিস্তৃত সময়পর্বে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তার চাপে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ধারাটি শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে এক পো দুধকে কেন্দ্র করে সেই ধারা যেন পুনরায় সিক্ত হয়ে ওঠে।

প্রথম দিন পরিবারের অন্যান্যদের সামনে কেবলমাত্র নিজের দুধ খাওয়ার দিকটি বিনোদের মনকে সংকুচিত করে, তার বিবেকে বাধে। তাই ছেলে সুনীল পড়তে বসে যখন অমনোযোগী হয়ে বাবার দুধ খাওয়া দেখে তখন বিনোদও লজ্জিত হয়, কিছুক্ষণ ভেবে সে বলে – "তুই একটু খাবি নাকি দুধ ও সুনীল।" আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাই বিজন তার বৌদির সঙ্গে যখন স্বাভাবিক ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলে – "দাদা বুঝি তেষ্টার চোটে না থাকতে পেরে খালি কাপে চুমুক দিচ্ছে। দাদাকে এক কাপ চা করে দিলেই পার।" তখন বিনোদ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। হয়ত বিজনের কাছে দাদার দুধ খাওয়ার বিষয় অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু বিনোদের মনের সংকোচ থেকে ভাবনা আসে, যে ভাই হয়তো জেনে শুনেই তাকে ব্যঙ্গ করছে। তাই বিনোদ লজ্জিত হয়ে অপরাধীর ভঙ্গীতে সত্য প্রকাশ করে বলে – "চা নয় বিজু দুধ খেলাম এক কাপ। তোর বৌদি রেখে দিয়েছিল।.... ওকে এক কাপ কাল দিয়ো।"[১৯৭]

আসলে অভাবের সংসারে তাদের মত মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা একরকম বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। আর এই বিলাসিতা যখন সকলকে এড়িয়ে শুধুমাত্র একজন ভোগ করে তখন স্বাভাবিকভাবে তার মানবিক মূল্যবোধ সেই কার্যটিকে সমর্থন করে না। আর তা থেকেই তার মনে দ্বিধা ও সংকোচবোধ-এর জন্ম দেয়। এই মনোভাবটি বিনোদের মধ্যে দ্বিতীয় দিনও পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে বিনোদ দুধের কাপটি শেষ করল, যেন চুমুকের শব্দ কারো কানে না যায়। তবে দিনকয়েক পরে সেই মনোভাব অনেকটা ম্লান হয়ে আসে এবং সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই সমস্ত লজ্জা ও সংকোচ বিনোদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। আসলে মানুষ অভ্যাসের দাস। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এই দুধটুকু পেতে পেতে ও খেতে খেতে বিনোদ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। আর সেই অভ্যাস থেকে বিনোদের মনে হয় ঐ খাদ্যবস্তুটি গ্রহণ করবার অধিকার

একমাত্র তারই, কেননা, সে এই সংসারের আয় কর্তা। এখান থেকেই বিনোদের মানসিকতার পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। পার্থক্য ঘটে তার আচার-ব্যবহারের। দেখা যায়, ভাই বিজন একদিন চাকরির চেষ্টায় বাইরে বেরিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে ভাত খেতে বসে যখন খেতে পারছিল না তখন লতিকা বিনোদের ভাগের দুধটুকু বিজনকে দিয়েছিল। এই সংবাদে বিনোদ মনে মনে ক্ষুন্ন হয়, গম্ভীরভাবে শুধু মুখে বলেছিল – "বেশ করেছ"। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনের ভাবটি প্রকাশিত হয় এইভাবে – "দুধই খাওয়াও আর আমসত্ত্বই খাওয়াও, জীবনে ওর চাকরি হবে না বলে দিলাম"[১৯৮] আসলে ভাইয়ের চাকরি না পাওয়ার আক্ষেপ নয়, বিনোদের ভাগের দুধটুকু না পাওয়ার আক্ষেপই এখানে আসল। আর একদিন সুনীল দুধটুকু খেয়েছিল শুনে বিনোদ জানায় – "হুঁ ছেলেবেলা থেকেই এত লোভ ভাল না!"[১৯৯] বিনোদের এই মনোভাব তার এককেন্দ্রিক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। যেখানে নিজ চাহিদা ও প্রয়োজনই বড় হয়ে ওঠে। পরিবারের অন্যান্যদেরও যে খাওয়ার চাহিদা থাকতে পারে বা অধিকার আছে সে বিষয়ে বিনোদ উদাসীন।

স্বামীর আচার-ব্যবহারের এই পরিবর্তন স্ত্রী লতিকার চোখেও বিসদৃশ লাগে। সে ভাবে – সংসারের অভাব-অনটনের কথা ভেবে বিনোদই হয়তো ঐ বাড়তি দুধটুকু 'রোজনা' করতে বারণ করে দেবে; কিন্তু সেদিকে যখন তার কোন মনোযোগ নেই তখন লতিকাই গোয়ালাকে বারণ করে দুধ দিতে। আর তাতেই দেখা যায় বিনোদ ক্ষিপ্ত হয়ে তা বহাল রাখবার নির্দেশ দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে লতিকা বলে – "আচ্ছা তোমার আক্কেলখানা কি ? তুমি যে দুধের খরচ এমাসেও বাড়িয়ে দিলে, টাকা দেব কোত্থেকে ?" প্রত্যুত্তরে বিনোদ ধমক দিয়ে জানায় – "টাকা কি তুমি দাও, যে টাকার ভাবনা ভাবছ ? টাকা যে দেয় সে দেবে। সারাদিন তোমাদের জন্য খেটে মরছি আর এক ফোটা দুধ জুটবে না আমার কপালে ?.... খাবই তো, আমার টাকা-পয়সায় আমি খাব, আমি পরব, তাতে তোর কি ?"[২০০] এই পরিস্থিতিতে বোঝা যায়, বিনোদের ভাবনার রূপান্তর ঘটেছে। আর সেই রূপান্তরিত মনোভাবই তার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এই ক্রিয়া স্ত্রীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যৌথ প্রভাবই তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়। ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হয় আর একটি ঘটনার মাধ্যমে। একদিন স্বয়ং লতিকা বিনোদের ভাগের দুধ খেয়ে ঠাট্টা করে স্বামীকে জানায় বিড়ালে দুধ খেয়ে নিয়েছে। তাতে ক্রুদ্ধ বিনোদের প্রতিক্রিয়া – "পাশের বাড়ির বেড়ালে এসে দুধ খেয়ে গেল, আর তুমি হাসছ। এত দামী দুধ। ঢেকে-টেকে সাবধান করে রাখতে পার না! চার আনা ক'রে এক পো দুধ। সোজা কথা! গেল তো কতগুলি

পরের বাড়ির বেড়ালের পেটে! পয়সা তো আর নিজে কামাই কর না। কি বুঝবে তার মর্ম!"[২০১] স্বামীর এই মনোভাবে লতিকা সত্যটি প্রকাশ করে। সে ভেবেছিল, সে কথা শুনে বিনোদ হয়তো হাসি ঠাট্টা করবে। কিন্তু স্বামীর মূর্তি দেখে লতিকা অবাক হয়ে গেল। খাওয়া শেষ করে থালার উপর সশব্দে গ্লাসটা তুলে রেখে বিনোদ বলল –"তা খেয়েছ খেয়েছ তার অত ভণিতার কি ছিল! বেড়াল, অম্বল কত কি। বললেই পারতে দুধ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল তাই খেয়েছি!"[২০২] স্বামীর ব্যবহারে লতিকা আহত হয়। এবং আহত মনের কথা মুখে ফুটে ওঠে – "তোমার ধারণা আমি সাধ করে খেয়েছি, ইচ্ছা করে খেয়েছি।" উত্তরে বিনোদ জানায় – "না ইচ্ছা করে খাবে কেন। পাড়ার আর কেউ এসে তোমার গলায় ঢেলে দিয়ে গেছে।" এ কথায় লতিকা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেনি তার মনের গোপন বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে – "খেয়েছি তো বেশ করেছি। তুমি তিরিশ দিন খেতে পার, আর আমি একদিনও পারিনে।...বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করে না রোজ রোজ সকলের সামনে দুধ খেতে! একদিন দুধ কম পড়লে তাই নিয়ে বাড়ি মাথায় করতে!" লতিকার মনের ভাব প্রকাশিত হলে বিনোদ তাতে লজ্জিত হয়নি বরং আরও রুষ্ট হয়। এঁটো হাতেই সে রুখে এসে বলে – "লজ্জা করবে কেন রে হারামজাদী, আমি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই, নিজের পয়সায় খাই আমি লজ্জা তোদের করা উচিৎ।"[২০৩]

স্বামী-স্ত্রীর এই বাদ-প্রতিবাদের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কের বর্তমান রূপরেখা পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ আমরা জানি একদিন এই 'এক পো দুধ'-ই তাদের সম্পর্কে সুখানুভূতির প্লাবন এনেছিল। মাধুর্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। গল্পটি এখানেই শেষ হয়ে পারত। কিন্তু দেখা যায়, রাতের অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রী যখন এক জায়গায় এসেছে তখন স্ত্রীর মনের সমস্ত অভিযোগ-ক্ষোভ ধীরে ধীরে অভিমানে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং স্বামী সেই অভিমানকে মন ও শরীর দিয়ে ভাঙতে সমর্থ হয়েছে। মন ও শরীরের যৌথ মিলনের সমন্বয়ে উভয়েই মানসিক দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে তাদের সংকটাপন্ন সম্পর্ক তার জটিলতাকে কাটিয়ে উঠতে সফল হয়েছে। তাই পরের দিন ভোরে প্রতিদিনের মত লতিকা যখন স্বামীর কাছে দুধের কাপটি নিয়ে আসে তখন বিনোদ সেটি গভীর আবেগে স্ত্রীর মুখের সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। লতিকা তখন দেবর বিজনের হাতে দিয়ে জানায় – সে খেলেই তার খাওয়া হবে। বিজন তার ভাইপোর সামনে দুধের কাপটি ধরে বলে সে খেলেই তার খাওয়া হবে। আর শেষে সুনীল তার এক দুঃস্থ, অস্থিসার, হত দরিদ্র বন্ধুকে দুধের কাপটি দিয়ে বলে – "আরে দূর পাগল। আমি তো রোজ খাই, আজ তুই নে। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।"[২০৪] তাহলে আমরা দেখতে পাই, 'এক পো দুধ' কে কেন্দ্র করে একটি দাম্পত্য সম্পর্ক নানা উত্থান-পতনকে অতিক্রম করে ক্রমশ

একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, সমস্ত সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে উদার মানবতার বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। আর এই বিষয়টি দাম্পত্য সম্পর্কেই স্থায়ী হয়ে থাকে নি, তা পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে বৃহত্তম মানবিকতায় বিস্তৃতি লাভ করেছে 'এক কাপ দুধ' -এর প্রতীকে।

'গল্পমালা - ২' এ স্থানপ্রাপ্ত **"নাকুটমণি"** গল্প ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'বসুমতী' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। এখানে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অন্তর্গত দু টি দাম্পত্য জীবনকে সমান্তরালভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে নিম্নবিত্তের দাম্পত্য সম্পর্কই আমাদের মূল লক্ষ্যবস্তু। আমরা জানি, বেঁচে থাকবার জন্য মানুষের প্রাথমিক চাহিদা হল খাদ্য। এবং এর পরবর্তী ক্ষেত্রে বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। খাদ্যের চাহিদাকে যদি আমরা জৈবিক চাহিদা ধরি তাহলে তাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে যে অন্যান্য চাহিদাগুলো আসে তাকে লাভ করবার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের জন্ম হয়। অর্থাৎ বলা যায়, প্রতিটি মানু ষের ক্ষেত্রে প্রথমে জৈবিক সম্পর্ক ও পরে মানবিক সম্পর্ক গুরুত্ব পায়। আলোচ্য গল্পে নাকুটমণি ও পান্নালালের দাম্পত্য সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক। তবে পান্নালালের বিপথগামিতা ও রোগের সংবাদ যে নাকুটমণিকে পীড়া না দেয় তা নয়। কিন্তু নাকুটমণি এসব বংশপরম্পরা অনুযায়ী দেখে আসতে আসতে সব মেনে নিয়েছে। এই বাস্তবসত্যটি তার কাছে বর্তমানে অনেক স্বাভাবিক বিষয়। আসলে নাকুটমণির মত মেয়েদের পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে হয়। তাদের রোজগারের উপর নিজেকে নির্ভর করতে হয়। দু'মুঠো খেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটাই তাদের কাছে মূল বিষয়। ফলে এই পর্যায়ে জৈবিক সম্পর্কটি তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। তাই সবকিছুকে মেনে নিয়ে সম্পর্কের স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখবার তাগিদ লক্ষ করা যায়। এই কারণে গল্পের শেষ চিঠিতে নাকুটমণি মনের কৃত্রিম আবেগ দিয়ে, মানবিকতার স্ফূরণ ঘটিয়ে স্বামীকে তোষামোদ করেছে। আসলে জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানবিকতার ছলনাকে নাকুটমণি ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ প্রথমে বেঁচে থাকা ও পরে মনের ভাবাবেগকে স্থান দেওয়া। তবে তাই বলে যে স্বামীর প্রতি তার প্রেম-প্রীতি অনুরাগের টানাপোড়েন নেই সেকথা ঠিক নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেই মানবিক সম্পর্কগুলি পরিস্থিতির কাছে, অস্তিত্ব বজায় রাখবার তাগিদের কাছে গৌণ হয়ে ওঠে। সেই দিকটি-ই এখানে মুখ্য বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে। দাম্পত্য জীবন বলয়েও যে সম্পর্কের কত স্তর থাকে, কত ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা থাকে, কত বিচিত্র অনুভূতির বৈপরীত্যমূলক টানাপোড়েন সেখানে বর্তমান থাকে, তার এক একটি দিককে পাথেয় করে স্বামী-স্ত্রী এক এক ভাবে জীবন বয়ে নিয়ে চলে। তারই এক রূপ আলোচ্য গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে।

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'বিলম্বিত লয়'** গল্পটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পে মূলত একটি সম্পর্কের-ই বিভিন্ন রূপ উন্মোচিত হয়েছে। আসলে দু'জন মানব-মানবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি দাম্পত্য সম্পর্ক বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে যখন সম্পর্কের ধারা বাহিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই সম্পর্কের পূর্ব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে না। তার প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে, ফলে তাতে বৈচিত্র্য আসে। গল্পটির নাম – 'বিলম্বিত লয়', বিস্তৃত সময়পর্বে কীভাবে একটি সম্পর্কে বিচিত্র সুরধারা উত্থিত হয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক।

আলোচ্য গল্পে লেখক যে দুটি নর-নারীকে চিত্রিত করেছেন, তাদের মননে আছে শিল্পবোধ। একজন রং-তুলি দিয়ে কল্পনার রাজ্যকে একটু একটু করে জীবন্ত করে তোলে। অপরজন মনের নানা অনুভূতিকে সুরের তালে তালে উদ্ভাসিত করে। তারা দুজনেই শিল্পী, দু'জনেই স্রষ্টা। এই সমগোত্রিয়তা ও সম-মানসিক ভাবনা-ই পরস্পরকে কাছে আনে এবং তারা পারিপার্শ্বিক নানারকম বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। পূর্বে 'দাম্পত্য' নামক একটি গল্পে আমরা দেখেছি স্বামী-স্ত্রীর রুচি তথা মানসিক কাঠামোর ভিন্নতা তাদের সম্পর্ককে এক ভাবে প্রভাবিত করেছে। আর এই গল্পে মানসিকতা ও রুচিগত সমতা দুজন দম্পতির জীবনকে আর একভাবে পরিচালনা করেছে।

এই গল্পের কাহিনী একজন কথকের গল্প বলার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, গল্পের নায়ক-নায়িকা মৃগাঙ্ক ও অদিতি কল্পনার জগতে উভয়ের শিল্পভাবনা এবং সৌন্দর্যানুভূতির মাধ্যমে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে অঙ্কন করেছে। সেই অঙ্কিত জীবনকে লাভ করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। এই পরিস্থিতিতে ধর্মগত ও সংস্কারের পার্থক্যের কারণে উভয়ের পরিবার তাদের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দুজন নর-নারীই তখন ভাবের রাজ্যে বিচরণ করছে। সেই জগতে অন্যান্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, বা বলা যায়, পরিবারের সদস্যদের অস্তিত্ব সেখানে বিলুপ্ত। কাজেই খুব সহজে তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে পরিত্যাগ করে ঘর বাঁধে। নব উচ্ছ্বাস ও উদ্যমে পরস্পর তাদের স্বপ্নের ঘর-সংসারকে সাজাতে থাকে। অদিতি আসার সময় বাবার বাড়ি থেকে যে টাকা এনেছিল তা দিয়ে মৃগাঙ্ক উচ্চদরের ফ্ল্যাট নেয়, নিত্য নতুন দামী দামী আসবাব ও ফার্নিচারে ঘর পূর্ণ করে তোলে এবং দেশী-বিদেশী আর্টিষ্টদের ছবির ভালো ভালো প্রিন্ট কিনে বাঁধিয়ে রাখে। আসলে তারা যেন ব্যক্তির অভাব বস্তুর মাধ্যমে মেটাতে চায়। এই কার্য-কারণের মধ্যে ফুটে উঠেছিল তাদের মনের সৌন্দর্যায়নের প্রতিবিম্ব।

তারা তাদের শিল্পভাবনাকে জীবনের চলমানতায় পরিবেশিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি, রক্ত-মাংসে গড়া মানব জীবন বেশীদিন কল্পনার ঘোরে থাকতে পারে না বা থাকা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতেই নেমে আসতে হয়। আর তখনই ঘটে মনান্তর, আসে জটিলতা। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রায়োজন; কথকের বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, মৃগাঙ্ক খুব বড় মাপের শিল্পী নয়, তার দক্ষতা অতি সাধারণ কিন্তু তার অহংবোধ অনেক বেশী। তাই সে যে কোন রকম চাকরি গ্রহণে অনিচ্ছুক। অদিতি উচ্চশিক্ষিত, সুন্দরী ও শিল্পী। তার স্বামী সামান্য কোন চাকরি করবে এই বিষয়টি তারও আত্মসম্মানে বাঁধে। ফলে উভয়ের দ্বিধা ও সম্মান হারানোর সংশয় তাদের আর্থিক সমস্যাকে ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় পরস্পরের বিভিন্ন চাহিদা। এক্ষেত্রে আর একটি দিক সম্পর্কে জানা যায় যে, নানা রং এর স্পর্শে অদিতির জীবনকে পূর্ণতা দানে মৃগাঙ্ক বিশ্বাসী। তাই সে বলে – "রং ছাড়া আমার ওকে কিছুই দেওয়ার নেই। সুর ছাড়া আমি ওর কাছে কিছু চাইনে।"[২০৫] কিন্তু অদিতির নীরবতা জানান দেয় – "মৃগাঙ্ক ভুল করেছে। অদিতির আরো কিছু চাইবার ছিল, অদিতির আরো কিছু চাইবার আছে।"[২০৬] এই চাওয়া-পাওয়ার খামতি অদিতির মনোলোককে যে প্রভাবিত করবে, এটাই স্বাভাবিক।

দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থ সংকট তাদের জীবনে প্রধান সমস্যা হয়ে ওঠে। যাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের প্রতি মোহ ভাঙে। এবং একটা সময় দুটি মন-ই উপলব্ধি করতে পারে যে, কেউ তারা পরস্পরের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে নি। এই বোধ দু'জনকেই আহত করে। আর এই ভাবনা থেকেই তখন যেন হারানো পরিবার-পরিজনদের অভাবটা তাদের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই মৃগাঙ্কের মুখে শোনা যায় আক্ষেপের সুর – "সুব্রত এত রান্না খেলাম, কিন্তু জেঠিমা ডাঁটা আর কাঁঠালের আঁটি দিয়ে যে নিরামিষ তরকারি রাঁধতেন তার স্বাদ কোথাও পেলাম না। তা যেন আমার মুখে আজও লেগে আছে।"[২০৭] শুধুমাত্র জেঠিমার রান্নার কথা-ই নয়, ধীরে ধীরে পরিবারের সকলের কথা-ই প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসতে থাকে। একান্নবর্তী পরিবারে লালিত মৃগাঙ্ক বর্তমানে কবুতর-কবুতরীর মত স্বামী-স্ত্রীর সংসারে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে ওঠে। আর এই ক্লান্তিবোধ ধীরে ধীরে তার যে চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটায় তা স্ত্রী অদিতির চোখেও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এখান থেকেই দুটি মানুষের মানসিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার প্রভাব পড়ে তাদের সম্পর্কের উপর।

এই অবস্থায় দুটি 'মন' যত পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল তত তারা নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। এই নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ববোধ তাদেরকে নিজ নিজ সম্পর্কে ভাবতে

সাহায্য করে। ফলে তারা দুজনেই নিজেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মৃগাঙ্ক উপলব্ধি করে সে শিল্পী। তার শিল্পসত্তাকে বিকশিত করে আরও বড় মাপের আর্টিষ্ট হতে হবে। আর তার জন্য সে সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারে, এমনকি নিজের স্ত্রীকেও। অপরদিকে অদিতির মনোভাবও প্রকাশিত হয় – "তাকে সত্যিকারের গায়িকা হতেই হবে। সেই সাধনার পথে যে কোন কৃচ্ছসাধন, যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তাকে।....মৃগাঙ্কর ভালোবাসায় তার সবখানি মিটবে না। মিটত যদি সে শুধু ঘরণী হয়ে থাকতে পারত। মিটত যদি সে শুধু মৃগাঙ্কর স্টুডিওর মডেল হয়ে থাকতে চাইত। কিন্তু তাতো নয়, সে শুধু একজনের সৃষ্টির উপাদান কি একজনের সৃষ্টির প্রেরণা হয়েই থাকতে চায় না, সে নিজেও স্রষ্টা হতে চায়। সে শুধু একজন তরুণ আর্টিষ্টের স্ত্রী নয়, সে নিজেও আর্টিষ্ট।"[২০৮] বছর খানেকের দাম্পত্য জীবনে তারা উভয়েই উপলব্ধি করে – স্ত্রী-পুরুষের প্রেম জীবনের সবখানি নয়, তাতে সব বাসনা সব কামনার নিবৃত্তি হয় না। জীবনের এই পরিস্থিতিতে ও ভাবনায় উপস্থিত হয়ে দুটি চরিত্রই তাদের শিল্পসত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে তৎপর হয়। আর তখনই দুটি সত্তা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ায় প্রতিযোগিতার। দুজনেই দুজনকে ছাপিয়ে যেতে চায়। আর এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব থেকে তাদের দাম্পত্য জীবনে দ্বিতীয় পর্যায়ের জটিলতার সূত্রপাত ঘটে। দুটি মন-ই অবনমনের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হতে থাকে। যার ফলস্বরূপ তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ক্রমশ সংক্রমিত হয়ে স্বাভাবিকতা হারায়। এই পরিস্থিতিতে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি কথকের বর্ণনার মাধ্যমে উঠে আসে এইভাবে – "মৃগাঙ্কর জুতোয় আর জামায় যতখানি তালি পড়তে লাগল, অদিতির ছেঁড়া শাড়িতে গিঁটের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল তাদের দাম্পত্য গ্রন্থি ভিতরে ভিতরে তত শিথিল হতে লাগল।"[২০৯] শিল্পীর সঙ্গে শিল্পী যখন একটি সম্পর্কের যাঁতাকলে আঁটকে পড়ে বা বলা যায়, সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয় তখন তা কখনই শিল্পসম্মত হয় না। জীবনের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভুল প্রমাণিত হয় এবং পরস্পরের বিকাশের পথে উভয়েই প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে – এই বিষয়টি মৃগাঙ্ক অনুভব করে। তাই তার কন্ঠে অনুশোচনার সুর শোনা যায় – "ভুল করেছি সুব্রত। আর্টিস্টের অন্তত যে আর্টিস্টকে বিয়ে করতে নেই। তার ফল ভালো হয় না।"[২১০] সেই ফলের অশুভ প্রভাবে একটা সময় দেখা যায়, তাদের সম্পর্কের গ্রন্থি একেবারেই শিথিল হয়ে পড়ে। যে ভাবনা নিয়ে তারা সংসার জীবন শুরু করেছিল এই পর্যায়ে এসে তার গোত্রান্তর ঘটে। ফলস্বরূপ পরস্পরের প্রতি পরস্পর শ্রদ্ধা হারায়। উভয়ে সত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে উভয়কে প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচনা করে। ফলে কেউ কারও শিল্পসত্তা ও সৃষ্টির মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি

করবার চেষ্টা করে না। তাই অদিতি যখন সুর সাধনায় বসে তখন মৃগাঙ্কর কাছে তা চিৎকারের সামিল। অপরদিকে মৃগাঙ্কর শিল্পসাধনা অদিতির কাছে বিলাসিতা স্বরূপ। এই পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রী নয়, দুই শিল্পী তথা প্রতিযোগীর সম লড়াইয়ের ক্রিয়াকলাপই বড় হয়ে ওঠে। এই লড়াই চরমে গিয়ে পৌঁছোয় যেদিন মৃগাঙ্ক অদিতির সঙ্গীতের ওস্তাদকে একটি বিষয় নিয়ে অপমান করে। সে ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ কারও কাছে ভুল স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয় বরং বিপরীত প্রতিক্রিয়াই উভয়ে ব্যক্ত করে। ফলে তাদের সম্পর্কের ক্ষয়িষ্ণু ও কঙ্কালসার রূপ পরস্পরের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। তারা উপলব্ধি করে একসঙ্গে থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। আসলে এই স্তরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বাঁধনে গুরুত্ব তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন হয়। শুধুমাত্র আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া তারা আর কিছুই প্রাধান্য দিতে চায় না। কাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ তাদের কাছে সহজ সমাধান হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই এটিকে গ্রহণ করে।

তবে জীবনের গতি-প্রকৃতি অন্য নিয়মে বাঁধা। আত্ম-প্রতিষ্ঠার মত্ততা অদিতির চারিত্রিক অবনমন ঘটায়। যার ফলস্বরূপ সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তবে এই সন্তানের পিতা তার স্বীকৃতি দেয় না। অপরদিকে মৃগাঙ্ক বাড়ির ঝি এডিথকে বিবাহ করে। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় সে পিতৃত্ব লাভ করে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে হারায়। এই পর্যায়ে এসে তখন দুটি মানুষই জীবনে ব্যর্থ। দুজনেই নিঃসঙ্গ ও জীবন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধিতে প্রতিস্থাপিত। উভয়ের ঘোর কাটে। এককেন্দ্রিক জীবনে দুজনেই পুনরায় ক্লান্ত ও বিগত জীবনের ক্রিয়াকর্মে অনুতপ্ত। কাহিনীতে পাওয়া যায়, নিঃসঙ্গতা ও ব্যর্থতা বোধ দু'জনকে আবার কাছে আনতে সহায়তা করে। দুজনেই তাদের হারানো সম্পর্ককে ফিরে পেতে চায় কিন্তু তা স্বীকার করতে সংকোচবোধ করে। তারা যে পরস্পরকে এখনো ভালোবাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি বিষয়ের মাধ্যমে। তা হল দু'জনেই যখন জানতে পারে তারা ভিন্ন ভিন্ন নারী এবং পুরুষের সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভ করেছে তখন উভয়েই ঈর্ষান্বিত হয়। তাই মৃগাঙ্ক যখন তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কবরে ফুল দেয় তখন অদিতি তার হারানো সম্পদের অনুশোচনায় আলোড়িত হয়। কাজেই তার মুখে শোনা যায় আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি – "ও অনেক ভাগ্যবতী। ওর বদলে আমি যদি এখানে থাকতাম। এমনি করে আমি যদি ফুল পেতাম কারো হাতের"[২১১] কবরের উপর দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে অদিতির। এই অশ্রু তার অন্তরের গভীর অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত। তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই, আছে গভীর আবেগ, যা সম্পর্কের অস্তিত্ব রক্ষার মূলধন। এই অনুভূতি মৃগাঙ্ককেও স্পর্শ

করে। তার মনে হয় – "কালো সমুদ্রে একটি বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল বুদ্‌বুদ"[২১২] তাই সে নিজের হাতে অদিতির খোঁপায় ফুল গেঁথে দেয়। এই স্তরের অনুভূতি চিরন্তন ও শাশ্বত। যাতে দুটি মন সিক্ত হয়ে পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহলে আমরা দেখলাম, একটি সম্পর্ক যে ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছিল তা নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে একটি অবস্থায় এসে স্থিত হয়। এই যে দুটি সত্তা এবার সম্পর্কে আবিষ্ট হল, তা কোন শিল্পী সত্তা নয়, রক্ত-মাংসে গড়া দুটি সাধারণ মানবিক সত্তা। যেখানে পরস্পরের প্রতি মানবিক অনুভূতিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কত ভিন্ন ভিন্ন দিকে বাঁক নেয়, তার আর একটি চিত্র নির্মাণ করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র **'চিহ্ন'** নামক গল্পে। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় এই গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পের কথক চরিত্রের জীবনাভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে একটি দাম্পত্য জীবন এখানে উন্মোচিত হয়েছে। দেখা যায় অর্থসংকটের তাড়নায় এই দু'জন দম্পতি বাহ্যিক ক্ষেত্রে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তথা পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তারই প্রভাবে তাদের সম্পর্কের ধারা মাঝে মধ্যে আন্দোলিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হয়ে চলেছে।

গল্পটিতে যতীন ও কমলা দু'জন স্বামী-স্ত্রী। অর্থগত দিক দিয়ে তাদের সামাজিক অবস্থান হল – নিম্নমধ্যবিত্ত। আমরা দেখি – পুরীর সমুদ্র সৈকতে তারা হোটেল পরিচালনার ব্যবসায় নিযুক্ত। ঘটনাক্রমে সেখানে যতীনের এক পুরনো বন্ধুর আগমন ঘটে। ধীরে ধীরে সে পরিবারের সকলের অর্থাৎ যতীন, যতীনের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। তবে বিশেষত, স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর এই ঘনিষ্ঠতা স্বামী যতীন ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। সে বিষয়টি সন্দেহের চোখেই দেখেছে। তবে কমলা ও তার স্বামীর বন্ধুর মধ্যে এক স্বাভাবিক সৌজন্যের সর্ম্পকই বর্তমান ছিল। সহজ বন্ধুকে যতীন মনে মনে ভুল ব্যখ্যা করে। ফলে সে ক্রমশ বন্ধুকে সেখান থেকে চলে যাবার তাগিদ দেয়। দেখা যায়, বন্ধু যাবার সময় যে এক'শ টাকার নোট দেয় তা জাল বলে প্রমাণিত হয়। তখন বাধ্য হয়ে সে তার হাতের ঘড়িটি দেওয়ার সময় এটিকে 'স্মৃতিচিহ্ন' হিসাবে উল্লেখ করে। আর এই বিষয়টিই স্বামীর সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করে। তাই আমরা গল্পের শুরুতে ঘড়ির প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পাই। আবার আমরা এক জায়গায় দেখি – স্ত্রী এই ঘড়িটিকে ফেরৎ দেবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করলে তার প্রতিক্রিয়ায় যতীন জানায় –"ঘড়ির জন্য ভেবো না। তার যা ব্যবসা তাতে এমন নিত্য নতুন ঘড়ি

তার হাতে আসে। আর কেবল কি ঘড়ি! দেখি কিছুদিন, তারপর এটা বিক্রি করে তোমাকে একটা লেডিস ওয়াচ কিনে দেব। এটা তো তোমার আর হাতে বাঁধবার জো নেই।"[২১৩] এর প্রত্যুত্তরে কমলা বলে –"আমি বাঁধতে চাইও নে।"[২১৪] অর্থাৎ স্বামীর এই ভ্রান্ত ধারণায় কমলা আত্মদগ্ধ ক্লিষ্ট হয়। সে একান্তভাবে চায় এই ভুল ধারণার অবসান হোক। তাই কমলা আর্দ্র কণ্ঠে গল্পের কথককে মিনতি জানায় –"সত্যবাবুর সম্বন্ধে আমার স্বামী যা শুনেছেন তা কতখানি সত্য আমি জানি নে, কিন্তু আপনার সঙ্গে তাঁর যদি কোনরকমে কোনওদিন পরিচয় হয়ে যায় তাঁকে বলবেন, টাকা কটা ফেলে দিয়ে তিনি যেন ঘড়িটা নিয়ে যান; তিনি যেন আমার মুখ রাখেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁকে কাকা বলে ডেকেছিল, তিনি যেন সেই ডাকের মান রাখেন।"[২১৫] এ আসলে বেদনাগ্রস্ত হৃদয়ের করুণ আর্তি, যেখানে দুটি মনের মাঝে একটি অবিশ্বাসের দেওয়াল দণ্ডায়মান। স্ত্রী চরিত্র সে দেওয়ালকে ভেঙে ফেলতে বার বার অক্ষম হয়। বিকল্পে স্বামীর মানসিকতার সঙ্গে অভিযোজন করতে গেলে তার আত্মসম্মানও আহত হয়। ফলে এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তার মনোজগৎ আলোড়িত হতে থাকে। অপরদিকে স্বামী তার ভাবনায় স্থির। কজেই এই দু'জনের ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার প্রভাব তাদের স্বাভাবিক সম্পর্ককে ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাবে দোলায়িত করতে থাকে।

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র **'কন্যা'** গল্পের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের এক ভিন্ন স্বাদের কাহিনী রচনা করেছেন। গল্পটি **১৩৬১** বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে দুটি দাম্পত্য জীবনকে পাওয়া যায়। একদিকে আছে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, অপরদিকে দুজন দম্পতির মধ্যেকার সম্পর্কের টানাপোড়েন পরোক্ষভাবে তথা প্রচ্ছন্নভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য এই দ্বিতীয় সম্পর্কের রূপরেখাকে উপলব্ধি করা।

এই গল্পে সম্পর্কের গঠনতত্ত্ব তথা সম্পর্কতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকেরই বিশ্লেষণে যাব। লেখকের কলমে উঠে এসেছে –"সত্যিকারের আত্মীয়তা মানুষের রক্তের মধ্যে নয়, আসল সম্পর্ক মানুষের ভাবের মধ্যে, অনুভবের মধ্যে!"[২১৬] তাই বোধ হয়, মানুষ নতুন নতুন ভাবাবেগ ও অনুভবের মাধ্যমে নব নব সম্পর্কের গন্ডিতে পদার্পণ করে থাকে। আলোচ্য গল্পে দুটি দাম্পত্য সম্পর্কের কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভবেশ দত্ত। উনিশ বছর আগে তার প্রথম বিবাহ হয় নলিনী দেবীর সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে ঘটনাক্রমে ও সময়ের ব্যবধানে ভবেশ দত্ত দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং বর্তমান জীবনে যে তিনি অত্যন্ত সুখী একজন মানুষ তার আভাস

আমরা গল্পে পেয়ে থাকি। উদাহরণ হিসাবে ভবেশ দত্তের মনোভাবকে তুলে ধরা যেতে পারে – "বাড়ি, গাড়ি, যশ, অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী, স্বাস্থ্যবান সন্তান সবই পেয়েছে ভবেশ। নিজের ক্ষমতায় অর্জন করেছে। জীবনে কোথাও কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, অতৃপ্তি নেই, আশ্চর্য তবু সারারাত ঘুম এলো না ভবেশের।"[২১৭] তার জীবিকা অর্থ, যশ বৃদ্ধি করে তাকে সমাজগত দিক থেকে উচ্চবিত্তের গণ্ডীতে নিবদ্ধ করেছে যেমন ঠিক তেমনি তার মানসিকতায়ও আছে সেই উচ্চবিত্তের জীবনের ছাপ। সেখানে ক্রমশ অর্থ বৃদ্ধিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই ব্যস্ততায় অতীত জীবন সেখানে বিস্মৃত। ভবেশ দত্তের মধ্যে অর্থ বিষয়ে এই মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় গল্পের শুরুতে যেখানে তার এক শিক্ষকের পাঠানো রুগীকে বিনামূল্যে বা অর্ধমূল্যে দেখবার বিষয়ে ভবেশ দত্তের মনের বিরূপতা ধরা পড়েছে। লক্ষণীয় বিষয়, এরকম মানসিক পর্যায়ে ভবেশ দত্তের চেম্বারে তার প্রথম স্ত্রী নলিনী দেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯ বছর পর এই দেখা হওয়ার মধ্য দিয়ে স্মৃতিরেখা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে ভবেশ দত্তের মনোলোকে। এবং তার স্মৃতিচারণের মাধ্যমেই তাদের প্রথম দাম্পত্য জীবন-রূপ উন্মোচিত হয় পাঠকবর্গের সম্মুখে। সেখানে দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় ভবেশ দত্ত বিবাহ করতে অসম্মতি জানালেও নলিনী দেবীকে দেখার পর তার মনোভাব বদলায়। তিনি ভালোবেসেই নলিনীকে বিবাহ করেন এবং ফুলশয্যার রাত্রে জানতে পারেন তার স্ত্রী দু'ই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। যদিও নলিনী স্বামীর কাছে স্বীকার করেছিল এই বিষয়ে তার কোন দোষ নেই। সে করুণ সুরে জানিয়েছিল –"আমি তো তাকে ভালোবাসিনি, সে জোর করে.....।"[২১৮] কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও বিষয়টি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ভবেশ দত্তও মেনে নিতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই ঐ বয়সে যেখানে তার জীবনাভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বল্প সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিকভাবে তিনি বিষয়টি গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তাঁর সামাজিক পদমর্যাদাও প্রধান অন্ত রায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি নিজ তাগিদে এবং পরিবারের আগ্রহে তথা সাহায্যে প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অপরদিকে যে সময়কালকে গল্পে ধরা হয়েছে সেই যুগে দাঁড়িয়ে নলিনীদেবী সুপ্ত ভ্রূণটিকে হত্যা করে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। সে তার প্রথম মাতৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই সঙ্গে ভবেশ দত্তকেই স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছে। এবং সমস্ত জীবন স্বামীর স্মারকচিহ্নকে সে বহন করে চলেছে। তার প্রমাণ আমরা পাই নলিনীদেবী যখন ১৯ বছর পর স্বামীর সম্মুখীন হয় তখন তার যে বেশ-বাসের বর্ণনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় –'তার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখাটি বেশ পুরু ও স্পষ্ট' কেবল এই সংস্কার নয়,

নলিনী স্বামীকে ভালোবেসেছিল। তাই তার পরিবারের লোকেরা যখন ভবেশের উপর গুণীনের চেষ্টায় চায়ের সঙ্গে একটা শিকড় বাটা খাইয়ে দেয় তখন নলিনী লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে স্বামীর কাছে চিঠি লেখে। এছাড়া তার অন্তরের গোপন কথাটি নানাভাবে প্রকাশিত হয়, যেমন – নলিনী স্বামীকে দেখবার উদ্দেশ্যেই যে একদিন এক ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এনে, হাসপাতালের আউটডোরে আই ডিপার্টমেন্টের সামনে এসে তাকিয়ে ছিল। তা ভবেশ দত্তও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আসলে ভবেশ দত্তের সঙ্গে নলিনীর শারীরিক বিচ্ছেদ ঘটলেও মানসিক বিচ্ছেদ ঘটেনি। খুব সহজে একটি 'মন' থেকে আর একটি 'মন'কে পৃথক করা সম্ভব নয়। বাইরে থেকে মনে হতে পারে পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সূক্ষ্ম টানাপোড়েন থেকেই যায়। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, স্বামীর প্রতি নলিনীর গভীর আবেগ-অনুরাগ থাকলেও তা প্রকাশের কোন উপায় ছিল না। স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে দাদা-বৌদির সংসারে যখন তার স্থান হয়নি তখন কঠিন সংগ্রাম করে সে তার কন্যাকে মানুষ করে তুলেছে। অথচ সে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হলেও, প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে কোনরকম সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করবার কোন মানসিকতাই তার ছিল না। তাই দেখা যায়, এত বছর পর সে যখন নিজে থেকেই প্রাক্তন স্বামীর কাছে এসেছে তখন ভবেশ দত্তর মনে হয়, হয়তো অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে তার এই আগমন। কিন্তু দেখা যায় নলিনী কঠোর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জানায় – চোখ দেখাতে বা অর্থভিক্ষার জন্য সে এখানে আসে নি। আবার পরক্ষণেই নতমস্তকে আবেদন জানায় তার কন্যা গীতার বিবাহ ঠিক হয়েছে তাই ভবেশ দত্ত যদি অনুমতি দেয় তাহলে তার নামে কার্ড ছাপায়। নলিনী যে তার কন্যাটিকে ভবেশ দত্তর কন্যা বলে পরিচয় রেখেছে তা অবশ্য ভবেশ দত্ত জানত না। তবে নলিনীর এই আবেদনে ভবেশ কিছুতেই মত দেয় নি। এই কন্যার পিতৃত্ব যদি মানত তাহলে উনিশ বছর আগেই তার স্বীকৃতি দিত।

তবে, প্রথমাবস্থায় নলিনীর এই আবেদন ভবেশ দত্ত খারিজ করে দিলেও বহু দিন বাদে সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রথম স্ত্রীর এই উপস্থিতি স্বামীর মনের ভাবান্তর ঘটায়। কেননা, তিনি এতদিন উপলব্ধি করতে পারেননি – তার প্রতি নলিনীর একনিষ্ঠতা ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসার গভীর অনুভূতিকে। আর তাই হয়তো এই ঘটনার পর তার ক্ষোভ, দুঃখ, অতৃপ্তিহীন জীবনে চেষ্টা করেও সারারাত ঘুম আসে নি। প্রথম স্ত্রীর প্রতি একরকম সহানুভূতি বলা যায়। আসলে এক অদৃশ্য আত্মিক টান থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে নিজে গিয়ে কিছু পরিমাণ অর্থ তাকে প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে অর্থ দান উপলক্ষ মাত্র, আসলে নলিনীর পুনর্দর্শনই এখানে মুখ্য। এর পরবর্তী

ঘটনায় লেখক তাঁর সৃজন কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে গীতার সঙ্গেই ভবেশ দত্তের সাক্ষাৎ করান, তার ফলশ্রুতিতে গীতার 'বাবা' সম্বোধনের মাধ্যমে ভবেশ দত্তের পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটে এবং তার হৃদয়-জগতে বাৎসল্য রসের স্ফূরণ ঘটে। যার কাছে তার সামাজিক মানসম্মান, মর্যাদা তুচ্ছ হয়ে ওঠে। মনের এই ভাবাবেগ থেকেই ভবেশ দত্ত গীতার পিতা হিসাবে সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবার যখন সংকল্প নেয় তখন নলিনীর আগমন ঘটে। এবং তিনি জানতে পারেন নলিনী তার জীবন সত্যকে গীতার ভাবী স্বামীর কাছে উন্মোচিত করে এসেছে। এই বিষয়টিই তখন ভবেশ দত্তকে অনেক বেশি আঘাত করে। তার মনে হয় আর কোনদিন গীতা তাকে হয়তো আগের মত 'বাবা' বলে সম্বোধন করবে না। এই আক্ষেপ ও অব্যক্ত যন্ত্রণা শুধুমাত্র ভবেশ দত্তের মনেই পুঞ্জীভূত হয়ে রইল না তা যেন পাঠকবর্গের হৃদয়েও সঞ্চারিত হল। ভবেশ-নলিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দাম্পত্য সম্পর্ক নেই ঠিকই কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে তা যেন অন্য মাত্রা লাভ করল। আবার অন্যভাবে বলা যায়, একদিন একটি ভ্রূণকে কেন্দ্র করে দু'জন মানব-মানবীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল উনিশ বছর পর সেই ভ্রূণের তথা কন্যাসন্তানের মধ্যস্থতায় পরস্পরের প্রতি ভাবাবেগ গভীরতা লাভ করে ও তা প্রকাশ্যে আসে।

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' পূজা সংখ্যায় **'ছাত্রী'** গল্পটি প্রকাশিত হয়। মানব-মানবীর পাস্পরিক সম্পর্ক কত বিচিত্র হতে পারে তারই একটি উদাহরণ এই গল্পটি। গল্পের নাম 'ছাত্রী' হলেও এখানে আছে একটি দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আর একটি দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন। ফলে তাতে একদিকে যেমন দুটি জীবনের মধ্যে টানাপোড়েন সংঘটিত হয়েছে তেমন নব স্থাপিত সম্পর্কের স্বরূপ তথা প্রকৃতিও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পাঠককুলের সম্মুখে। যেখানে দেখা যায়, দুটি মানুষই তাদের হৃদয়-যন্ত্রণাকে গোপন করে সম্পর্কের বহমানতাকে বজায় রাখবার চেষ্টা করে চলেছে। আলোচ্য গল্পে এই নব-গঠিত দাম্পত্য সম্পর্কের বৈচিত্র্যের রূপ দেখানোই আমাদের মূল লক্ষ।

গল্পে পাওয়া যায়, দুটি দাম্পত্য জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন একজন পুরুষ - সতীকান্ত ঘোষাল। তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল। মীরা তার ছাত্রী। তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে মীরা যখন তার শিক্ষাগুরুর জীবনে প্রবেশ করে তখন সতীকান্তের দাম্পত্য জীবন মধ্যপর্যায়ে অবস্থান করছে। কারণ তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশের উপরে। তবে এই পর্যায়ে দেখা যায় তিনি একটি মহাবিদ্যালয়ের প্রধান হলেও বিদ্যার তুলনায় অর্থের প্রতি তাঁর ঝোঁক অনেক বেশি। আর তা

নিয়ে নানা রকম নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় যে সমাজে প্রচলিত ছিল তা আমরা গল্পে পেয়ে থাকি। এই বিষয়টি সতীকান্তের স্ত্রী হিরণপ্রভারও চিন্তার কারণ ছিল। কেননা, তিনি চেয়েছিলেন তার স্বামীর অর্থখ্যাতির পাশাপাশি বিদ্যাখ্যাতিরও স্ফূরণ ঘটুক। তার প্রতিভার বিকাশ সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছোক। এমত পরিস্থিতিতে মীরার উপস্থিতি সতীকান্তের গতানুগতিক জীবনধারার ও তার ভাবনার রূপান্তর ঘটায়। মীরার বিদ্যার প্রতি একনিষ্ঠতাই সতীকান্তকে পুনরায় বিদ্যানুরাগী করে তোলে। এই সুযোগকে হিরণপ্রভা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন মীরার দ্বারাই তার স্বামীর যশ-খ্যাতি পুনরায় স্থাপিত হতে পারে। তাই তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে মীরাকে প্রতিদিন তার গৃহে আসার আহ্বান জানান এবং ধীরে ধীরে সতীকান্তের লাইব্রেরী ব্যবহারের ও গুরুর সাহচর্য গ্রহণের সুযোগ করে দেন। কিন্তু একটা সময় দেখা যায়, সতীকান্ত বিষয় ভাবনা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র বিদ্যাভাবনায় নিমগ্ন। এবং পরবর্তী সময়ে সেই ভাবনা শুধুমাত্র মীরা-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এই উপলব্ধি হিরণপ্রভার অন্তর্লোককে আলোড়িত করে। ফলে মীরার সঙ্গে তার অসম লড়াই চলতে থাকে। সতীকান্ত ও হিরণপ্রভার দাম্পত্য জীবন ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করতে থাকে এবং হিরণপ্রভার সঙ্গে মীরার মানসিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন তিনি সরাসরি মীরাকে তার স্বামীর কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলেন। প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় উল্লেখ্য – সতীকান্তের কলেজে মীরার চাকরি হয় তারই সুপারিশে। শুধু তাই নয়, মীরার ভাই -এর একটি চাকরি হয় সতীকান্তেরই চেষ্টাতে। পরিবার যত তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চায় ভিতর থেকে তত তিনি অসহায় ও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পরিবারের সকলের সঙ্গে তার সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। আর সেই ভগ্নপ্রায় সম্পর্কের চরম রূপ প্রকাশিত হয়ে যায় যখন 'গভর্নিং বডি' কলেজ থেকে মীরাকে অপসারিত করে তখন সতীকান্তও পদত্যাগ পত্র দিয়ে মীরাকে নিয়ে পালিয়ে চলে যান। এখান থেকেই সতীকান্তের প্রথম দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনকে পর্যালোচনা করবার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের জানতে হয়; তা হল – মীরার মনের মধ্যে সতীকান্তের জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ছিল। এই বোধ ভালোবাসা বা অনুরাগের অনুভূতি থেকে পৃথক। ভালোবাসা বা প্রেমানুভূতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে অধিকার বোধ। কিন্তু তা মীরার মধ্যে কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ মীরা সতীকান্তকে তার পরিবার থেকে ছিনিয়ে আনেনি। সতীকান্ত স্বেচ্ছায় মীরার কাছে যান। আসলে একদিকে পারিবারিক উৎপীড়ন অপরদিকে যৌবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এই দ্বৈত সত্তার

টানাপোড়েনে সতীকান্ত বিচলিত ও বিভ্রান্ত, যা তাকে শেষ পর্যন্ত মীরার কাছে টেনে আনে। তিনি উপলব্ধি করেন – মীরাই এই সমস্যা থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে। তার মনের ভাব মীরার স্বীকারোক্তিতেই ধরা পড়ে – "তিনি বললেন – মীরা, আমাকে মুক্তি দাও। আমি বুঝতে পারলাম এ-শুধু পরিবারের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নয়, কামনার পীড়ন থেকেও মুক্তি। একে মুক্তি দিতে হলে আগে বাঁধতে হবে।"[২১৯] মীরা তথা তারুণ্যের প্রতি সতীকান্তের প্রবল আকর্ষণ ছিল এবং তা তিনি মীরার কাছে গোপন রাখবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সতীকান্ত যেদিন তার কাছে মনের কামনা-বাসনাকে ব্যক্ত করেন তখন মীরার প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে এইভাবে – "প্রথমে একটা তীব্র ঘৃণা হল আমার, তারপর এক গভীর মায়ায় আমার সমস্ত মন ভরে গেল। ভাবলাম এই আর্তকে আমার আশ্রয় দিতে হবে। যে বটগাছ ভেঙ্গে পড়ল, তাকে আমার তুলে ধরা চাই। আজ আমার দক্ষিণা দেওয়ার দিন এসেছে।"[২২০] লক্ষণীয় কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ – 'মায়ায়', 'আর্তকে', 'আশ্রয়', 'দক্ষিণা' -এর মধ্য দিয়ে সতীকান্তের প্রতি মীরার মনের গভীর সহানুভূতি, করুণা ও কৃতজ্ঞতার দিকটিই ধরা পড়ে, যা তাকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সক্রিয় করে তোলে। অর্থাৎ প্রেমানুভূতি বা অনুরাগ নয়, কর্তব্য বোধ-ই এখানে মুখ্য। তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় মীরার বক্তব্যে – "তুমি বলেছিলে পরিমল, আমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলাম না ? পাওয়ার অবসর পেলাম কই। প্রথম থেকেই এক প্রবল প্রচণ্ড ভালোবাসাকে ঠেকাতে ঠেকাতে।"[২২১] আসলে একজনের ভালোবাসাকে ঠেকাতে মীরা তার কাছে আত্মবিসর্জন দিয়েছে কৃতজ্ঞতার খাতিরে। তাই মীরা জানায় – "তুমি কি ভেবেছ শুধু দু'হাত দিয়েই ঠেকান যায়, আর কিছু দিয়ে ঠেকান যায় না ?"[২২২] এরকম মানসিকতায় যখন মীরা ও সতীকান্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আবদ্ধ হল তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ ব্যাহত হল। অপরদিকে সতীকান্তের মোহ ভাঙল। দেখা যায়, তিনি ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আসলে এই অসুখ তার মনের। কৃতকর্মের অনুশোচনারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই মীরার বন্ধু অর্থাৎ কথক যখন জানায় –"তরুণী ভার্যা তো মানুষকে আরও তরুণ করে তোলে।" এর উত্তরে মীরা বলে –"হয়ত ততখানি তারুণ্য আমার মধ্যে নেই, যাতে জরাকে জয় করা যায়।"[২২৩] তবে দু'জনেই তাদের সাধ্যমত পরস্পরকে দিয়েছে ও গ্রহণ করেছে এবং উভয়েই মনের প্রকৃতি পরস্পরের কাছে গোপন রাখবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। সতীকান্ত সরাসরি চিঠিপত্র না লিখলেও তার পরিবারের খোঁজখবর যে অন্যভাবে আনেন তা মীরা জানে। কিন্তু সে বিচলিত হয়নি। তার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে। এই পরিণতি যে হবে তা যেন মীরা আগে

থেকেই জানত। আসলে মুহূর্তের আবেগে সতীকান্ত বাইরে থেকে একদিন সব ছেড়ে এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু ভিতর থেকে ছাড়তে প্রতিদিন তিনি যত চেষ্টা করেছেন তত আরও জড়িয়ে পড়েছেন। এই বিষয়টি মীরার মনে হিংসা ভাব আনলেও সেই হিংসার গভীরতা কম। কেননা, সতীকান্তের জীবনের প্রতি মীরার কখনো অধিকার বোধ জন্ম নেয়নি। তাছাড়া সতীকান্ত শুধু তাঁর হৃত পরিবারের কথাই নয়, মীরার সম্পর্কেও ভাবেন। কিন্তু সে ভাবনায় যে মীরার সাধ মেটে না তা তার জবানীতেই উঠে আসে –"ভাবনা নেই? ভাবেন আমাকে কতটুকু দিয়ে যেতে পারলেন। শুধু বিদ্যার সাধনায় কি মানুষের সব সাধ মেটে ? মেয়েদের সব সাধ মেটে ?"[২২৮] অসম বয়সী একজন প্রৌঢ় পুরুষের কাছ থেকে পূর্ণ যৌবনবতী একজন নারীর জীবনের সব দাবী যে মিটবে না এটাই স্বাভাবিক। তথাপি তারা উভয়ের মনের চাওয়া-পাওয়ার অতৃপ্তিকে গোপন করে দুজনের মনের অব্যক্ত দুঃখকে বহন করে অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

'সুহাসিনী তরল আলতা' নামক গল্পটি **১৩৬১** বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে গল্পকার দু'জন প্রাক্তন দম্পতির হৃদয়বৃত্তির টানাপোড়েনকে প্রস্ফুটিত করেছেন এক শিশি আলতার নামকরণের মাধ্যমে। অন্যভাবে বলা যায়, দু'জন দম্পতির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও পরস্পরের প্রতি তাদের আত্মিক আকর্ষণ বর্তমান ছিল। সেই অব্যক্ত অনুভূতি প্রকাশ্যে আসে ঐ বিশেষ নামের আলতা ব্যবহারকে কেন্দ্র করে।

গল্পে পাওয়া যায়, তথাকথিত এক সুন্দরী, অল্পবয়স্কা, উচ্চবর্ণা নারীর সঙ্গে ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বয়স্ক, কুৎসিত নিম্নবর্ণের এক পুরুষ দাম্পত্য বলয়ে আবদ্ধ হয়। এবং জানা যায় – তারা উভয়ের মতেই পালিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে চোদ্দ-পনের বছরের নারীটি যে বিশেষ আবেগে আপ্লুত হয়ে এই বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তা সহজে অনুমান করা যায়। দেখা যায়, বিবাহের পর নিজ গৃহেই তারা আলতা তৈরীর ব্যবসায় নিযুক্ত হয়। এবং ভালোবেসে স্বামী তার স্ত্রীর নামানুসারে আলতার নাম রাখে - 'সুহাসিনী তরল আলতা'। সাধারণত আমরা জানি, বিবাহ পরবর্তী পর্যায়ে দু'জন নর-নারী যখন পরস্পরকে ভালোবাসে তখন তারা সেই ভালোবাসাকে পরিণতি দিতে চায় বিবাহের মাধ্যমে। এটাই তাদের এই স্তরের প্রধান চাহিদা। এবং সেই পরিণতি পেলে হয়তো তার পরবর্তী পর্যায়ে নানারকম চাওয়া-পাওয়া তথা চাহিদাগুলি তাদের মনে যেমন জন্ম নেয় ঠিক তেমনি হয়তো বা না পাওয়ার খামতিও মনের কোণে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আর এই চাহিদাপূরণ করতে গিয়ে 'পূর্ববর্তী মনের' কাঠামোতে পরিবর্তন

আসে, যার প্রভাব পড়ে ব্যক্তি চরিত্রগুলির উপর।

রূপজ মোহ মানবজাতির নানা প্রবৃত্তির মধ্যে একটি বিশেষ প্রবৃত্তি। গল্পে দেখা যায়, দুটি বিপরীত রূপ ও বয়সের বিশেষ পার্থক্য সম্পন্ন মানব-মানবী দাম্পত্য সম্পর্কে আবৃত। কাজেই প্রাথমিক ভাবাবেগের বিলুপ্তির পর স্ত্রীর মনে স্বামীর রূপের খামতি ও বয়সের ছাপ ধরা পড়ে স্পষ্টভাবে। এবং তা আরও স্পষ্টতর হয় তাদের কর্মচারী পবনকে দেখার পর। কেননা, পবন একজন সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবক। তাই স্বাভাবিক ভাবেই নারীটির মনে তার স্বামীর সঙ্গে কর্মচারীর পার্থক্যের দিকটি ধরা পড়ে। এবং সে ধীরে ধীরে পবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমত পরিস্থিতিতে স্ত্রী অর্থাৎ সুহাসিনীর কাছে তার দাম্পত্য জীবনকে ও স্বামীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতিকে তুচ্ছ বলে মনে হয় এবং স্বামী অর্থাৎ ফটিককে বিবাহ করা তার জীবনের একটি ভুল বলে পরিগণিত হয়। অপরদিকে ফটিক তার স্ত্রীর মনোভাব উপলব্ধি করতে পারে। এবং একটা সময় সুহাসিনীর ব্যাভিচারকে সহ্য করতে না পেরে তার উপর অত্যাচারও করে। তার প্রমাণ পাই কথকের বন্ধুর কথার মধ্য দিয়ে –"বউটা হয়ত একেবারে পালিয়ে যেত না। কিন্তু শেষের দিকে ফটিক ওকে বড়ই জ্বালা যন্ত্রণা দিত। মারধোরও করত বলে শুনেছি। তাছাড়া ফটিকের গোড়া থেকেই দোষ ছিল। জাত ভাঁড়িয়ে ও কায়েতের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। সুহাসিনী নিজের মুখেই স্বীকার করেছে"[২২৫] অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে পবনের আবির্ভাবে সুহাসিনী ও ফটিকের দাম্পত্য জীবনে ক্রমশ জটিলতা বাড়তে থাকে। স্বামীর আচার আচরণ ও দুর্বলতার বৈপরীত্যে পবনের রূপ যৌবনের প্রতি সুহাসিনীর আকর্ষণ প্রবল হতে থাকে। যা তাকে শেষ পর্যন্ত পবনের সঙ্গেই পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে কথকের বন্ধুর আর একটি বক্তব্য উল্লেখ্য –"ভোলাবার যখন বয়স আসে তখন কিছু না দেখেও মেয়েরা ভোলে। তারপর ভুল ধরা পড়লে ফের ভুলতে ভোলাতে সাধ যায়।"[২২৬]

তবে মনের নানা অনুভূতি যেমন স্বাভাবিক নিয়মে বদলে বদলে যায়, ঠিক তেমনি রূপজ মোহও বেশিদিন মনে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। বিশেষ করে অভাবের সংসারে আরও না। সুহাসিনীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। সে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে তার হারানো অনুভূতির মাহাত্ম। অর্থাৎ তার প্রতি প্রাক্তন স্বামীর প্রেমানুভূতির সত্যতাকে সে অনুভব করতে পেরেছে। কিন্তু সে জানে এমত অবস্থায় চাইলেও সবকিছু আর আগের মত হওয়া সম্ভব নয়। তাই তার মনে থাকে অব্যক্ত কথার যন্ত্রণা ও আত্মানুশোচনার দ্বন্দ্ব। তাই হয়তো সুহাসিনী বাজারে চলা তারই নামের আলতা শুধু পরে, অন্য কোন আলতা নয়। এবং জানা যায় – পরবর্তী সময়ে পবন

আলতা ব্যবসা খুলতে চাইলে সুহাসিনী তাতে অসম্মতি জানায়। এক্ষেত্রে দুটো দিক থাকতে পারে, যথা – সুহাসিনী তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে আলতা তৈরীর কাজে নিযুক্ত থাকত। সেই স্মৃতিকে সে অক্ষুন্ন রাখতে চায়। দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে এই কাজে নিযুক্ত হলে তার মন আরও বেশি ব্যথিত হবে ফটিকের কথা মনে করে। দ্বিতীয়ত, সুহাসিনী একই আলতা তৈরী করে হয়তো সে ফটিকের ব্যবসার ক্ষতি করতে চায়নি। যাই হোক, অপরদিকে ফটিক দ্বিতীয় বিবাহ করেছে ঠিকই, তবে, সে তার প্রথম স্ত্রীকেই ভালোবাসে। তা সে মনে তার প্রতি যত বিদ্বেষই থাক না কেন। এমনকি, যতই সে নিজেকে সান্ত্বনা দিক না কেন যে তার দ্বিতীয় স্ত্রী কাজে-কর্মে সবদিক থেকে নিপুণা এবং সে খুব সুখী। আসলে তার মন সবসময় পড়ে থাকে তার প্রথম স্ত্রীর কাছে। সে তাকে কখনোই ভুলতে পারে নি। তাই তো তার মুখে শোনা যায় –"কাণ্ড দেখুন কর্তা। হারামজাদী সিঁদুরের সম্পর্ক মুছে ফেলে আলতার সম্পর্কটুকু বজায় রেখেছে।"[২২৭] অর্থাৎ সুহাসিনী যে পূর্বের মত ফটিককে ভালোবাসে এবং সেই জন্যই সে শুধুমাত্র ঐ আলতাই পরে এই গোপন কথাটি ফটিক উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই অনুভব তার চোখে জল আনে। তাই সে উক্ত কথা বলতে বলতে কপালের ঘাম মুছবার ছলে ভিজে চোখ দুটিও মুছে ফেলে। সুহাসিনীও হারিয়ে যাওয়া তার সম্পর্কটিকে যেন বেঁধে রাখতে চায় এই আলতা পরবার মধ্য দিয়ে। আসলে তাদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব হলেও মানসিক সম্পর্ক এখনো অটুট আছে তা সামান্য এক শিশি আলতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ দাম্পত্য সম্পর্ক না থাকলেও রয়ে গিয়েছে পরস্পরের প্রতি গভীর হৃদয়ানুভূতি।

'অঙ্গীকার' গল্প ১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে লেখক চরিত্রের আত্মকথন রীতিকে শৈলী হিসাবে ব্যবহার করেছেন, যার মধ্য দিয়ে দুটি নর-নারীর দাম্পত্য জীবন ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণের রূপরেখা একটি ক্রোনোলজিক্যাল পর্যায়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। গল্পের একটি পর্যায়ে দু'জন দম্পতির জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটলেও তা এখানে মুখ্য নয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, রূপ-গুণ ও সামাজিক শ্রেণীগত পার্থক্যই এখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গল্পে এই বিষয়গুলিকে লেখক অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করেছেন, যা দুটি মানুষের দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক চলমানতাকে ব্যাহত করেছে। কাহিনীতে দেখা যায়, পুরুষ চরিত্রটি উচ্চশিক্ষিত, সুদর্শন, উচ্চপদে কর্মরত অভিজাত পরিবারের একজন সন্তান। অপরদিকে নারী চরিত্রটি শিক্ষা, রূপ-গুণ, দক্ষতায় পুরুষটির তুলনায়

বহু নীচে অবস্থানকারী একটি সাধারণ মেয়ে, মধ্যবিত্ত সমাজ-কাঠামোয় যার জীবন লালিত হয়েছে। মধ্যবিত্তের আদব-কায়দা, আচার-আচরণ, সংস্কার-মানসিকতা তার রক্তে মিশে আছে। এরকম ভিন্ন গোত্রের দু'জন মানব-মানবীকে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করলে তার পরিণতি কি হয় আলোচ্য গল্পে তারই যেন একটি পরীক্ষা করেছেন লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এক্ষেত্রে মেয়েটি কি মানিয়ে নিতে পারে, না-কি পারে না। এই পারা, না-পারার ফলে নারীটির মনোজগৎ কতটা প্রভাবিত হয় এবং তার চরিত্র-প্রকৃতি কেমন করে পরিবর্তিত হয়ে যায়, অপরদিকে পুরুষ চরিত্রটির মানসিকতার বা কিরূপ বদল ঘটে – এরকম বিভিন্ন পরীক্ষার ও তার ফলাফলের নানা দিক গল্পটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখে নেব।

কাহিনীতে পাওয়া যায়, পুরুষ চরিত্র অর্থাৎ সুপ্রিয় এবং নারী চরিত্র নীলা উভয়ে পরস্পরকে ভালোবেসেই বিয়ে করে। তাতে সুপ্রিয়র পরিবারের সমর্থন না থাকলেও সে বিবাহের পর স্ত্রীকে নিজের বাড়িতেই নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়িতে এসে নীলা প্রাথমিকভাবে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হল – সামাজিক শ্রেণীগত পার্থক্যের সমস্যা। দেখা যায় – স্বামীর পরিবারের চাল-চলন, রীতি-নীতি, খাওয়া-দাওয়া ও নানা জিনিসের ব্যবহার সম্পর্কে স্ত্রী অজ্ঞ। আর এই বিষয়টি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মনে হাস্যরসের জোগান দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীর কাছে তা স্বাভাবিক ছিল। সে ভেবেছিল তার স্ত্রী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে থাকতে তাদের পারিবারিক রীতি-নীতিকে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু দেখা যায়, নীলার অদক্ষতা ও অসফলতা নিয়ে পরিবারের লোকেরা যত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকল তত তার মনে সংকোচবোধ পুঞ্জীভূত হতে থাকল। ফলে নীলা সেই সংকোচকে কাটিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে অসমর্থ হয়, যাকে কেন্দ্র করে সুপ্রিয় পরিবারের সকলের কাছে স্ত্রীর জন্য ছোট হতে থাকে। এই বিষয়টিতে সে অপমানিত বোধ করে। এই অপমান বোধই ধীরে ধীরে তার মনে ক্রোধের জন্ম দেয়, যা সে তার স্ত্রীর উপর প্রতিফলিত করে। আসলে সুপ্রিয় সাময়িক এক অনুভূতিতে মুগ্ধ হয়ে নীলাকে বিবাহ করে। কিন্তু সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয়ে তথা বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে তার মোহ ভাঙতে থাকে। হয়তো তার মনে হয় সে নীলাকে বিবাহ করে ভুল করেছে। নীলা শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, প্রবৃত্তি ও সামাজিক শ্রেণীগত সংস্কৃতির দিক থেকে তার বিপরীত ধারার মানুষ এই বিষয়টি ক্রমশ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ফলে স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে নীলা অনুমান করেছিল পরিবারের অন্যান্যরা যাই বলুক না কেন তার স্বামী অন্ততপক্ষে নীলার অক্ষমতাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবে। কিন্তু সে ভুল প্রমাণিত হলে মনে

মনে আহত হয়। আর এখান থেকেই এভাবে সামাজিক স্ট্যাটাসের পার্থক্য দুটো মনের দূরত্বকে বৃদ্ধি করতে থাকে।

এই বিষয়টি শুধুমাত্র মানসিক দূরত্ব নয়, শারীরিক দূরত্বকেও ত্বরান্বিত করেছিল। তাই তাই দেখা যায়, নীলা সকলের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজ ঘরে আশ্রয় নেয়; কারণ নিজেকে এই পরিবারের সঙ্গে অভিযোজিত করতে সে ব্যর্থ। অপরদিকে তার স্বামীও তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে। বেশি রাত্রে বাড়িতে আসে, দিনের বেলায় স্ত্রীর ঘরে ঢোকে না, এবং তেমনভাবে কথা বলে না। সারাদিন অফিস করবার পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, তারপর বিছানায় আসতে না আসতেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। এমত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীটির একটি স্বীকারোক্তি তুলে ধরা যেতে পারে – "একদিন আমি ধরে ফেললাম তা ঘুম নয়, ঘুমের ভান। অবশ্য অনেক আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু তোমাকে বুঝতে দিতে সাহস ছিল না। তবু সেদিন আর না বলে পারলাম না, একটু রাগ করেই বললাম 'আমাকে পাশে নিয়ে শুতে তোমার যদি এতই ঘেন্না আলাদা একখানা খাটের ব্যবস্থা করলেই হয়। ঘরের মধ্যে জায়গা তো কম নেই।"[২২৮] এখান থেকে আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে, একজন পূর্ণ যৌবনা নববধূ হিসাবে নীলা তার স্বামীর শারীরিক ও মানসিক সাহচর্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। ফল স্বরূপ স্বামীর এই ক্রমাগত অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা নীলাকে অভিমানী করে তোলে। এবং একটা সময় দেখা যায় সেই অভিমান ধীরে ধীরে ক্রোধ ও তিক্ততায় রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে সুপ্রিয়র মনে স্ত্রীর প্রতি একরকম ক্ষোভ ছিল। যা তার পূর্বের মানবিক অনুভূতিকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। যার ফল হিসাবে স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক তথা শারীরিক মিলনের প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করে। কারণ আমরা জানি মানসিক আকর্ষণই শারীরিক মিলনের মাধুর্যকে বৃদ্ধি করে, যা গল্পের এই দম্পতির সম্পর্কে ক্রমশ ম্লান হতে হতে একটা সময় লুপ্ত হয়ে যায়। আর একটি বিষয়ও এখানে লক্ষণীয়, নীলা এই পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরই তার অক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়। কিন্তু সুপ্রিয় যেন নীলার প্রতি উদাসীন হয়ে সেই অক্ষমতাকে বার বার মনে করিয়ে দেয়। ফলে নীলা আরও বেশি হীনমন্য হয়ে পড়ে এবং সমস্ত কাজে ব্যর্থ হতে থাকে। আসলে সে স্বামীর সহযোগিতা কামনা করেছিল। কিন্তু তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় নীলা স্বামীর প্রতি অভিযোগে মুখরা হয়ে উঠল; সুপ্রিয় তাতে আরও বিরক্ত বোধ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সম্পর্কের রূপরেখা নীলাও উপলব্ধি করে –"তোমার ভালোবাসা যত ঘাটতি পড়ল, আমার ভিতরের জ্বালাও তত বেড়ে চলল।"[২২৯] এখান থেকে দুটি

মানুষ ভিন্ন দুটি ধারায় এগিয়ে চলতে থাকে। তারা যেন পরস্পরের কাছে অচেনা হয়ে উঠল। কারণ পূর্বের মানসিকতা থেকে বর্তমান মানসিক কাঠামো ভিন্ন আদলে গড়া। যার প্রতিক্রিয়ায় তাদের সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির পথে এগিয়ে যায়। স্ত্রীর আত্মকথনে উঠে আসে –"তোমাকে আমি যত আঁকড়ে ধরতে চাইলাম, তুমি তত বিরক্ত হতে লাগলে, তোমার বিরূপতা তত বাড়তে লাগল। বাইরে থেকে আমি যত বাঁধতে চেষ্টা করলাম ভিতর থেকে তোমার বাঁধন তত আলগা হতে লাগল।"[২৩০]

সম্পর্কের বাঁধন আলগা হলেও স্ত্রীর প্রতি একরকম সহানুভূতি ছিল। সে উপলব্ধি করেছিল তাদের সম্পর্ক থেকে বা তার থেকে ও পরিবারের কাছ থেকে নীলা যা চায় তা হয়তো কোনদিন পাবে না। তাই সে এমন কিছু করুক বা স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক যাকে কেন্দ্র করে সে সারাজীবন চলতে পারে। নিজের জীবনকে নিজে গড়ে তুলতে পারলে জীবনের না পাওয়ার খামতি তাতে অনেকটা ঘুচে যাবে। দেখা যায় – সুপ্রিয় নীলাকে নতুন করে পড়াশুনা করবার উৎসাহ দিয়েছে; তাতে নীলা ব্যর্থ হলেও আরও নানা দিকে সে স্ত্রীকে প্রেরণা দেয়। একদিন সুপ্রিয় নীলার হাতখানা তুলে নিয়ে বলে –"চাঁপার রঙ না থাকলেও চাঁপার কলির গড়ন আছে। তোমার আঙ্গুল আর্টিষ্টের আঙ্গুল।"[২৩১] তাই সে স্ত্রীকে আর্ট কলেজে ভর্তি করবার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক দিন পর স্বামীর এই আদর ও মিষ্টি ব্যবহার নীলার চোখে জল আনে। সে বলে ওঠে –"অমন করে বল না। আমি অতো ভালোবাসার যোগ্য নই।"[২৩২] এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে নীলা আশা করেছিল সুপ্রিয় আগের মতই বলবে – ভালোবাসায় যোগ্যতা-অযোগ্যতা থাকে না। প্রেম অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলে, অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দেয়। কিন্তু স্বামী বলে ওঠে – "যোগ্যতা নিয়ে কেউ জন্মায় না নীলা! যোগ্যতা প্রত্যেককে অর্জন করতে হয়। .... প্রেমের কোন আলাদা মূল্য নেই। মানুষের মূল্যেই তার মূল্য। নিঃস্ব ভিখারীকে আমরা যা দিই তা প্রেম নয়, আবার ভিখারী হয়ে যা পাই, তাও প্রেম নয়, অনুকম্পা। আমি দেব কোথেকে যদি আমার দেওয়ার ভাণ্ডার না বাড়াতে পারি। তাই সংসারের চোখে, সমাজের চোখে নিজেকে যত মূল্যবান করতে পারব আমার প্রেম তত মূল্যবান হবে।"[২৩৩] নীলা উপলব্ধি করে বর্তমানে স্বামীর কাছে প্রেম-ভালোবাসা। ব্যক্তির মূল্য-অমূল্য, মান-মর্যাদার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মান-মর্যাদীহীন কোন চরিত্র ভালোবাসার যোগ্য নয়। সুপ্রিয়র মতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের নামেই নাম তথা নিজের দামেই দামী হওয়া উচিৎ। অন্যের আশ্রয়ে বা নামে বাঁচা আসলে মৃত্যুর সমান। তাই সব দিক থেকে যদি স্বাবলম্বী হওয়া যায় তবেই ভালোবাসার মর্যাদা পাওয়া যায়, অবলম্বন পাওয়া যায়।

স্বামীর এই মতাদর্শ স্ত্রীর মনে উৎসাহ জাগালেও অনেক বেশি নৈরাশ্য ও হতাশায় পূর্ণ করে। তার মনে হয় – "এজন্মে আমার ভালোবাসা অর্থহীন হয়েই রইল। নিজের মূল্য বাড়িয়ে তাকে মূল্য দিতে পারলাম না। হাহাকার এল, আক্ষেপ এল মনে। একথা আগে বললে না কেন। তাহলে তো কিছুতেই বিয়ে করতে চাইতাম না। চিরকুমারী হয়ে থাকতাম।"[২৩৪] দু'জনের এই মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি পাঠকবর্গের সম্মুখে খুব স্পষ্ট ভাবেই উন্মোচিত হয়।

এমত অবস্থায় নীলার সঙ্গে একজন আর্টিষ্ট চরিত্রের পরিচয় হয়। আর্টিষ্ট অজয়দার সঙ্গে নীলার মানসিকতা ও সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থানের মিল ছিল। এই মিল-ই তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। আসলে নীলার একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গ জীবনে অজয়দার অবস্থান খোলা জানালার মত। তবে তাদের বন্ধুত্বকে দুই পরিবারের কেউ ভালোভাবে নিতে পারে নি। নীলা সুপ্রিয়র সঙ্গে অজয়দার পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং সে ভেবেছিল সুপ্রিয় অজয়দাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখবে ও ঈর্ষা করবে। কিন্তু আমরা দেখি সুপ্রিয় ঠিক এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া জানায় –"আমি তোমাকে শুধু যে জীবিকা বেছে নেওয়ার বেলায় স্বাধীনতা দিয়েছি তাই নয়, পছন্দমত সঙ্গী তুমি খুঁজে নাও তাও চেয়েছি।"[২৩৫] স্বামীর এই উদাসীনতা স্ত্রীর জীবনের চরম আঘাত। আর এখানেই তাদের শিথিল ও ভগ্ন সম্পর্কের নগ্ন প্রকাশ। আসলে স্বামী যে তা-ই চায় এতদিনে নীলা এই প্রথম উপলব্ধি করল। আর এই কারণেই সুপ্রিয় প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে নতুন মতাদর্শকে নীলার সম্মুখে উপস্থিত করেছিল। সে স্ত্রীকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল এই সম্পর্ক থেকে, সেই কারণেই হয়তো কোন সন্তানের জন্ম সুপ্রিয় স্বেচ্ছায় রোধ করে গিয়েছে। তাই সে যখন উপলব্ধি এবং বিশ্বাস করে নীলার জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে ফলে তার একাকিত্ব দূর হবে তখন তাই সুপ্রিয় স্ত্রীকে ছেড়ে দূরে বদলি নিয়ে চলে যেতে পেরেছিল খুব স্বাভাবিকভাবেই।

অপরদিকে আর্টিষ্ট অজয়দা তার ভালোবাসা দিয়ে নীলার জীবনের রিক্ততা ও শূন্যতাকে দূর করতে চেয়েছিল। গল্পের এই পর্যায় থেকে ত্রিকোণ সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। কেন্দ্রে অবস্থানকারী নীলার সঙ্গে দুটি পুরুষ চরিত্রের সম্পর্কের টানাপোড়েন এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, অজয়দা যখন তার হৃদয়ানুভূতিকে নীলার কাছে ব্যক্ত করে তখন নীলার মনোভাব প্রকাশিত হয় এইভাবে – "সে আর যাই হোক, আমার ভবিষ্যৎ নয়। শুধু ভয় নয়, সংস্কার নয়, এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা আমাকে পেয়ে বসল। আমার মনে হল, আমি অজয়দার কথা

ভালোবাসি, ছবি ভালোবাসি কিন্তু আর কিছু আমি ওর ভালোবাসিনে।"[২৩৬] আসলে নীলা একমাত্র তার স্বামীকেই ভালোবেসেছিল। আর্টিষ্ট অজয়দা ছিল তার নিঃসঙ্গ ও একাকিত্ব জীবনে মুক্তির সোপান স্বরূপ। আবার একথা বলা যেতে পারে, হয়তো, নীলা অজয়দা সম্পর্কে সুপ্রিয়র মনে ঈর্ষা জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব করেছিল। কিন্তু স্বামীর মনের সত্য যখন তার সামনে প্রকাশিত হয়ে যায় তখন সে আহত হয়। তাই সে অজয়দার প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়ে চলে আসে। সেই সঙ্গে তাদের 'দাম্পত্য সম্পর্ক'-এর আর এক গভীর সত্যকে সে উপলব্ধি করতে পারে, যা তার আত্মকথনের মাধ্যমে উঠে আসে – "সেই মুহূর্তে আমি যেন তোমার দুঃখ পুরোপুরি বুঝতে পারলাম। যাকে চাই তাকে না পাওয়ার চেয়ে যাকে চাইনে তাকে পাওয়ার বিড়ম্বনা কম নয়।"[২৩৭] এইভাবেই আলোচ্য গল্পে নীলা ও সুপ্রিয়র দাম্পত্য সম্পর্কের সমীকরণ স্তরে স্তরে উন্মোচিত হয়েছে নীলার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। অপরদিকে নীলা উপলব্ধি করে তার প্রতি স্বামীর প্রেমানুভূতি লুপ্ত এবং তাদের সম্পর্কও পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট। কিন্তু তার প্রতি অজয়দার অনুভূতি সত্য এবং নীলার জন্যই অজয়দার জীবনে এই করুণ পরিণতি। তাই তার উপর একরকম সহানুভূতি জাগে নীলার মনে। এই সহানুভূতি থেকে কর্তব্যবোধের জন্ম হয়। তাই সে অজয়দার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করতে চায় তার স্ত্রীর পরিচয়ে। তারই প্রমাণ গল্পের শেষে নীলার অঙ্গীকারের মাধ্যমে আমরা পাই –"তোমরা তোমাদের মামীর হাত থেকে নিচ্ছ, নিতে লজ্জা কি ? সব লজ্জা, সব কলঙ্ক, সব দায় আমি মাথায় করে নেব।"[২৩৮]

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'মর্যাদা'** গল্পে দুটি দাম্পত্য জীবনের গতি-প্রকৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে দু'জন মানব-মানবীর মধ্যে সামাজিক পরিভাষায় অবৈধ তথা পরকীয়া সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং তাকে কেন্দ্র করে চরিত্রের আত্মোপলব্ধি বনাম আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকটি মুখ্য হয়ে উঠলেও পরোক্ষভাবে 'দাম্পত্য সম্পর্কের' বাঁধনও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই এই গল্পটিকে আলোচ্য অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

কাহিনীতে পাওয়া যায় চারজন দম্পতি হল – সুধাংশু-সুপ্রীতি এবং বিমলেন্দু-ইন্দিরা। গল্পে সুপ্রীতি ও বিমলেন্দুর মানসিক টানাপোড়েনের দিকটি বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আমরা জানি, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের সুপ্ত আকর্ষণ জন্মগত। আর এই আকর্ষণের সঙ্গে যদি আরও নানারকম আকর্ষণ যুক্ত হয় তখন তা প্রবল হয়ে ওঠে। গল্পের কাহিনী এরূপ ঃ সুধাংশু ও বিমলেন্দু বন্ধু হলেও তাদের মধ্যে অর্থগত ও সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য ছিল

অনেক বেশি। বিমলেন্দু হালদার একজন ডাক্তার আর সুধাংশু চক্রবর্তী জজ কোর্টের উকিল। আঠারো-উনিশ বছর পর পুনরায় যখন দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হয় তখন দেখা যায় – বিমলেন্দুর শারীরিক অবস্থা প্রায় আগের মত রয়ে গেলেও সুধাংশুর চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। আধ-মাথা জুড়ে একটি চকচকে টাক ও ভুড়ি তার শরীরে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধ। কাজেই বিমলেন্দুর সঙ্গে স্বামীর তুলনা স্ত্রী সুপ্রীতির মনে স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে। তাতে স্বামীর প্রতি তার তাচ্ছিল্য মনোভাব যেমন প্রতিফলিত হয় তেমন বিমলেন্দুর প্রতি তার ঈর্ষার সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্টের দিকটিও পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়টি লেখকের বর্ণনার মাধ্যমে উঠে আসে এইভাবে – "টিকে থাকবার মূল মন্ত্রটা বিমলেন্দু যেমন জানে, সুধাংশু তেমন জানে না। এ তুলনাটা সূচের মত সুপ্রীতির মনে যে বিঁধেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুধাংশু এতকাল জজ কোর্টে ঘষে ঘষেও উপার্জনটাকে ভদ্ররকমের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি। পুরনো জুতো, পুরনো স্যুট দেখেই তা বোঝা যায়। এই বয়সেই সব রকম আনন্দ উৎসাহ খুইয়ে জীবনটাকে যেন একখানা ছ্যাকড়া গাড়ির মত অতি কষ্টে টেনে নিয়ে চলেছে সুধাংশু। আর তারই পাশে তারই ঠিক সমবয়সী বিমলেন্দু যেন একখানি ধারালো ইস্পাত। খাপখোলা তরোয়ালের মত। শুধু চেহারায় নয়, চালে চলনে ভাষায় ভঙ্গিতে সে একেবারে অনন্য।"[২৩৯]

অপরদিকে বিমলেন্দু বহুচারিতা তথা বহুকামিতায় বিশ্বাসী। আর তাই নিয়ে স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে তার যে মাঝে মধ্যে কলহ হত সে বিষয়ে সুপ্রীতি জ্ঞাত ছিল। শুধু তাই নয়, বিমলেন্দু নানা ভাবে সুপ্রীতিকেও আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে। বাহ্যিক ক্ষেত্রে বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে বিমলেন্দুর ঠাট্টার সম্পর্ক হলেও ব্যাপারটা যে ঠাট্টার চেয়ে অনেক বেশি তা সুপ্রীতি বিমলেন্দুর স্পর্শের উত্তাপ, কথার ব্যঞ্জনায় ও চোখের উজ্জ্বলতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে এবং প্রশ্রয় দেয়। দেখা যায়, সব জানা সত্ত্বেও সুপ্রীতি একদিন বিমলেন্দুর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। এর পিছনে তার বাসনা তথা প্রবৃত্তির তাড়না থাকলেও যে বিষয়টি প্রধান ছিল তা হল সুপ্রীতির অসচ্ছল গতানুগতিক দাম্পত্য জীবনের ক্লান্তিবোধ। সে এই একঘেয়েমি জীবন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে চলেছিল বা বলা যায় জীবনে নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণে সে আগ্রহী ছিল। তাই একদিকে প্রবৃত্তির তাড়না অপরদিকে মুক্তির বাসনা – এই দুই কারণেই সুপ্রীতি সব জেনে শুনে নিজেকে এগিয়ে দেয়। তার এই মনোভাবের কথা জানা যায় গল্পের এই অংশে –"না শুধু অন্যের ইচ্ছার কাছে না, নিজের বাসনার কাছেই সে অল্পদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিল। বশ হয়েছিল সে আপন

বাসনার। সে তো তখন আর চতুর্দশী অবুঝ কিশোরী ছিল না যে বিমলেন্দু তাকে পথ ভুলিয়ে নেবে। সুপ্রীতি তখন পূর্ণবয়স্কা নারী। .....তবু বিমলেন্দুর সঙ্গে সে যে গোপন সম্পর্কের রঙিন সুতোয় কেন জড়িয়েছিল সুপ্রীতির নিজের কাছেই তা এক বিস্ময়কর প্রশ্ন।..... কিন্তু সেই উদ্দীপনা উন্মাদনা ভরা এক অদ্ভুত অনুভূতির স্বাদ আজও ভুলতে পারেনি সুপ্রীতি। নতুন রূপ, নতুন রঙ ধরেছিল দুনিয়ায়। মনে হয় বিমলেন্দু ছিল শুধু উপলক্ষ্য। লক্ষ্য ছিল নিজের জন্মান্তরের রূপান্তর। যেন এ ঘর থেকে ও ঘরে অভিসার নয়, যেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে দু ঃসাহসিক অভিযাত্রা।"[২৪০] এই বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয় – বিমলেন্দু শুধুমাত্র রূপান্তরের পন্থা, যাকে কেন্দ্র করে সুপ্রীতি নব অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে জন্মান্তর লাভ করল ও একঘেয়েমি জীবন থেকে নিজেকে খানিকটা নিষ্কৃতি দিল। বিমলেন্দুর চোখ দিয়ে সে নিজের অস্তিত্ব ও মর্যাদাকে নতুন রূপে অনুভব করল। তবে আমরা জানি, সব অনুভূতির ক্ষেত্রেই প্রথমে যে উদ্দীপনা, রোমান্স থাকে তা ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে। তখন তাকেও গতানুগতিক বলে মনে হয়। সুপ্রীতির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। নবলব্ধ অনুভবেও জীর্ণতা ধরা পড়ল। তার মনে পুনরাবৃত্তির ক্লান্তি এল। উপপতির মধ্যেও সেই পতিরই আধিপত্য স্পৃহা সুপ্রীতি দেখতে পেল। ফলস্বরূপ সুপ্রীতির মনে বিমলেন্দুর প্রতি একরকম বিতৃষ্ণা জাগে। আর একটি বিষয়ও সুপ্রীতি উপলব্ধি করল – বিমলেন্দুর গ্রহ-নক্ষত্রের অভাব নেই। নিষ্ঠা বলে কোন বস্তুকে সে স্বীকার করতে চায় না। কেননা, তা ওর স্বভাবের মধ্যে নেই। এই দুটি দিক সুপ্রীতির সম্বিৎ ফেরাতে সাহায্য করে। ফলে তার আত্মোপলব্ধি ঘটে। সেই সঙ্গে কৃতকর্মের জন্য সে অনুতপ্ত হয়। তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিবেকবোধ জাগ্রত হয়। নিজের কাছে সে হীন হয়ে যায়। আর এই আঘাতে তার আহত সত্তা আত্মমর্যাদাকে পুনরুদ্ধারের সংকল্প নেয়।

একটা বিষয় এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, 'দাম্পত্য সম্পর্কের বাঁধন' এখানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কেননা, সাময়িক আবেগে সুপ্রীতি নিজেকে ভাসিয়ে দিলেও এই সম্পর্কের বাঁধনের মাহাত্ম্য-ই তার কৃতকর্মের বৈধতা-অবৈধতা বোধ সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে। সুপ্রীতি যদি কেবলমাত্র অবিবাহিতা একজন নারী হত তাহলে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য হয়তো নিজেকে শাস্তি দিত কিংবা বিমলেন্দুর প্রতি শোধ নিত; হয়তো বা বিমলেন্দুর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত। কিন্তু তা এখানে সম্ভব নয়। বিমলেন্দুর ক্ষেত্রেও সেই একই বিষয় কাজ করেছে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রীতির একটি মনোভাব উল্লেখ করা যেতে পারে – বিমলেন্দু যখন প্রশ্ন করেছে –"সুপ্রীতি, তুমি যদি ধরা দিয়েই ছিলে, অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে গেলে কেন ?" এই

প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীতির মনে জাগে –"সে কি মেনে নেয় না যে ও ধরণের সম্পর্ক চিরদিন অস্থায়ীই হয়ে থাকে ? বিশেষ করে, দুজনেরই যখন আলাদা আলাদা সংসার আর মান-সম্মান আছে ?"[২৪১] কাজেই এই পরিস্থিতিতে সুপ্রীতিকে গোপনেই তার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজ করে যেতে হয়। তবে এই প্রতিষ্ঠার কাজে প্রেরণা দিয়েছিল বিমলেন্দুই। সে সবসময় সুপ্রীতিকে বলেছে বড় হতে; এমনকি, সে যে শুধু মাত্র ঘরের কোণে মৃৎপ্রদীপ হয়ে থাকবার জন্যে আসেনি তা বিমলেন্দু তাকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে। সুপ্রীতি জানে বিমলেন্দুর সেই সব কথায় হয়তো বা আন্ত রিকতা ছিল না। বেশিরভাগ মুহূর্তই ফ্লার্টিং-এ ভরা ছিল, তথাপি সুপ্রীতি সেই কথাগুলিকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছে। দেখা যায় – স্বামী ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছে সে এক বিস্ময়কর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। দরিদ্র স্বামীর সংসার চালিয়ে ছেলেমেয়েদের লালন-পালন শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নিয়েও সে ঘরে বসে বি.এ., এম.এ. পাশ করে ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. ডিগ্রি নিয়ে একটি স্কুলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। নিজের উপার্জনের সাহায্যে স্বামীর সংসারকে সচ্ছল, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে বিমলেন্দুর অনুপ্রেরণায়। তাই সুপ্রীতি তাকে ঘৃণা করলেও তার প্রতি সে কৃতজ্ঞ। এই কারণেই বিমলেন্দুর উপর সুপ্রীতির একরকম সহানুভূতি আছে। সেই সহানুভূতির খাতিরে সে আজ বিমলেন্দুর মৃত্যুসজ্জার পাশে উপস্থিত হয়েছে এবং তার বহু কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর দিতে নিজেকে প্রস্তুত করে এনেছে। বিমলেন্দুর প্রতি কৃতজ্ঞতার দিকটি ধরা পড়েছে এইভাবে –"একথা সুপ্রীতি অস্বীকার করে না কামকে কীর্তি দিয়ে ঢাকবার, অনুতাপকে উত্তাপে পরিণত করবার এই জেদ আর জাদু সে শিখেছে বিমলেন্দু ডাক্তারের কাছ থেকে। বিমলেন্দু শুধু দৈহিক সান্নিধ্যই তাকে দেয়নি, মানসিক দৃঢ়তায়ও দীক্ষিত করেছে।"[২৪২] অপরদিকে বিমলেন্দু বহুচারিতায় লিপ্ত থাকলেও আর পাঁচটি নারীর সঙ্গে সুপ্রীতিকে সে এক করে দেখেনি। তার মনে সুপ্রীতির স্থান ছিল আলাদা। সে মনে মনে তাকে নারীত্বের মর্যাদা দিয়েছিল। তার মনের এই গোপন কথাটি জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে প্রকাশিত হয়ে যায় তারই মুখ দিয়ে –"সুপ্রীতি আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার খ্যাতি আর বিত্ত সম্পত্তি দিয়ে অনেককে কিনেছি, তোমাকে সে ভাবে নিতে চাইনে পেতে চাইনে। তুমি দরিদ্র বলে আমি সে সুযোগ নেব না। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা যদি শুধু দেহেরই হয় তা শুধু দেহেরই থাকুক। দুজনে একটা দৈহিক আনন্দের অংশীদার! সমান অংশ। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। কেউ দাতা নয়, কেউ প্রার্থিনী নয়। তাই আমি শুধু তোমাকে ফুল উপহার দিয়েছি যার কোন আর্থিক দাম নেই বললেই চলে, যা পরদিন শুকিয়ে যায়।"[২৪৩] অর্থাৎ বিমলেন্দু

সুপ্রীতিকে যোগ্য সম্মান দিয়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। এই সত্যের সম্মুখীন হয়ে সুপ্রীতির হৃদয়ও এই মুহূর্তে দোলায়িত। এই নবলব্ধ ভাবাবেগের মাধ্যমে তার মনের ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রশমিত হয়। আলোচ্য গল্পে এইভাবে কামকে উত্তীর্ণ করে এক ভিন্ন অনুভূতিতে দুজন মানব-মানবী আবদ্ধ হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক সভ্যতা সংস্কৃতির অন্তর্গত একজন আধুনিক মনস্ক পুরুষ কঠোর রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন একজন নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি কেমন হয় তারই একটি পরীক্ষা **'পাদপীঠ'** গল্পটি। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে 'সচিত্রভারত' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গল্পে প্রধান দুটি চরিত্র হল – স্বামী ননীগোপাল ও স্ত্রী কমলা। তাদের দাম্পত্য জীবনের বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত করবার পর একটা সময়পর্ব থেকে আলোচ্য গল্পের কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে। সেখানে দেখা যায়, স্ত্রী কমলা তার প্রতিদিনের অভ্যাসমত স্বামীকে প্রণাম করে ভোরের বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে স্বামী ননীগোপাল তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে। এই পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আদর-সোহাগ ও কথোপকথন হয় তাতে দাম্পত্য সম্পর্কের এক মধুর দিক আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি-শ্রদ্ধায় ননীগোপাল প্রসন্ন হলেও সে স্ত্রী কমলার এই অন্ধ সংস্কারকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না। বরং সে স্ত্রীকে একাজে বারবার নিষেধ করেছে। তার প্রমাণ পাই – স্ত্রীর মুখখানা রোমশ বুকের ওপর চেপে ধরে হেসে ননীগোপাল বলে –"তোমাকে কতদিন বলেছি আজকাল আর ওসব চলে না। ওসব প্রণাম-ট্রনাম চলত আমাদের ঠাকুরমা দিদিমার আমলে। আজকাল স্বামী আর স্ত্রী কেউ কারো নীচেও থাকবে না কেউ কারো পিছেও থাকবে না। দুজনেই পাশাপাশি থাকবে।"[২৪৪] এই উক্তির মধ্য দিয়ে ননীগোপালের কুসংস্কার-মুক্ত আধুনিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে দুটি মানুষ দু'রকম পরিবেশ পরিস্থিতিতে বড় হয়ে উঠেছে। ফলে তাদের মানসিক কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন। কমলা বর্ধমান জেলার মেয়ে। সে ছোটবেলা থেকে দরিদ্র দাদামশাই ও দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে না উঠতেই দিদিমা তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। ফলে পড়াশুনায় সে বেশিদূর এগোতে পারেনি। পরিবর্তে দিদিমা নাতনিকে প্রাণপণে ব্রত-পার্বণ, গোঁড়া বামুনের আচার-নিষ্ঠা সব শিখিয়ে রেখে গিয়েছেন। ফলস্বরূপ, কমলা বিয়ের পর থেকেই স্বামীকে প্রণাম করে বিছানা ছাড়ে। স্বামী খাওয়ার আগে কোনদিন

খায় না। এমনকি, ননীগোপালের এঁটো পাতেই সে খেতে বসে। একজন কন্যাসন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও সে পুত্রসন্তানের জননী হতে চেয়েছে। তাতে স্বামী নানাভাবে বোঝাতে চাইলেও কমলা বুঝতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত ননীগোপাল স্ত্রীর মনোবাসনা পূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে। অপরদিকে পুরুষ চরিত্রটি শহুরে মানুষ। সে বি.এ. পাশ ও ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসে কেরানী পদে নিযুক্ত। তার মননে আছে আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতির ছাপ। কাজেই সেই মানসিকতা থেকেই সে চায় তার স্ত্রীও আধুনিক যুগের অনুগামিনী হোক। কিন্তু স্ত্রী কমলাকে নিয়ে সে মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে ওঠে। দেখা যায়, ননীগোপালের বন্ধুদের সঙ্গে সে ভালো করে আলাপ করতে পারে না। মাথার আঁচল ফেলে স্বামীর সঙ্গে সে পার্কে বেড়াতে বা রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে পারে না। এমনকি, নাইট শো-তে চৌরঙ্গী পাড়ায় ইংরাজি ছবি দেখতেও কমলা চায় না। এই প্রসঙ্গে ননীগোপালের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে –"কমলা বড় ঘরকুনো। ঘরের কাজ নিয়ে থাকতেই ভালোবাসে। নিজের খেয়ালের সঙ্গিনী হিসাবে ননীগোপাল ওকে খুব কমই পায়। অথচ কম মাইনে আর কম বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও আধুনিক নাগরিক ছেলে ননীগোপাল। নিজের এসব খেয়ালকে সে সভ্যতার অঙ্গ, সংস্কৃতির অনুষঙ্গ বলে মনে করে। সেখানে স্ত্রীর সাহচর্য না পেয়ে মন তার কেবলই খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে।"[২৪৫] অর্থাৎ স্ত্রীকে নিজের মত করে না পাওয়ার একটা খামতি তার মধ্যে কাজ করেছে। তথাপি সে স্ত্রীকে নানাভাবে পরিমার্জিত করবার চেষ্টাও করেছে।

এইভাবেই পাওয়া-না পাওয়ার মধ্য দিয়ে একটি গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে। এমত পরিস্থিতিতে নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে ননীগোপাল তার 'বস'-এর কাছ থেকে একখানা কমপ্লিমেন্টারী কার্ড পায়। তাতে সে আনন্দিত হয় এবং এত বড় সুবর্ণ সুযোগকে সস্ত্রীক উপভোগ করতে চায়। তাই সে তার মনের কথা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করলে দেখা যায় কমলা তাতে রাজি হয় না। সে নানারকম কাজের অজুহাত দেখায়। ননীগোপাল পরদিনও বারবার করে অনুরোধ করে; অনেকবার করে বোঝায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সে ব্যর্থ হয়। সে একাই অনুষ্ঠান দেখতে যায়। এই ঘটনা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দেখা যায়, ননীগোপাল অনুষ্ঠান দেখে প্রসন্ন মনে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে নানা বিষয় বর্ণনা করে। আর এই প্রসঙ্গে মীনাক্ষীর অর্থাৎ ননীগোপালের বন্ধুর বোনের সঙ্গে যে তার দেখা হয়েছিল তা প্রকাশ্যে আসে। আর তাকে কেন্দ্র করে কমলার হীন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হতে থাকে। সে একজন অত্যন্ত রক্ষণশীলা নারী। কাজেই একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর স্বামী-স্ত্রীর বা প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক ছাড়াও আরও অন্যান্য সম্পর্ক যে থাকতে পারে তা কমলা মুক্ত মনে মেনে নিতে পারে

না। তাই সে ভ্রুকুঞ্চিত করে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে –"মীনাক্ষী আবার কে ? কোন্ মীনাক্ষী ? ..... সেই কালো ঢ্যাঙ্গা আইবুড়ো মাস্টারনী মেয়েটা। যে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার এসেছে নিশ্চয়ই সেই। সত্যি করে বল সেই কিনা।"[২৪৬] আসলে কমলা স্বামীকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। সে অনুমান করেছে – ননীগোপালই মীনাক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। যে বিষয়টি তাকে একদিকে যেমন ঈর্ষান্বিত করেছে অপরদিকে তার অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। তাই ননীগোপাল যখন জানায় – মীনাক্ষী আলাদা গিয়েছে তখন কমলা চেঁচিয়ে বলে –"মিথ্যে কথা। আরো যদি মিথ্যে কথা বল আমি এই ভাতের থালা নর্দমায় ফেলে দেব। স্বীকার কর তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে।" উত্তরে ননীগোপাল জানায় –"যদি গিয়েও থাকি তাতেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। সে আমার বন্ধুর বোন। অনেকদিনের জানাশোনা। নাচগান ভালোবাসে।" এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কমলা বিকৃত মুখে বলে –"তোমাদের মহাভারত কিছুতেই অশুদ্ধ হয় না।"[২৪৭] স্ত্রীর কথায় স্বামী স্তব্ধ হয়ে যায়। তার মানসিকতায় ধরা দেয় এতে কোন অন্যায় নেই। স্বাধীনচেতা ননীগোপাল মনে করে কমলা যদি তার কোন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যায় তাতে সে বাধা দেবে না। তার মনের কথা সে স্ত্রীকেও জানায়। কিন্তু কমলার মানসিকতা তা গ্রহণ করতে পারে না। স্বামীর প্রস্তাব তার মনঃপুত হয় না। কাজেই ভিতরে ভিতরে তার 'মন' আলোড়িত হতে থাকে। যার প্রতিক্রিয়ায় কমলা মেয়েকে মারে, ঝিকে বকে এবং এটা ওটা ভাঙ্গতে ও ছড়াতে থাকে। আবার স্বামীর কাছে এসে বলে –"গোড়া থেকেই তুমি তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছিলে। জানতে যে আমি যাব না, যেতে পারব না। এমন শঠ বদমাশ –।"[২৪৮] এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ননীগোপাল তার ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারেনি। তাই তার মনের কঠিন সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ে –"যেমন গেঁয়ো তেমনি অভদ্র। তোমার উচিৎ ছিল অশিক্ষিত গেঁয়ো গোঁয়ারের সঙ্গে বিয়ে হওয়া। তাহলে লাথি গুঁতো খেয়ে ঠিক থাকতে।"[২৪৯] স্বামী-স্ত্রীর এমন উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এই স্তরে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের চরম অবনমনের দিকটি পাঠকবর্গের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার দেখা যায় – রাতের অন্ধকারে গভীর মিলনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা পুনরায় ফিরে আসে। তখন কমলা বলতে থাকে –"আমি এখন থেকে তুমি যা বল তাই করব। তোমার সঙ্গে সব জায়গায় বেড়াতে যাব। মাথায় আঁচল দেব না, এঁটো পাতে খাবো না, তোমার সব কথা শুনব।" আর সে কথায় ননীগোপালেরও দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়। সে বলে –"তুমি ভুল বুঝে কষ্ট পাচ্ছ কমলা। ওসব কথা থাক।"[২৫০]

স্বামী ননীগোপাল অনুমান করেছিল – তাদের মধ্যেকার মান-অভিমানের পালা রাত্রিতেই

মিটে গিয়েছে। কিন্তু সে পরদিন সকালে ওঠে দেখে স্ত্রী কমলা তার পিছন ফিরে শুয়ে কাঁদছে। এমতাবস্থায় ননীগোপাল কমলাকে কাছে টেনে নিলে সে কাঁদো কাঁদো সুরে জানায় –"....আমি যে আজ কিছুতেই নিজেকে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারছিনে, কিছুতেই পারছিনে।"[২৫১] অর্থাৎ কমলা হয়তো নিজের আচার ব্যবহারে নিজের কাছেই লজ্জিত হয়েছে। তাই তার মধ্যে এমন দ্বিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে। হয়তো বা সংস্কারে অভ্যস্ত কমলা তার নিত্যদিনের কর্ম সম্পন্ন করতে না পেরে এমন কষ্ট পাচ্ছে। এছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়তো এর পিছনে নিহিত থাকতে পারে তাহলে – স্বামীকে সে এতদিন তার মনের এক বিশেষ স্থানে রেখে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে এসেছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর কমলা স্বামীর প্রতি হারানো শ্রদ্ধা-ভক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম হচ্ছে। অর্থাৎ তার হীন সংস্কারাচ্ছন্ন মনের কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে না পারার যন্ত্রণায় সে আহত হয়েছে, আর তাই স্ত্রীর বিলাপের ভাষা শুনে ননীগোপালও স্তব্ধ হয়ে যায়। এই কারণে সে মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারেনি –"তুমি আমার পাশে থাকলেই যথেষ্ট, বুকে থাকলেই যথেষ্ট, পায়ের কাছে যাওয়ার তোমার কোনই দরকার নেই।"[২৫২]

'স্বত্ত্ব' গল্পটি ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের মাধ্যমে লেখক যেন তাঁর একটি পরীক্ষা ও ফলাফলকে তুলে ধরেছেন। একটি পূর্ববিবাহিতা বিধবা নারীকে তার সন্তান সহকারে কোন পুরুষ যদি বিবাহ করে তাহলে তাদের পরবর্তী জীবনের চলমানতা কেমন হয় ? কেমন হয় তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বাঁধন ? বা বলা যায় অতীত জীবন ও অভিজ্ঞতা কীভাবে প্রভাবিত করে তাদের বর্তমান সম্পর্ককে এবং একটি পরিস্থিতিতে এসে কেমন করে চরিত্রগুলি তাদের মধ্যেকার আসল সম্পর্কের রূপরেখা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তারই নানা দিক এই গল্পে ধরা পড়েছে।

আলোচ্য গল্পে মূলত চারটি চরিত্র – একটি নারী ও তার আগের পক্ষের সন্তান, বর্তমান স্বামী ও শাশুড়ি। আসলে পূর্ব জীবনাভিজ্ঞতা এবং আগের পক্ষের সন্তানের উপস্থিতি নারীটির বর্তমান দাম্পত্য জীবন ও সম্পর্কের প্রধান নিয়ামক। এই দুটি নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে চরিত্রগুলি কীভাবে পরিচালিত হয় ও একরকম সম্পর্কের আড়ালে থাকা আসল সম্পর্ক কেমন করে উন্মোচিত হয়ে যায় সেই বিষয়টি আমরা এখানে দেখে নেব।

গল্পের প্রধান নারী চরিত্র মানসী বর্তমান স্বামী প্রতুলের বন্ধু হিরণ সেনের স্ত্রী ছিল। হিরণের আকস্মিক মৃত্যুর পর সমবেদনার ভিতর দিয়ে প্রতুল ও মানসী অন্তরঙ্গতায় পৌঁছোয়।

একটা সময় হয়তো সহানুভূতিতে এবং এক বিশেষ আবেগে আবিষ্ট হয়ে প্রতুল মানসীকে তার দেড় বছরের সন্তান সহকারে বিবাহ করে। এক্ষেত্রে বলা যায়, আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও হিন্দু সংস্কারে এখনো নিমজ্জিত, সেখানে যে সময়পর্বে গল্পটি রচিত হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একজন বিধবা রমণীর পক্ষে পুত্রের এমন বিবাহকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রতুলের মা সুভাষিণী ছেলের এই কার্য-কলাপ সমর্থন করেনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুত্রের সঙ্গে তার সনাতনী, সংস্কারাচ্ছন্ন মায়ের মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে সন্তানের সঙ্গে মায়ের যে চিরন্তন সম্পর্ক ও অধিকারবোধ তা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। এর প্রভাব তাদের নব দাম্পত্য জীবনে যে প্রতিফলিত হবে তা খুব স্বাভাবিক। তথাপি দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় সন্তান ও মায়ের সম্পর্ক কিছুটা উন্নত হয়। সুভাষিণী কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে থাকতে সম্মতি জানায়। শর্তগুলি এমন – সুভাষিনী নিজে রান্না করে খাবে এবং অপরের সন্তানকে কোলে কাঁখে নিতে পারবে না। আসলে সুভাষিণীর ক্রোধের মূলে আছে মানসী ও তার সন্তান বাবলু। আমরা জানি শাশুড়ি ও বৌমার মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে থাকে অধিকার বোধের লড়াই। অর্থাৎ শাশুড়ির যেমন তার সন্তানের উপর অধিকার থাকে তেমনি স্ত্রীরও স্বামীর উপর অধিকার আছে। এই নিয়েই দুজনের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। আর এখানে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতুলের এই বিধবা মানসীকে বিয়ে করবার বিষয়টি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই চরিত্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। এমত অবস্থায় প্রতুল যখন বাবলুকে সন্তান স্নেহে ভালোবাসে তখন এই বিষয়টি সুভাষিণীকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করে তোলে। তাই সে নাক মুখ কুঁচকে তার পুত্রকে বলে –"ছি-ছি-ছি, আমার ভাবতেও ঘেন্না করে। তোর কি করে এমন পিরবিত্তি হ'ল পিতু। বাচ্চা শুদ্ধ এক বিধবা মাগীকে তুই বিয়ে করে আনলি। তারপর সেই বাচ্চাকে আবার নিজের ছেলে বলে চালাচ্ছিস?"[২৫৩] প্রতুল ও মানসীর বিবাহের পরে তাই এই পর্যন্ত ছিল মানসিক টানাপোড়েনের প্রাথমিক পর্যায়।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, প্রথম দিকে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলেও তারা যত সংসারের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হতে থাকে তত তাদের মধ্যে মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতুলের ক্ষেত্রে এই অস্থিরতার মূলে ছিল স্ত্রী মানসীর পূর্ব জীবন-অভিজ্ঞতার বিষয়টি। মানসী যখন হেসে বলে –"তোমাকে অত করে বলতে হবে না। শাশুড়ির মন জুগিয়ে চলা আমার অভ্যেস আছে।"[২৫৪] এই কথা প্রতুলকে স্তব্ধ করে দেয়। দু জনের বয়সই সমান তবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীর মনে হয় সাংসারিক অভিজ্ঞতায়

মানসী যেন অনেক বড়। ওর কাছে একটি কথা লুকোবার জো নেই। মানসীর চাল-চলনে, সংসারের রীতি-নীতি, কাজ-কর্মের অভিজ্ঞতায় সে যে নববধূ নয়, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্ত্রীর এই অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধিমত্তাই প্রতুলের অস্বস্তির প্রধান কারণ। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে এতে ক্ষুব্ধ হয় এবং সামান্য কারণে তার মনের প্রসন্নতা বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ স্ত্রীর এই আচরণ প্রতুলের মনের অনুভূতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তবু সে স্ত্রীর সামনে স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করে অভিনয়ের মাধ্যমে। মনের গোপন অস্বস্তি ও অপ্রসন্নতাকে প্রতুল মনের কোণেই চাপা দিয়ে রাখে তাদের সম্পর্ককে অক্ষত রাখবার তাগিদে।

পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রতুলের দাম্পত্য জীবনের আর একটি বড় অসহ্যের বিষয় হল – স্ত্রীর আগের পক্ষের সন্তান বাবলু। আসলে মা সুভাষিণীর মত প্রতুলও নিজে বাবলুকে সহ্য করতে পারে না। একজন স্বামী হিসাবে স্ত্রীর অন্যপক্ষের সন্তানকে তথা অন্যের ঔরসজাত অপত্যকে নিজ পুত্রস্নেহে লালন-পালন করা অস্বাভাবিক ব্যাপার। যে কোন মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। বাবলু যতই 'বাবা বাবা' বলে ডাকুক 'এটা আনো ওটা আনো' বলে আবদার করুক বা থেকে থেকে প্রতুলের কোলে পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ুক না কেন, সবসময় প্রতুল তাতে স্বস্তি বোধ করে না। তার মনের গোপন বিদ্বেষ বেরিয়ে আসতে চায়। আসলে বাবলুর সঙ্গে প্রতুলের এক সুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রে রয়েছে মানসী। একজনের প্রেয়সী সত্তা অপরজনের মাতৃসত্তা। দু'জনের সম অধিকারের বিষম লড়াই। তবে প্রতুল তার মনের অবস্থা মানসীকে বুঝতে দেয় না। মাকে লুকিয়ে এবং স্ত্রীকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে বরং বাবলুকে একটু বেশি আদর আহ্লাদই করে। ফলে সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কের লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

অপরদিকে ঘটনাক্রমে দেখা যায়, সুভাষিণী রক্ষণশীল সমাজে পুত্রের সম্মান রক্ষার্থে বাবলু প্রতুলের প্রথম পক্ষের সন্তান, এই কথা সকলকে জানায়। শুধু তাই নয়, বাবলুর প্রতি হঠাৎ করে তার স্নেহ-ভালোবাসা বর্ষিত হয়। এর পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে; এক – সুভাষিণী সকলের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে তাকে সত্যি করার প্রচেষ্টা, দুই – বাবলুর ভাবনাকে রূপান্তরিত করে মানসীকে শাস্তি দেওয়া। সে যাই হোক না কেন সুভাষিণীর এই আচরণ মানসীর মাতৃসত্তাকে সংকটাপন্ন করে তোলে। এখানেও আছে সেই অধিকারের লড়াই। তাই মানসী উপলব্ধি করে –"আমি যেমন তাঁর ছেলেকে কেড়ে নিয়েছি, তেমনি তিনিও আমার ছেলেকে কেড়ে নেবেন।"[২৫৫] লক্ষণীয় বিষয়, প্রতুল কিন্তু মায়ের এই আচরণে মনে মনে খুশি হয়েছে। কারণ সে উপলব্ধি করেছে বাবলু যদি সুভাষিণীর কাছে থাকে তাহলে মানসীকে নিয়ে তার

(বাবলু) সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খানিকটা কমবে। প্রতুল মানসীকে এককভাবে পাবে। তাই সে নানা ভাবে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে কিন্তু মানসী অবুঝ। তাই সে যখন স্বামীর কাছে অভিযোগ জানায় বাবলুর সে সৎ মা একথা কীভাবে সহ্য করবে তখন এর উত্তরে প্রতুল বিরক্ত হয়ে জানায় –"যেমন করে আমি সইছি।"[২৫৬] এই কয়েকটা শব্দ ও একটা বাক্যের মাধ্যমেই প্রকাশ হয়ে যায় তাদের বাহ্যিক ভাবে চলা এতদিনের দাম্পত্য সম্পর্কের আড়ালে থাকা আসল সম্পর্কের রূপরেখা। এই সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে মানসীর মনের এতদিনের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যায়। তাই সে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলে ওঠে – "ও, এতদিনে তোমার মনের আসল কথা বেরিয়ে পড়েছে, তুমি আমাদের দু'জনের কাউকেই সহ্য করতে পার না। কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্য, পাঁচজনের নির্যাতন থেকে বাঁচাবার জন্য তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসনি, আজও ভালোবাস না। আমি তোমার কোন কথা আর বিশ্বাস করিনে। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি।"[২৫৭] মানসীর এই আর্তনাদ প্রতুলের মনে অনুকম্পা জাগায়। তা থেকেই সে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এর পরে কি তাদের সম্পর্কে আর বিশ্বাস থাকবে ?

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়'** গল্পটির মুখ্য বিষয় হৃদয়বৃত্তি বনাম ক্ষুন্নিবৃত্তির টানাপোড়েন। যাকে কেন্দ্র করে একটি দাম্পত্য সম্পর্কের রূপ-প্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়েছে। তারই সেই দিকটি কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখে নেব –

১৩৬৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' গল্পটির নামকরণ একটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই নারী মনস্তত্ত্বের একটি গভীর দিক গল্পে উঠে আসবে তা আমরা ধরে নিতে পারি। আর এই নারী হৃদয় কেন ও কীভাবে আন্দোলিত হয়েছে তা-ই আমাদের দেখার বিষয়। কেননা এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সম্পর্ককে প্রভাবিত করে থাকে। আলোচ্য গল্পে একটি পুরুষ চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে দুটি দাম্পত্য জীবন অঙ্কিত হলেও আমাদের লক্ষ দ্বিতীয় দাম্পত্য সম্পর্ক। গল্পের নায়ক পরেশ একটি গান-বাজনার দলের অধিকারী। অর্থাৎ দালালি করা তার মূল পেশা। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও একে কেন্দ্র করেই স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। দাম্পত্য কলহের চরম পরিণতিতে স্ত্রী আত্মহত্যা করে। গল্পের এখানে প্রথম দাম্পত্য জীবনের ইতি টানা হলেও এর প্রভাব তার পরবর্তী জীবনেও প্রতিফলিত হয়। দেখা যায়, যে বাঈজীর সঙ্গে পরেশ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল পরে তাকে বিবাহ করে সে দ্বিতীয় দাম্পত্য জীবনের সূচনা করে।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল সেই তথাকথিত দুঃশ্চরিত্রা পতিতা নারীটি অর্থাৎ সুধা যখন সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয় এবং সম্পর্ক স্থাপনের স্বাভাবিক নিয়মে স্বামী-সন্তান সুখে তার জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন ধীরে ধীরে বাঙালী গৃহবধূর আচার-আচরণ ও সংস্কারবোধ তার মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। সে সুস্থ সম্পর্কের বাঁধনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। ফলে স্বামীর চারিত্রিক ত্রুটি তার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাই ছিল স্বামীর সঙ্গে সুধার মনোমালিন্যের প্রাথমিক কারণ। সেও পরেশের প্রথম স্ত্রীর মতো প্রবল অধিকারবোধে স্বামীকে নিজের কেন্দ্রীভূত করতে চায়। তবে সে ব্যর্থ হয়। আর সেই ব্যর্থ মনের যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এইভাবে –"সুধার মাঝে মাঝে মনে হয় হিংসুটে বীনা অপঘাতে মরে আর কোথাও যায়নি, সুধার বুকের মধ্যেই এসে বাসা বেঁধেছে। দরমাহাটার সেই ঘর ছেড়ে এসে কি হবে – সুধার বুকের মধ্যে সেই ঘর অমর হয়ে আছে। সুধার নিস্তার নেই, কিছুতেই নিস্তার নেই।"[২৫৮] তবে এই অশান্তির মাঝেও তাদের সম্পর্কের মধুর দিকটিও উন্মোচিত হয়। আর্থিক অসচ্ছলতা তাদের জীবনকে জটিল করে তুললেও মন-মানসিকতা যখন ভালো থাকে তখন আমরা দেখি পরেশ তার স্ত্রীকে গভীর আবেগে 'তুমি' থেকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে। যার মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি আন্ত রিকতার দিকটিই প্রকাশিত হয়। অপরদিকে সুধাও মাঝে মাঝে স্বামীর প্রতি অভিমান করে থাকে। তা আসলে তার মনের ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তবে আর একটি বিষয় সুধার অন্তর্জগতকে আলোড়িত করেছিল। তা হল – স্বামী পরেশ স্ত্রীর নামানুসারে দলের নামকরণ করলেও দলের ক্ষেত্রে সুধা বর্তমানে অযোগ্য। কারণ বছরের পর বছর সন্তান ধারণ করতে করতে সে তার দেহের গঠনগত সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যকে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, তার গলার সুরেও পূর্বের সেই মিষ্টতা আর নেই। হারানোর এই বেদনা স্বাভাবিকভাবে তাকে হীনমন্য করে তোলে। আর এই মানসিকতা থেকেই সে দলের অন্যান্য নারীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। ফলে সে এই দল ভেঙে ফেলতে চায়। আসলে এখানে অস্তিত্বের সংকটের প্রশ্নই জড়িয়ে আছে। তাই দেখা যায় গল্পের শুরুতে সুধা ও পরেশের মধ্যে বাড়ি ভাড়াকে কেন্দ্র করে কথান্তর হয়। আর এই প্রসঙ্গে ক্রমে উঠে আসে সুধা দুটো ঘর নয়, একটা ঘরই চায়। এর পেছনে কারণ ছিল ঐ দুটো ঘরের মধ্যে একটি ঘর পরেশের – একই সঙ্গে অফিস ও রিহার্সাল রুম। কাজেই সুধা এই ঘর যেমন চায় না তেমন স্বামীর এই পেশাকেও সে আর পছন্দ করে না। তবে পরেশের কাছে এ শুধু জীবিকা নয়, তার মুক্তির সোপান ও বাইরে বের হওয়ার ছাড়পত্র স্বরূপ। তাই সে কখনোই তা পরিত্যাগ করতে পারবে না। অপরদিকে এই জীবিকার উপরেই পরিবারের সকলকে

নির্ভর হয়ে থাকতে হয়। তাই অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুধা স্বামীকে বাইরে পাঠাতে বাধ্য হয়। ফলে এই পর্যায়ে একদিকে হৃদয়ানুভূতি অপরদিকে প্রয়োজনের টানাপোড়েন-ই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব সুধার মনোলোক ক্ষতবিক্ষত হয়। কাহিনীর শেষে দেখা যায়, বাইরে যাওয়ার আগে সুধা স্বামীর গায়ে একটি কবচ স্পর্শ করায়। এর মাহাত্ম্য হল – শাঁখা সিঁদুর নিয়ে এই কবচ হাতে করে যে প্রথম স্পর্শ করবে পুরুষটি চিরকালের জন্য তারই থাকবে। এখানেই নারী মনস্তত্ত্বের একটি গভীর দিক প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একজন নারী ও স্ত্রী হিসাবে এ তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেক নারী-পুরুষই চায় তার প্রিয় মানুষটি কেবলমাত্র তারই থাকুক। এর পিছনে মনের তীব্র অধিকারবোধই কাজ করে। সেই সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের নিগূঢ় প্রকৃতিটিও উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

এইভাবে আলোচ্য গল্পে দু'জন দম্পতির জীবনে ছোট-বড় সুখ-দুঃখের ঢেউ উত্থিত হতে থাকে। যার প্রভাবে তাদের সম্পর্কও ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখ গ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে চলে।

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কের আর একটি গল্প হল **'দম্পতি'**। এটি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের নামকরণেই আমরা অনুমান করতে পারি কোন জায়া ও পতির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক-ই এখানে মুখ্য বিষয়। এর পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি বিভিন্ন বিষয় ও পরিস্থিতি দাম্পত্য সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। আলোচ্য গল্পেও আর একটি ভিন্ন দিক উঠে এসেছে, যা এই অধ্যায়ের আলোচনার ধারাকে বৈচিত্রপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করবে। শারীরিক গঠনগত পার্থক্য গল্পে প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলা যায় – শারীরিক দৈর্ঘ্য বা উচ্চতার পার্থক্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে কীভাবে ত্বরান্বিত করে তারই একটি দিক প্রতিফলিত হয়েছে এই 'দম্পতি' গল্পে।

গল্পে পুরুষ চরিত্র উৎপল সোম সাড়ে চার ফুট দৈর্ঘ্যের অধিকারী, অপরদিকে নারী চরিত্র সর্বাণী চাটুজ্যের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুট। তাদের এই অসামঞ্জস্য পরিণয়-সূত্রকে কেন্দ্র করে যে সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা গল্পের শুরুতেই পাওয়া যায়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বন্ধুমহলে কেউ বিস্ময় জানায়, কেউ পরিহাস করে, কেউ বিরক্ত হয়। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাণীর চরিত্র সম্পর্কে একটি দিক উঠে আসে; তা হল – তার খেয়ালি স্বভাব। অর্থাৎ সে আপন খেয়ালে চলতেই অভ্যস্ত। তার প্রমাণ স্বরূপ এই বিবাহ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মানুষের মতামতকে তুলে ধরা যেতে পারে। যেখানে অনেকেই বলল – "এ হল সর্বাণীর একটা স্টান্ট।"[২৫৯] আবার কেউ

কেউ বলল - "আসলে বিয়েতে ওর বিশ্বাস নেই তাই বিয়ে নিয়ে এত বড় কৌতুক ও করতে পারল।"[২৬০] দেখা যায় – সর্বাণী পরিবারের নিষেধ উপেক্ষা করে এই বিবাহ করে। এক্ষেত্রে উৎপলকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবার পিছনে সর্বাণীর মনে দুটি বিষয় কাজ করেছিল – এক; উৎপলের গুণ ও হৃদয় মাহাত্ম্যের প্রতি মুগ্ধতা। দুই; তার শারীরিক দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে সর্বাণীর মনে গভীর সহানুভূতির জাগরণ। এই দুটি বিষয় ধরা পড়ে এইভাবে – সর্বাণী তার বাবার এক প্রশ্নের উত্তরে জানায় –"....লোকের মতামত আর চোখের রায়টাও সব নয় বাবা। উৎপলের চেহারাটা আমি না হয় ম্যাগনিফাইং গ্লাসের হেল্প নিয়ে দেখব। কিন্তু ওর গুণগুলি দেখবার জন্য কোন গ্লাসেরই দরকার হবে না।"[২৬১] অপরদিকে কাহিনী বর্ণনায় উন্মোচিত হয় –"শুধু পাণ্ডিত্য আর বাগ্মিতার শক্তিই নয়, খর্বকার উৎপলের শারীরিক দুর্বলতাও সর্বাণীকে একদিন অভিভূত করেছিল। এক আধা রাজনৈতিক বক্তৃতা সভায় বিরোধীদলের কয়েকজন লম্বা চওড়া লোক উৎপলের ওপর যখন চড়, ঘুষি চালিয়েছিল, সর্বাণী সত্যিই সিংহিনীর মতো গিয়ে পড়েছিল তাদের মাঝখানে। চিৎকার করে বলেছিল, আপনাদের একটুও লজ্জা নেই ? যুক্তির জোরে আঁটতে না পেরে হাত চালিয়েছেন ? অমন একজন মানুষের গায়ে হাত তুলতে আপনাদের সংকোচ হয় না ?"[২৬২]

অন্যদিকে উৎপল বিবিধ গুণের অধিকারী। ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে সে। বক্তৃতায় বিতর্কে সারা বিশ্বাবিদ্যালয়ে তার জুড়ি নেই। আর্থ-সমাজনীতির মূল সমস্যাগুলি নিয়ে যে সব আলোচনা তার কলমের মুখ থেকে দেশী-বিদেশী সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে পড়ে চিন্তাশীলদের কাছে তার আদর যথেষ্ট থাকলেও আকারে খর্বতার দরুণ প্রফেসর হিসাবে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সে বারবার অমনোনীত হয়েছে। তাই সে বাধ্য হয়েই ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অফিসে চাকরি নিয়েছে। অর্থাৎ নিজ দুর্বলতা সম্পর্কে সে সচেতন ছিল। তাই উৎপল সর্বাণীকে যখন প্রথম দেখে তখন তার রূপে নয়, উচ্চতায় মুগ্ধ হয়েছিল। সে কথা উৎপল বিয়ের পর স্ত্রীর কাছে স্বীকার করে – সর্বাণী স্বামীর কাছে জানতে চায় –"তবু সত্যি করে বল, আমার চোখ মুখ বিদ্যাবুদ্ধি নয়, আমার দীর্ঘতাই তোমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয়েছিল ?" তখন তার উত্তরে উৎপল জানায় –"একথা আমাকে দিয়ে বারবার কেন স্বীকার করিয়ে নিতে চাও সর্বাণী ? মানুষ নিজের মধ্যে যার অভাব টের পায় অন্যের মধ্যে তাই দেখে মুগ্ধ হবে এই তো স্বাভাবিক।"[২৬৩] আসলে এই অভাব বোধই উৎপলকে মনে মনে হীন করে। এবং সে উপলব্ধি করে সর্বাণীও সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে তাকে বিয়ে করেছে। অর্থাৎ তার

শারীরিক দুর্বলতাকে স্ত্রী করুণার চোখে দেখে। উৎপলের এই অনুভব তার উক্তির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় –"তোমার সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করতে চাইনে। তুমি যে রূপের দিকে তাকাওনি তা তুমি জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছ। কিন্তু সাধারণ মেয়েরা আরও পাঁচজন পুরুষের মতোই। তারাও রূপে ভোলে, রূপ দিয়ে ভোলায়।"[২৬৪] এই মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উৎপল জানে নারীরাও রূপে ভোলে, আর পাঁচটা সাধারণ নারীর থেকে সর্বাণীও ব্যতিক্রম নয়। তারও রূপে ভুলবারই কথা। কিন্তু সে এখানে অন্য যুক্তি দেখিয়েছে। সর্বাণীর এই সত্য গোপন করবার প্রয়াস উৎপলের মনকে আহত করে। অর্থাৎ তা আসলে উৎপলের রূপহীনতাকেই পরোক্ষভাবে জানান দেয়, যা উৎপল স্পষ্টভাবে অনুভব করে। ফলে তার মনের কোণে একটি সূক্ষ্ম দুর্বলতা থেকেই যায়। অপরদিকে সর্বাণীর এই বিবাহকে কেন্দ্র করে তার ত্যাগের মহিমা সমাজের মুখে মুখে আলোচিত হয়। আর এই সংবাদ উৎপলের এই দুর্বল মনকে যে আরও প্রভাবিত করবে, বলা যায় আরও বিকৃত করবে, এটাই স্বাভাবিক।

যাই হোক, উভয়েই মনের চাওয়া-পাওয়া ও খামতিকে সঙ্গী করে তাদের নতুন জীবন সাজিয়ে তোলে। সেখানে দেখা যায়, সর্বাণী নব উদ্যমে সংসারধর্ম পালন করতে থাকে। স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খুবই দৃষ্টি রাখে। শুধু তাই নয় স্বামীর পছন্দের খাবার সর্বাণী নিজের হাতেই রেঁধে খাওয়ায়। তবে উৎপলের দুটি আচরণ মনে অস্বস্তি বাড়ায়। প্রথমত – সর্বাণীর সাজানো-গুছানো টেবিলে উৎপল বসে পড়ে, ফলে টেবিলে রাখা জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে যায়। তাতে সর্বাণীর মনে হয় অতটুকু মানুষ অথচ এত চঞ্চল। এই বিস্ময় স্বামীর কাছেও সে প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত – সর্বাণীর অভিযোগ রাতে স্বামী তার পাশে শুয়েও বালিশ ছেড়ে সরসর করে নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে। তার ফলে সর্বাণী ওকে বুকের কাছে পায় না হাঁটুর কাছে পায়। তাতে সে বিরক্ত হয়ে বলে –"একি কাণ্ড, একি বিশ্রী ধরণের অভ্যেস তোমার। ওভাবে মানুষ শোয় ?" এর উত্তরে উৎপল হেসে জানায় –"আমাকে শক্ত করে বেঁধে রাখ সর্বাণী, যাতে আর সরতে না পারি, নড়তে না পারি।" প্রত্যুত্তরে সর্বাণী বলে –"বেঁধে রাখবার পালা বুঝি কেবল আমার ?"[২৬৫] অর্থাৎ একজন স্ত্রী হিসাবে সর্বাণী চায় তার স্বামী তাকে আদর-সোহাগ করে বুকে জড়িয়ে রাখবে। নারী সাধারণত পুরুষের কাছে এইভাবে ধরা দিতে চায়। এমন আত্মসমর্পণেই তাদের পরিতৃপ্তি। অপরদিকে পুরুষের তাতে পৌরুষত্ব ও প্রাধান্য বজায় থাকে। কিন্তু আলোচ্য গল্পের নায়িকা তা থেকে বঞ্চিত। তবে সময়ের তালে তালে সর্বাণী তা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

উৎপল ও সর্বাণী যখন একাত্ম হয়ে থাকে তখন উচ্চতার পার্থক্য তাদের মনে না থাকলেও বাইরের মানুষের হাসি-ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বার বার তা মনে করিয়ে দেয়। আর তাতেই উৎপল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সর্বাণী স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। কিন্তু উৎপল আরও গম্ভীর হয়ে যায়। তার মনে হয়, তার এই ক্রোধ হয়তো সর্বাণীকেও হাসায়। এই আত্মোপলব্ধি থেকে উৎপল স্ত্রীর সঙ্গে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দেয়। দেখা যায়, সর্বাণীও স্বামীর এই বুদ্ধি বিবেচনায় স্বস্তি বোধ করে। সকলের কৌতুক দৃষ্টি ও হাসাহাসির উপলক্ষ হতে তারও সবসময় ভালো লাগে না। আসলে বাইরের মানুষের প্রতিক্রিয়া সর্বাণীর মনকেও প্রভাবিত করেছিল। স্বামীর সঙ্গে বের হতে সেও লজ্জা পেত। তাই স্বামীর এমন সিদ্ধান্তে সে মনে মনে খুশিই হয়। এমত পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে তৃতীয় একটি চরিত্রের আগমন ঘটে। যার শারীরিক কাঠামো উৎপলের ঠিক বিপরীত আদলে গড়া। অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তি প্রভাস রায় যেমন সুদর্শন তেমন উন্নত দর্শন। সে পুরো ছয় ফুট উচ্চতার অধিকারী। আলোচ্য গল্পে উৎপল-সর্বাণীর দাম্পত্য জীবনের এমন পর্যায়ে এরকম একজন চরিত্রকে লেখক যে তাঁর টার্গেটকে ফলপ্রসূ করতে সংযোজন করেছেন তা আমরা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করতে পারি। আসলে প্রধান দুটি চরিত্রের মধ্যে এই নবাগত চরিত্রটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে। সে যে উৎপলের হীন মানসিকতা ও দুর্বলতাকে আরও ত্বরান্বিত করবে তা খুব স্বাভাবিক। তাই দেখা যায়, পুরনো বন্ধু হিসাবে উৎপল ও সর্বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে প্রভাস ঠাট্টার সুরে বলে –"হ্যালো। বামন হয়ে তাহলে সত্যিই চাঁদে হাত দিয়েছ। শুধু হাত দেওয়া নয় একেবারে আকাশ থেকে উপরে ছিনিয়ে এনেছ। তোমাকে এক মুখে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে তৃপ্তি পাব না, পাঁচখানা মুখ দরকার।"[২৬৬] আবার কখনো তিনজনে মার্কেটিং-এ বেরিয়ে উৎপলকে পেছনে ফেলে সর্বাণী ও প্রভাস এগিয়ে গেলে প্রভাসই হেসে বলে –"দৌড়াও দৌড়াও। মনে কর তোমার বউকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, তাহলেই পায়ে জোর আসবে।"[২৬৭] এগুলি বন্ধু হিসাবে প্রভাসের সহজ-সরল ঠাট্টা। কিন্তু উৎপল তা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তার মনে হয় প্রভাস ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাকে আঘাত করছে।

কাজেই উৎপল প্রভাসের প্রতি প্রবল ক্রুদ্ধ হয়। সর্বাণী ও প্রভাসের মেলামেশা যত বাড়তে থাকে এর সমান্তরালে উৎপলের ক্ষোভ তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে যেমন যায়, তেমনি পাড়ায় স্টুডিওতে উৎপলকে টেনে আনে। প্রভাসও সঙ্গে থাকে। তিনজনের গ্রুপ ফটো তোলা হয়, এছাড়া নানারকম কম্বিনেশনেও ফটো তোলে তারা। এক্ষেত্রে প্রভাস ও সর্বাণীর ছবিটি সবচেয়ে ভালো ওঠায় স্টুডিওর মালিক সেখানা রাখবার আগ্রহ জানায়। আর

তাতে উৎপলের মনে ঈর্ষার খোঁচা লাগে। সর্বাণীর প্রতিও উৎপলের অভিমান জন্মে। তার মনে হয় স্ত্রী হয়েও সর্বাণী প্রভাসের হাসি-ঠাট্টাকে প্রশ্রয় দেয়। তাতে যে উৎপল আঘাত পায় তা সে উপলব্ধি করতে চায় না এবং প্রভাসকে প্রতিহতও করে না বরং সে নিজেও সেই কৌতুকে যোগ দেয়। উৎপলের মনের এই দুই অনুভূতি অর্থাৎ ঈর্ষা-ক্ষোভ ও অভিমানের টানাপোড়েনে তার মন ক্রমশ সংক্রমিত হয়ে পড়ে। সেই বিকৃত মনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উৎপল প্রভাস আর সর্বাণীর ফটোটা দেখিয়ে বলে –"এখানা একেবারে বাঁধিয়ে রাখলেই পারতে। ....মনের ফ্রেমে তো অনেক আগেই বাঁধিয়েছ, এবার সোনার ফ্রেমে বাঁধানো বাকি।"[২৬৮] এর উত্তরে সর্বাণী বলে –"ছি ছি, তুমি কি আরম্ভ করলে শুনি ? তোমার দেহটাই ছোট এতদিন তাই জেনেছি। মনটা যে আরও ছোট তা জানা ছিল না।"[২৬৯] এছাড়া আমরা দেখি – সর্বাণী ও প্রভাসের থিয়েটার-সিনেমায় যাওয়া নিয়ে শহরের লোকেরা বলাবলি করছে; এই সংবাদ উৎপল বিদ্রূপের সঙ্গে স্ত্রীকে জানায়। তার প্রতিক্রিয়ায় সর্বাণী জানায় –"শহরের লোকের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। বলছে তোমার নিজের মন। সেই চাকেই হাজার ভীমরুল বাসা বেঁধেছে।"[২৭০] এর প্রতি উত্তরে উৎপল বলে –"ভীমরুল! আর মৌমাছির গুণগুণানি বুঝি আর একজনের মনের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছ ?" সর্বাণী অধীর হয়ে বলে –"তুমি একটি সত্যিই ছোটলোক।"[২৭১]

স্বামী-স্ত্রীর এই পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্কের গোপন সত্যটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। দুজনেই পরস্পরকে যেন নতুন ভাবে প্রত্যক্ষ করে। আসলে প্রভাস ও সর্বাণীর দিক থেকে তাই। কিন্তু এই পর্যায়ের উৎপলের মানসিক অবস্থা সেই সাধারণ বন্ধুত্বকে সহজভাবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। সর্বাণীও অনুভব করে স্বামী তাকে সন্দেহের চোখেই দেখছে। অপরদিকে একথা প্রভাস সর্বাণীর কাছ থেকে জানতে পেরে উৎপলকে সরাসরিই জিজ্ঞাসা করে। শুধু তাই নয়, এই দুজন স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে প্রভাস আরও নানারকম হাসি-ঠাট্টা করে। এই হাস্যকৌতুকে উৎপলের মন থেকে সমস্ত সন্দেহের বিষ ধুয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যায়, তার পরিবর্তে তীব্র বিষাক্ত এক অপমানের জ্বালায় উৎপলের সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। এই মুহূর্তে তার যে মনের ভাবটি তা উঠে আসে এইভাবে –"দেখতে পূর্ণাকৃতির পুরুষ নয় বলে ওরা তাকে এমনই তুচ্ছ করে যে তার ঈর্ষাকে পর্যন্ত আমল দেয় না, তার ক্রোধ পর্যন্ত ওদের কৌতুকের জোগান দেয়। এর চেয়ে তার সন্দেহ সত্য হলে যেন শান্তি পেত উৎপল। ওরা ভয় পেলে, অপরাধ স্বীকার করলে যেন সম্মান বাড়ত। কিন্তু তার এই অস্বাভাবিক খর্বতা কারও কাছে কিছুমাত্র ভয়ঙ্কর হবার শক্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। অথচ এই খর্বতা তার মোটেই

ইচ্ছাকৃত নয়। প্রকৃতি তাকে নিজের খেয়ালের পুতুল করে রেখেছে। হাজার চেষ্টা করেও সে এই খেয়ালের হাত থেকে মুক্তি পাবে না।"[২৭২] এই যন্ত্রণায় উৎপল যত ক্লিষ্ট হয়েছে, প্রভাসের প্রতি তার বিদ্বেষের উগ্রতা তত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার মনে হয়েছে প্রভাসকে সে যদি শারীরিক আঘাত করতে পারত তাহলে হয়ত খানিকটা স্বস্তি পেত। আবার পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে –"কিন্তু ঘুষি খেয়ে আরও হয়তো হাসত প্রভাস, বলত পুষ্পবৃষ্টি। আর এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বাণী নিশ্চয়ই হেসে গড়িয়ে পড়ত। কে জানে সর্বাণী হয়তো জীবনভর অমন হাসতে পারবার জন্যই তাকে ভালোবেসেছে।"[২৭৩] অর্থাৎ এই মুহূর্তে স্ত্রীর প্রতি উৎপলের সমস্ত মন তীব্র বিতৃষ্ণায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, এত রাতে বাইরে না যেতে সর্বাণী অনুরোধ করলেও উৎপল তা উপেক্ষা করে হনহন করে বেরিয়ে যায়। এ স্তরে স্ত্রী সম্পর্কে স্বামী উৎপলের মনোভাব ধরা পড়ে এইভাবে –"এই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটার ওপর এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্র মমতাও যেন আর নেই। সারা সন্ধ্যাটা বন্ধুরূপী প্রভাস যখন উৎপলকে নাস্তানাবুদ করেছে তখন সর্বাণী তার স্ত্রী হয়েও কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখায়নি। চটুল কৌতুক ছাড়া সর্বাণীর মনে তখন দ্বিতীয় কোন বোধের অস্তিত্ব ছিল না। উৎপলের মনে হল শুধু আজ নয় আজীবন এই চলবে। সব বিষয়ে ছোট হয়েও সর্বাণী তার চেয়ে ইঞ্চি কয়েকের বড় এই অহঙ্কার সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। আর স্বামীকে সে মাঝে মাঝে যতই ভালোবাসুক বেড়াবার সঙ্গী হিসাবে সে চিরকাল একজন দীর্ঘাঙ্গী পুরুষকে পছন্দ করবে।"[২৭৪] অর্থাৎ এ বোধ উৎপলের চরম অবনমিত সত্তার অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত। যা থেকে পরম আক্রোশ আর বিদ্বেষের সঙ্গে তার মনে স্ত্রীর প্রতি শোধ নেবার একটি প্রশ্ন জাগে –"এই শহরে বেঁটে উৎপলের চেয়েও মাথায় ছোট স্ত্রীলোকের কি একান্তই অভাব ?"[২৭৫] এ প্রশ্ন জীবনের সুস্থ-স্বাভাবিকতাকে না পাওয়ার প্রশ্ন। তা শুধুমাত্র মানবিকতাকে লুপ্ত করে না একটি ভগ্নপ্রায় সম্পর্ককে আরও অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে দেয়।

সাধারণত দেখা যায় দু'জন নর-নারী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা পড়লে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এক বিশেষ অনুভূতির জাগরণ ঘটে। বলা যায় এই অনুভবই তাদের সম্পর্কের মূলধন, ও সম্পর্কের অস্তিত্বের প্রধান চাবিকাঠি। অর্থাৎ সম্পর্ককে সজীব রাখতে সাহায্য করে এই বিশেষ অনুভূতি-ই। আর একে কেন্দ্র করেই পরস্পরের প্রতি গভীর অধিকারবোধ জন্ম নেয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয় – যে আবেগ বা ভাব জাগ্রত হয় তার তীব্রতা সময়ের তালে তালে বিস্তার লাভ করে। বিষয়টি উদাহরণ যোগে স্পষ্ট করা যেতে পারে – কোন পুকুরের

জলে যদি ঢিল ছোঁড়া হয় তাহলে দেখা যায়, জলের তরঙ্গ কেন্দ্র থেকে ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে পাড়ে গিয়ে মেশে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের তুলনায় পাড়ের জলের তরঙ্গের তীব্রতা কম থাকে। দাম্পত্য সম্পর্কে দু'জন মানুষের হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসাও সময় পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটেই ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। তবে তার অস্তিত্ব আড়ালে বা সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। এমত পরিস্থিতিতে হয়তো সেভাবে একে অনুভব করা যায় না। কিন্তু জীবনের চরম মুহূর্তে তার অবস্থান পুনরায় অনুভূত হয়। ফলে সম্পর্ক ভাঙ্গনের হাত ধরেই আবার নতুন ভাবে গড়ে ওঠে। এই ভাবেই নানা অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে এই দাম্পত্য সম্পর্ক এগিয়ে চলে। ফলে সেখানে ছোট ছোট সুখ দুঃখের ঢেউ যে আবর্তিত হবে তা খুব স্বাভাবিক। এই চিত্রই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। তবে আমরা জানি, প্রত্যেকটি জীবন আলাদা আলাদা। সেখানে অবস্থানকারী মানুষের মানসিকতা, জীবনবোধ পৃথক পৃথক; কাজেই তাদের জীবনের পরিস্থিতি ও পরিণতিও ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। সে যাই হোক, বর্তমানে আমাদের লক্ষ সহজ দাম্পত্য সম্পর্ক। তাই সাধারণ দাম্পত্য জীবনের অন্তর্গত মানব-মানবীর সম্পর্কের স্বাভাবিক উত্থান-পতনের চিত্র যে গল্পগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে তারই কয়েকটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

প্রথমে আসা যাক **'বিবাহ বার্ষিকী'** গল্পে। এই গল্পটি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্গত দু'জন নর-নারীর চাওয়া-পাওয়াকে কেন্দ্র করে এই গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনীর অগ্রগমনের সমান্তরালে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের রূপ-প্রকৃতিও উদ্ভাসিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র হল – বিকাশ ও নন্দা। এই দু'জন দম্পতি দীর্ঘ নয় বছর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করবার পর দশম বছরে পদার্পণ করেছে। আর এই বছরটিকে একটু বিশেষভাবে পালন করতে চায় স্ত্রী নন্দা। এরকম একটি পর্যায়ে গল্পের সূচনা হয়। দেখা যায়, নন্দা তার বন্ধু-বান্ধবদের দেখেছে – তারা তাদের বিবাহ বার্ষিকী নানা ভাবে উদ্‌যাপন করে থাকে। আর তা থেকে তার মনেও একরকম ইচ্ছা জাগ্রত হয়। কিন্তু তাতে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অর্থসংকট। তাদের মত পরিবারে যেখানে বাড়িভাড়া, দোকানপাট, মাসকাবারি, ছেলেমেয়ের খোরাক-পোষাক সর্বোপরি ডিসপেনসারির ওষুধের বিল মেটাতে গিয়ে যথারীতি হিমশিম খেতে হয়, সেখানে বিবাহ বার্ষিকী পালন করা বিলাসিতার সমান। তবুও বিকাশ কয়েকবছর এই দিনটিতে স্ত্রীকে কবিতার বই ও ফুল উপহার দিয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই নানারকম

প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী স্বামীর কাছে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর তাতে মন চাইলেও বিকাশ তার আর্থিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে ঠাট্টার সুরে তাদের 'বিবাহ শতবার্ষিকী' পালন করবার প্রস্তাব স্ত্রীর কাছে রাখে। এতে নন্দা স্বামীর প্রতি ছদ্ম ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায় –"কষ্ট করে তোমাকে এতদিন অপেক্ষা করতে হবে না। আমার যা স্বাস্থ্য তাতে দু'চার বছরের মধ্যেই আমি তোমাকে রেহাই দিয়ে যেতে পারব। তখন ঘটা করে দ্বিতীয় পক্ষ করো।"[২৭৬] স্ত্রীর কথায় বিকাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীরভাবে জবাব দেয় –"অত তাড়াতাড়ি কি আর সে ব্যবস্থা করতে পারব ? তার আগে একটা তাজমহল তৈরীর ব্যয় আছে না?" আর এই কথায় নন্দা স্বামীর প্রতি রাগ করতে করতেও হেসে ফেলে বলে –"ঈস্ আমার কী এক শাহজাহান রে।"[২৭৭] যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বিকাশ স্ত্রীকে একখানা দামী শাড়ি কিনে দেবার কথা স্বীকার করে। আর তাতে নন্দা উৎসাহিত হয়ে জানতে চায় –'কী শাড়ি দেবে, বেণারসী?' এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে নন্দা হেসে পুনরায় জবাব দেয় –"ভয় নেই গো, ভয় নেই। তোমার কাছে সত্যি সত্যিই বেণারসী চাইব না, সিল্ক-জর্জেটও চাইব না। তাঁত দাও মিল দাও – যা তুমি হাতে তুলে দেবে তাই আমার ঢের। তবে হাসিমুখে দিতে হবে কিন্তু। সব টাকা একখানা শাড়িতে ব্যয় করে বসব এমন বে-আক্কেল আমি নই।"[২৭৮] স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার গভীর আন্তরিকতার দিকটি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়।

দেখা যায়, এই কয়েক বছরের যৌথ জীবন-যাপনে তারা পরস্পরকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই তারা দু'জনের সহায়তায় পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। সেই কারণেই নন্দা জানায় – তার দামী শাড়ির প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র স্বামী ভালোবেসে মন থেকে নিজের হাতে তুলে দিলেই সে খুশি। এই যে ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করা এবং স্বামী হিসাবে বিকাশের তা উপলব্ধি করবার মধ্য দিয়ে তাদের উভয়ের প্রতি নির্ভরশীলতার দিকটি উঠে আসে। অর্থাৎ দুটি মানুষ পরস্পরের কাছে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। দু'জনকে কেন্দ্র করেই তারা বেঁচে আছে। এখানে তাদের সম্পর্কের মধুরতা পাঠকবর্গকেও মুগ্ধ করে। দেখা যায়, অর্থ-জোর স্বল্প হলেও নন্দার কল্পনা শক্তি অনেক বেশি। সে সারা মাস নানা রকম পরিকল্পনা করতে থাকে – কি দিয়ে কি করলে ভালো হয় এবং সেই কল্পনাকে যখন সে বাস্তবে অর্থাৎ স্বামীর কাছে উপস্থাপিত করে তখন তা সংক্ষিপ্ত করতে হয়। তবে নব উদ্যমে পুনরায় সে অন্যভাবে পরিকল্পনা করতে শুরু করে। একটা সময় স্থির হয় তারা ঐ দিন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে ফুল ধূপকাঠি কিনবে এবং রাত্রে এসে তারা তাদের পুরনো চিঠিপত্রগুলি আবার পড়বে।

সংসার জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয়তার কষাঘাতে প্রতিমুহূর্তে মানবিক অনুভূতি যেখানে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয় সেখানে দাঁড়িয়েও স্ত্রী নন্দার এই সজীবতা, উচ্ছ্বলতা বিকাশকে নব প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করে। মনে তার বিস্ময় জাগে। গতানুগতিক যান্ত্রিক জীবন যেন অন্য মাত্রায় বিকাশের কাছে ধরা দেয়। আর মনের আঙিনায় সে স্ত্রীকেও নতুন করে খুঁজে পায়। এই পরিস্থিতিতে তার হৃদয়ানুভূতি ধরা পড়ে এইভাবে –"বিয়ের দশ বছর পরে দুটি ছেলে-মেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও নন্দা যে এতখানি রোমান্টিক থেকে গেছে সে কথা জেনে বিকাশের বরং আনন্দই হয়, বিস্ময়ও নিতান্ত কম হয় না। মনের এতখানি সজীবতা ও রাখতে পারল কিভাবে ? নিশ্চয়ই সচ্ছল অবস্থার বান্ধবীদের কাছে সব গল্প শুনেছে, কি সৌখিন সমাজ নিয়ে লেখা নবেল-টবেল পড়ে হাতের কাছে অন্য কোন পুরুষকে না পেয়ে বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গেই আর একবার প্রেমে পড়বার, কি পড়ি পড়ি ভাব করবার সাধ হয়েছে নন্দার।"[২৭৯] অর্থাৎ স্ত্রীর আচার ব্যবহারে বিকাশের ভাবান্তর ঘটে। এবং সেই পরিবর্তিত ভাবনা থেকে সে স্ত্রীর মনের আশাকে সাধ্যমত পূর্ণ করবার সংকল্প নেয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন সম্বন্ধে নানা রকম কথাবার্তা ও পরিকল্পনার সময় তাদের বাড়ির ঝি সুখলতাও বর্তমান থাকে। সে নিম্নবিত্ত সমাজের একজন প্রতিনিধি। তার কাছে মনিবদের এমন অনুষ্ঠান পালন করা সৌখিনতা তথা বিলাসিতারই নামান্তর। সে এই সমস্ত আয়োজনের কথা শুনে জানায় – যে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে ঐ দিন। কাজেই তাকে এই বিয়েতে সাহায্য করতে হবে। তাতে দেখা যায় – নন্দা আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই সাহায্য করে। ঘটনাক্রমে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি উপস্থিত হয় এবং আমরা দেখি বিকাশ সেদিন স্ত্রীকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়, স্টুডিওতে গিয়ে যুগল ফটো তোলে, নাইট শোয়ের সিনেমার টিকিট কেনে, এমনকি, দোকানে ঢুকে পঁয়ত্রিশ টাকা দামের সিল্কের শাড়ি কিনে দেয়। নন্দা অপ্রত্যাশিত আনন্দে আপ্লুত হয়। প্রতিক্রিয়ায় সে লজ্জিত হয়ে বলে, – "কি করলে বলতো। শাড়ির জন্য আঠারো টাকার বেশি তো বরাদ্দ ছিল না" উত্তরে বিকাশ জানায় –"বরাদ্দ কথাটা বড় বেশি গদ্য ঘেঁষা, আধুনিক কবিতাতেও ওর ব্যবহার নেই। শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বল, পাড় জমিন।" নন্দা খুশি হয়ে বলে –"দুইই চমৎকার। আমার পছন্দের চেয়ে তোমার পছন্দ ঢের বেশি ভাল ..... কিন্তু আমি তো তোমাকে কিছু দিলাম না।" বিকাশ আবৃত্তির সুরে বলে –"গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়, তোমারা তো নেওয়ার ভিতর দিয়েই দাও।"[২৮০] এইভাবে পরস্পরে তারা আনন্দকে

ভাগ করে দিনটিকে কাটায়। রাতে নন্দা সেই শাড়ি পড়ে সিনেমায় যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে ঝি সুখলতার স্বামী এসে জানায় – শাড়ির অভাবে তার মেয়ের বিয়ে আটকে আছে। এই সংবাদে নন্দা প্রতিক্রিয়া জানায় –"শুনেছি। কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি। সুখলতা জানে আজ আমার শাড়ি আসবে, তাই ছলে বলে সেখানা আদায় করে নিতে এসেছে। ওরা ঠগ-জোচ্চোর-বদমাশ। আমি ওদের কথা একবিন্দু বিশ্বাস করিনা।"[২৮১] স্ত্রীর এমন ছোট মানসিকতায় বিকাশ আহত হয়, যা থেকে তার মনে একরকম ক্ষোভ জন্মায়। ফলে সে স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে –"ছিঃ নন্দা। মানুষকে অত ছোট ভেব না। তাতে নিজেই ছোট হয়ে যাবে। শাড়ির অভাবে একটি গরিবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, আর তুমি বুড়ো বয়সে জমকালো শাড়ি পড়ে সোহাগ করছ, আর ওদের গালাগাল দিচ্ছ, মজা মন্দ নয়।" স্বামীর এই কথার জবাবে নন্দা চিৎকার করে ওঠে –"চুপ, চুপ কর। তোমার দরদ যে কী জন্যে তা আর আমার টের পেতে বাকি নেই। আমি বুড়ি ? তুমি তো চিরযৌবনের দখলী স্বত্ব নিয়ে এসেছ, যাও তাই ভোগ কর গিয়ে। আমার কাছে আর তোমার আসতে হবে না।"[২৮২] দেখা যায় – এই কথা বলে নন্দা সুখলতার স্বামীর হাতে শাড়িখানা দিয়ে আরও নানারকম বিষয় তুলে স্বামীকে অভিযোগ করতে থাকে। আসলে এর মধ্য দিয়ে নন্দার অবনমিত মনেরই পরিচয় ফুটে ওঠে, যা স্বামী বিকাশের মনকেও আলোড়িত করে। মানবিকতার সঙ্গে অবনমনের লড়াই চলে। আর এর প্রতিক্রিয়া তাদের সম্পর্কের ধারায় তরঙ্গ সৃষ্টি করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখি খানিকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শেষ রাত্রে ঘুমন্ত স্ত্রীর বিষন্ন মুখখানি দেখে বিকাশের মায়া হয়, সহানুভূতি জাগে। অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি তার যে বিশেষ অনুভূতি তা সে পুনরায় এই মুহূর্তে ফিরে পায়। যার আবেগে বিকাশ নন্দার ভিজে চোখ ও ঠোঁট দুটিকে চুম্বনে চুম্বনে আরও সিক্ত করে তোলে। স্বামীর আদরে স্ত্রীর হীনতা দূরীভূত হয়। তার মনের উত্তরণ ঘটে। আর এই জাগ্রত মন থেকে সে ব্যথিত ও লজ্জিত হয়ে স্বামীকে জানায় –"আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ছোট, আমি হীন, আমি তোমার যোগ্য নই।"[২৮৩] স্ত্রীর এই আত্মোপলব্ধি স্বামীর বাহুবন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলে। তাদের সম্পর্কে উত্থিত তরঙ্গ ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে এবং পুনরায় তা পূর্বের স্থির অবস্থায় ফিরে আসে।

তাই গল্পের শেষে দেখা যায়, নন্দা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে অনুরোধ করে –"কাউকে যেন বল না, আমি শাড়িখানা ওদের রাগ করে দিয়েছি।"[২৮৪] দাম্পত্য জীবন কত বিচিত্র পথে চলে দুটো নর-নারীকে প্রেমের বহুরূপতাকে চেনায় তার নিদর্শনই এই গল্পটি।

দাম্পত্য সম্পর্কের আর একটি নতুন দিকের পরিচয় পাওয়া যায় **'একটি বিনিদ্র রজনী'**

গল্পে। এটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে প্রবল অর্থসংকটের প্রেক্ষাপটে দাঁড়ানো দুটি চরিত্রের জীবন তথা পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণ চিত্রিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের কাছে বেঁচে থাকাটাই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এক্ষেত্রে মানসিক অনুভূতিগুলো তখন গৌণ বলে মনে হয়। প্রয়োজনীয়তার তাড়নায় মানুষ ক্লান্ত হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই মন তার সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে অক্ষম হয়। আর তখনই চরিত্রগুলি পরস্পরের প্রতি মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত করতে থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদ প্রতিকূল পরিস্থিতি হল এই চরিত্রগুলির নিয়ন্ত্রক। এই নিয়ামকের দ্বারা চালিত হয়েই তারা নানারকম আচার-আচরণ করে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ্য দাম্পত্য সম্পর্কে অবস্থানকারী মানব-মানবীর মনে উভয়ের প্রতি তীব্র অধিকারবোধ থাকে। আর তা থেকেই তারা পরস্পরকে প্রবল আঘাত করে থাকে। আলোচ্য গল্পের স্বামী-স্ত্রীও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বামী যখন চরম অর্থাভাবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে তখন স্ত্রী তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীর আত্মসম্মান আহত হয় ফলে তাদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে। আর এই গতানুগতিক জীবনযন্ত্রণায় কাতর হয়ে স্বামী একদিন অফিস যাওয়ার পথে স্ত্রীকে অভিসম্পাত করে যে সে যেন মরে যায়। কাহিনী সূত্রে পাওয়া যায় প্রাথমিক অবস্থায় মানসিক অবস্থা একইরকম থাকলেও টিফিন কৌটায় স্ত্রীর হাতের পাঠানো রুটি-আলুভাজা দেখার পর স্বামীর মনের ভাবান্তর ঘটে। স্ত্রীর প্রতি তার বিশেষ হৃদয়াবেগ জাগ্রত হয়। যার মাধ্যমে একটি সত্তা বাহ্যিক প্রতিকূলতাকে ভুলে গিয়ে আর একটি সত্তাকে স্পর্শ করতে চায়। এই অনুভবেই স্বামী সেদিন শীঘ্রই বাড়ি ফিরতে চায়। এবং দেখা যায় অফিস থেকে আসার পথে সে স্ত্রীর জন্য এক শিশি আলতা নিয়ে আসে। এই বিষয়টির মধ্যে যে স্নিগ্ধ ভালোবাসা লুকিয়ে আছে তা আমরা পাঠকবর্গ সহজে অনু মান করতে পারি। কিন্তু ঘটনাক্রমে স্বামী বাড়ি এসে দেখে স্ত্রী ঘরে নেই। সে আর ফিরবে কিনা এই আশঙ্কা যত মনে জাগে স্বামী তত অনুশোচনায় ছটফট করতে থাকে। একসময় ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখে স্ত্রী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামী যেন তার হারানো ধন ফিরে পায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শ্রান্ত অথচ ভোর না হওয়া পর্যন্ত তারা দু'জনেই জেগে থাকে। আসলে এই ঘটনার মাধ্যমে তারা পরস্পরকে যেন নতুন করে খুঁজে পায়। যেখানে সমস্ত রকম প্রয়োজন ও অভাব অনটনকে অতিক্রম করে দুটি মন একাকার হয়ে যায়। তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক বাস্তব সংসারের ভাঙা-গড়ার খেলায় আলোড়িত হলেও তা ধ্বংস হয়ে যায় না। এ যে চিরন্তন-শাশ্বত তা বারবার নানা ভাবে তাদের কাছে ধরা দেয়।

অন্যের প্রতি ঈর্ষা তথা অপরের জীবনকে অনুকরণ করবার প্রবণতা দাম্পত্য সম্পর্ক কীভাবে আলোড়িত করে তারই একটি দিক উঠে এসেছে **'আঠারো আনা'** গল্পে। এই গল্পটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মানুষ যখন এক জীবনে প্রায় সবরকম সুখ পাওয়ার পরও তৃপ্ত হতে পারে না তখন সে বিষয়কে কখনো মনের 'আশা-প্রত্যাশা' বলা চলে না। তাকে লিপ্সা বা প্রবল লালসা বলে অভিহিত করতে হয়। আর এর প্রভাবে 'মন' কখনো সুস্থ অবস্থায় স্থির থাকতে পারে না। কাজেই চঞ্চল মন আরও উগ্র হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পের নায়িকা মীনাক্ষীর মধ্যে এই দিকটি পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, মীনাক্ষী তার বান্ধবী মানসীকে ঈর্ষা করে, শুধু তাই নয় তার জীবনশৈলীকেও সে অনুকরণ করতে চায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দুই বান্ধবীর মধ্যে সামাজিক শ্রেণীগত পার্থক্য আছে। মানসী উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে, সেখানে মীনাক্ষী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। তথাপি মানসী যখন নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে সেতারের গুরুর কাছে নিজেকে মেলে ধরে তখন তা মীনাক্ষীর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারও স্বাদ জাগে এইভাবে সেতার শিখবার। এবং তার মনের কথা সে বান্ধবীর কাছে ব্যক্তও করে। এক্ষেত্রে সেতার শেখা মুখ্য নয়। মানসীর মত একজন গুরুর কাছে মীনাক্ষীও নিজেকে উপস্থাপিত করতে চায়। ঘটনাক্রমে দেখা যায় মীনাক্ষীর মনের আশা পূর্ণ হয়। সে তার বান্ধবীর মধ্যস্থতায় ঐ একই গুরু অর্থাৎ সুনীল দত্তের কাছে সেতার শেখে। তবে নিজের বাড়িতে নয়, শিক্ষা গুরুর গৃহে। সেখানে মীনাক্ষী সকলের মধ্যে থেকেও সুনীল দত্তকে নানাভাবে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে তার মনোভাব শিল্পী সুনীল দত্ত উপলব্ধি করে। ফলে তিনি মীনাক্ষীকে ফিরিয়ে দেন। আর এই বিষয়ে মীনাক্ষী অপমানিত বোধ করে। ফলে মনের প্রবল জেদ থেকেই প্রতিজ্ঞা করে যে সে সেতার শিখবেই। আর এই পরিস্থিতিতেই সুনীল দত্তের বন্ধু চিন্ময়-এর আগমন ঘটে মীনাক্ষীর জীবনে। তাকে কেন্দ্র করেই মীনাক্ষী তার মনের সাধ পূর্ণ করে। তাই দেখা যায় – ".....মীনাক্ষী ঠিক মানসীর মতোই সেজে এসে সুরগুরুর কাছে বসতে লাগল। তারও শাড়িব্লাউজের রং বদলায়, সেতারের ঢাকনির রং বদলায়। চিন্ময় তা খুশি হয়ে লক্ষ করে, শুধু তার সুর সাধনার নয়প্রসাধনেও সুখ্যাতি করে। তার জন্যে আশাতীত বেশি সময় দেয়।"[২৮৫] অর্থাৎ মনের এই উদ্দেশ্য থাকায় মীনাক্ষীর সুরসাধনা পূর্ণতা লাভ না করলেও চিন্ময়ের সঙ্গে সে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে পেরেছিল। ফলে সে মনে করে, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মানসীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। এবং তার এই জয়ের বার্তা

পৌঁছোনোর জন্যই কিন্তু মীনাক্ষী মানসী ও সুনীল দত্তকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানায় বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্য। আর সে যে তাতে সফল হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এইভাবে –"দামী শাড়ি নিয়ে মানসী নিজে এসেছিল, হেসে বলেছিল, 'খুব খুশি হলাম ভাই। তুই আমার উপর টেক্কা দিয়েছিস।' খুব খুশি যে হয়েছে মানসীর মুখ দেখে কিন্ত তা মীনাক্ষীর মনে হয়নি, তার আর কথা শুনেও না।"[২৮৬] মানসীর এই অখুশি হওয়ার মধ্যেই মীনাক্ষীর আনন্দ লুকিয়ে ছিল।

অপরদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিন্ময়ও স্ত্রীর মানসিক অবস্থাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। সে জানে প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকের থেকে পৃথক। একজনের জীবনকে অন্যজন যতই অনুকরণ করুক না কেন সম্পূর্ণভাবে একরকম হওয়া সম্ভব নয়। এই মানসিকতা আসলে অসুস্থতারই নামান্তর। কাজেই চিন্ময় নিজে তুলনার পাত্র হতে চায় না, এমনকি, সে প্রতিযোগীও হতে চায় না। তবে সে স্ত্রীকে সবদিক থেকেই সুখী রাখবার চেষ্টা করে। তার শরীরের যত্ন নেয়, ছুটির সময় বিভিন্ন জায়গায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে যায়, মন দিয়ে সে সংসার করে, চাকরিতে পদোন্নতি করে, স্ত্রীকে আদর সোহাগে অস্থির করে তোলে। আর তা দেখেই মীনাক্ষীর মাসতুতো বা পিসতুতো বোনেরা প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে লেখে –"তোর সুখ দেখলে হিংসা হয়। মনের মতো বর পেয়েছিস বটে। একেবারে রামের মত স্বামী। চিন্ময়বাবুর মত বউ-প্রেমিক পুরুষ আজকাল আর দুটি মেলে না।"[২৮৭] মীনাক্ষীও যে তার বোনদের কথা স্বীকার করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এইভাবে –"চিন্ময় তাকে সত্যিই ভালোবাসে। তার হাতে পড়ে মীনাক্ষীর আজ আর কোনও দুঃখ নেই। আশাতীত সুখশান্তিতে আছে সে।"[২৮৮] শত সুখশান্তির মধ্যেও একটি বিষয় মীনাক্ষীর মনের অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে; তা হল – সে চায় সেতার বাদক হিসাবে স্বামীর যশ-খ্যাতি বৃদ্ধি পাক। কেননা, তাতে মীনাক্ষীর মান আরও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। একজনের গৌরবে দুজনের গৌরব হবে, একজনের সিদ্ধিতে দুজন সার্থক হবে। কিন্তু তার স্বামী এই বিষয়ে উদাসীন। যা সে সহ্য করতে পারে নি। তার মনের এই অশান্তি ও ক্ষোভ মানসী-সুনীল দত্তের প্রশংসা-খ্যাতির বিস্তৃতির সংবাদে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল।

ফলে সে ক্রমশ বিচলিত হয়ে ওঠে। তাই স্বামীকে অনুনয় করে বলে –"দেখ আমার ছিল শখ, কিন্তু তোমার তো সাধনার জিনিস, তুমি কেন ছেড়ে দিচ্ছ?" এর উত্তরে চিন্ময় হেসে জানায় –"সাধনার ধারাও তো বদলায়। আজ আমি সংসার ধর্মের সাধক।" এই কথায় স্ত্রী অধীর হয়ে বলে –"তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা। যারা সংসার করে, চাকরি-বাকরি করে, তারা বুঝি আর লেখে না ? আঁকে না ? গায় না, বাজায় না ? তারা বুঝি আর শিল্পী হয় না ?" প্রত্যুত্তরে স্বামী

জানায় –"হবে না কেন ? আধখানা হয়, সিকিখানা হয়। পুরোপুরি হওয়া শক্ত।"এর প্রক্রিয়া স্বরূপ মীনাক্ষী স্বামীকে অনুরোধ করে বলে –"তুমি অন্তত দু'আনি হও। আমি তাতেই খুশি হব। একেবারে কিছু না হওয়ার চেয়ে সেই দু'আনি হওয়াও ভাল।"[২৮৯] এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারি এ আসলে উচ্চাভিলাসী মনের জটিল হিসাব। তাই স্বামী চিন্ময় হেসে জবাব দেয় –"মানে ষোল আনা সংসার আর সেই সঙ্গে আরও দু'আনা সন্ন্যাস। মীনু অত লোভ কোর না, ষোল আনার ওপর আঠারো আনা চেয়ো না। তার চেয়ে আমরা যা আছি, তাই ভালো। সুরের বাঁধনের চেয়ে বিয়ের বাঁধন বেশি টেঁকসই, তা বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো নয়। তাতে সবরকম ভারই সয়।"[২৯০] চিন্ময়ের এই উক্তির পিছনে একটি বিশেষ কারণ ছিল, তা হল – মীনাক্ষী প্রাথমিক পর্যায়ে ভেবেছিল সে একজন বিখ্যাত সেতার বাদককে বিবাহ করে জীবনে ভীষণভাবে জয়ী হয়েছে। কিন্তু সে পরবর্তী সময়ে দেখে – মানসী ও সুনীল বিয়ে না করেও অসামান্য যশ-খ্যাতির অধিকারী হয়ে উঠছে। অথচ বিয়ের পর চিন্ময় নিজেকে সেতারে নতুন করে প্রমাণ করতে পারেনি। তাই মীনাক্ষীর মনে হয় তার হয়তো বিয়ে করা উচিৎ হয় নি। আর তাই এই ভাবনা থেকেই তার মনে প্রশ্ন জাগে –"তবে কোন কারণে ওরা একসঙ্গে ঘর বাঁধছে না, শুধু সেতারের সুর বেঁধে সুখে আছে ?"[২৯১] অর্থাৎ মানসীরাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছে। চিন্ময় স্ত্রীর এই মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কাজেই তারই পরিপ্রেক্ষিতে সে এই যুক্তি দিয়েছে। সে স্ত্রীকে বোঝাতে চেয়েছে অতিরিক্ত লোভ মানুষের শুভসত্তাকে বিনষ্ট করে। আর বৈবাহিক সম্পর্ক মানে একটি দৃঢ় বন্ধন যেখানে দুটি মানুষ পরস্পরের প্রতি গভীর ভাবে নির্ভরশীল। সেখানে পরস্পরকে উপলব্ধি করাটাই আসল। বস্তু প্রিয়তা জীবনের বাহ্যিক দিক। তা কখনোই মানবিক অনুভূতির উর্দ্ধে হতে পারে না। আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি বিশেষ সম্পর্ক যেখানে জীবনের সবরকম প্রতিকূলতা দু'জনের শক্তিতে জয় করা সম্ভব হয়। তাই সে বলেছে – 'আমরা যা আছি, তাই ভালো'। কিন্তু আমরা দেখি মীনাক্ষী স্বামীর কথার এই গভীর সত্যকে আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই গল্পের শেষে দেখা যায় এখনো তার দৃষ্টি রঙিন ঢাকনিতে ঢাকা একজোড়া সেতারের দিকে। অর্থাৎ মীনাক্ষীর মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। আর এর প্রভাব বারবার তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে যে আন্দোলিত করবে তা খুব স্বাভাবিক।

'গল্পমালা - ১' এ স্থানপ্রাপ্ত **'ঘাম'** গল্পটি ১৩৭০ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের তৃতীয় কোন ব্যক্তির আগমন বা সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ঘটনা নয়, সন্তানের অভাব একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানে আমরা সেই

নিয়ন্ত্রিত সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করব।

গল্পের নামকরণ হয়েছে 'ঘাম'। এবার আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে 'ঘাম' এর সঙ্গে মানব সম্পর্কের কি সম্বন্ধ ? গল্প বিশ্লেষণ করতে করতে আমরা এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজব। বিজন ও সুনন্দা শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন দু'জন দম্পতি। সন্তানের অভাব পূরণ করবার বিষয়ে তারা দু'জনে মিলে অসম্ভব-সম্ভব নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে। দু'জনেই পরস্পরে প্রমাণ করতে চায় এই অভাব তাদের জীবনে কোন গুরুত্ব রাখে না। তবে মনের কোণে উভয়েরই খামতি থেকে যায়। লক্ষণীয় বিষয় হল, তারা নানারকম জল্পনা-কল্পনা করলেও তার প্রয়োগ কেউ করেনি। বিজন কখনো দ্বিতীয়বার বিবাহ করার কথা ভাবেনি। সুনন্দারও মনে হয়েছে তারা দু'জনে মিলে যা চায় দু'জন মিলেই তা গড়তে চায়। কেননা, একজনের হলে তাতে দু 'জনের মন ভরবে না। উভয়ের এই মানসিকতার মধ্য দিয়ে পরস্পরের ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং সম্পর্কের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার দিকটি উঠে আসে। তারা দু'জনে সবসময় মানসিক ভাবে উভয়ের পাশে থাকবার চেষ্টা করেছে। তাই দেখা যায়, স্ত্রীর মন ভালো রাখবার জন্য বিজন তাকে সরকারী অফিসে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। অবসর যাপনের জন্য ঘরে রেডিও, গ্রামাফোনের ব্যবস্থা করেছে; সেই সঙ্গে বাংলা গল্প, উপন্যাসের যোগান দিয়েছে। গয়না উপহার দিয়েও স্ত্রীকে খুশি রাখতে চেয়েছে। কিন্তু লক্ষ করা যায়, বিজন তার নিঃসন্তান জীবনকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিলেও সুনন্দা সহজে মেনে নিতে পারেনি। কেননা, সে একজন নারী কাজেই মাতৃত্ব তার রক্তে বহমান। তাই সে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে পাশের অমূল্যবাবুর ফ্ল্যাটের দিকেই বার বার ছুটে যায়। তার সন্তানদের আদর-সোহাগ করে সুনন্দা মনের তৃষ্ণা কিছুটা মেটাতে চায়। আর এই বিষয়টিই বিজনের মনে ঈর্ষাবোধের জন্ম দেয়। কারণ তার মনে হয় তাদের জীবনের সবরকম সুখ-দুঃখ-আনন্দকে তারা দু'জনে মিলে ভাগ করে নেবে। কিন্তু এই আদর-সোহাগে শুধুমাত্র সুনন্দারই অংশ, সেখানে বিজনের কোন ভাগ নেই। এই মনোভাব তার মানসিকতাকে ধীরে ধীরে অবনমিত করে। ফলে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই বিকৃতমনের প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি কথোপকথনকে তুলে ধরা যেতে পারে –

বিজন বলে – "আমার কিছুই হয়নি। হঠাৎ তোমার মনেই একটু বেশি মাত্রায় বাৎসল্যের উদয় হয়েছে।"

উত্তরে একটু বাদে আস্তে আস্তে সুনন্দা বলে – "যদি হয়ে থাকে সেটা কি খুব দোষের? আমাদের যা বয়েস -"

বিজন বলে – "থাক থাক আর বয়েস বয়েস করো না। বয়েসের কথা কি তোমার সব সময় মনে থাকে ? বিশেষ করে বেশবাশ সাজ সজ্জার সময়!"

সুনন্দা ধৈর্য্য হারাতে বাধ্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে – "কেবল অমূল্যবাবুর ছেলে আর অমূল্যবাবুর ছেলে। ওরা হয়েছে তোমার দুচোখের বিষ। তোমার ভয়ে কোন একটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এঘরে ঢুকতে পারে না। তুমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকো আমি কাউকে ডাকিও না আনিও না। কিন্তু পাড়াশুদ্ধ লোক তোমাকে চেনে। তোমার এই কুচুটে স্বভাব নিয়ে বলাবলি করে। আমি লজ্জায় মরে যাই। আমাদের হয়নি হয়নি। তাই বলে বিশ্বশুদ্ধ লোক তোমার মত নিঃসন্তান হবে তুমি কি তাই চাও ?"

বিজন জানায় –"....কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি শোন; কথায় কথায় তুমি নিঃসন্তান তুমি নিঃসন্তান বলে খোঁচা দাও। তুমি কি জানো না ডাক্তার আমার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পায়নি ?"

সুনন্দা একটুকাল চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে উত্তর দেয় – "ডাক্তার কি আমার মধ্যেই কোন দোষ খুঁজে পেয়েছেন ? ডাক্তার যা যা করতে বলেছেন সবই তো আমাকে দিয়ে করিয়েছ ? দু-দু বার অপারেশন হয়েছে। আর কি করতে বল আমাকে ?"[২৯২] স্বামীর এই অভিযোগ সুনন্দাকে আহত করে। আর স্ত্রীর এই চোখের জল বিজনের সম্বিৎ ফেরাতে সাহায্য করে। মুহূর্তের ভাবাবেগ থেকে সে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ফলে আমরা তাকে তার আচার-ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হতে দেখি। এবং সময়ের ব্যবধানে দেখা যায় – বিজন স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে গভীর আবেগে তাকে কাছে টেনে নেয়। সুনন্দাও স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে গভীর অভিমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। এই ঘটনার পর তাদের যে পুনরায় মিলন ঘটে, তার মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্ক যেন প্রথম যৌবনের গাঢ় অনুরাগের ধারায় নব রূপে সিক্ত হয়। জীবনের এই স্তরে এসে দেখা যায়, সন্তানহীনতাকে কেন্দ্র করে দু'জন দম্পতির জীবনে ছোট ছোট সুখ দুঃখের ঢেউ উত্থিত হয়েছে। এই পর্যায়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পাওয়া যায়; তা হল – সুনন্দা যখন কোন শিশুকে আদর করতে গিয়েছে তখন তার সমস্ত শরীরে ঘামের ধারা বাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিজন অনুমান করেছে – যেহেতু সুনন্দা মাতৃত্ব লাভ করতে অক্ষম তাই তার বুক থেকে স্তন্যদুগ্ধ বেরোতে না পেরে তার পরিবর্তে অতি বাৎসল্যে তার সর্বাঙ্গ থেকে ঘামের ধারা নিঃসৃত হয়। এই বিষয়টি সুনন্দাও উপলব্ধি করেছে ও পুলকিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তার মনের ভাব বিজনের চোখে ধরা পড়ে এইভাবে – "এই অস্বাভাবিক ঘামকে যে সত্যিই আপদ কি রোগ

ব্যাধী বলে মনে করে সুনন্দা তা ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হল না। দুর্ভোগ নয় যন্ত্রণা নয় এই রোগের উপভোগ্যতাই ওর চোখের ভঙ্গিতে, মুখের হাসিতে, শরীরের প্রতিটি রোমকূপে অতি মাত্রায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।"[২৯৩]

এই বিষয়টিকে সামনে রেখে আমরা গল্পের দ্বিতীয় স্তরের পর্যালোচনায় যাব। দিনের আলোয় ঘটনাক্রমে উত্থিত মান-অভিমান রাতের অন্ধকারে পরস্পরের প্রেমানুভূতির স্পর্শে যখন বিলীন হয়েছে তারও অনেক পরে গভীর রাতে বিজন উপলব্ধি করেছে – সে স্ত্রীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ এবং সুনন্দার সমস্ত শরীর ঘামে স্নাত। এই অনুধাবন বিজনকে ব্যথিত করেছে। কারণ অর্ধচেতন অবস্থায় বিরাজমান স্ত্রী বিজনকে সন্তান স্নেহে তার বাহুপাশে আবদ্ধ করেছে। এখানে বাৎসল্য রসই মুখ্য। এই পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ছাপিয়ে আত্মজার অর্থাৎ সন্তান ও মায়ের সম্পর্কই স্থাপিত হয়ে যায়। আর সেই ক্ষণিক সময়ে নবগঠিত সম্পর্ক ঘোষিত হয় শরীর থেকে ঘাম নির্গমনের মাধ্যমে। আলোচ্য গল্পে এখানেই ঘামের সঙ্গে মানব সম্পর্কের সম্বন্ধ নিহিত। স্ত্রীর কাছে স্বামীর এই অবস্থান বা পরিণতিতে বিজনের মনে তীব্র যন্ত্রণা বয়ে আনে। তার পৌরুষত্বে আঘাত হানে। যা তাকে আত্মহীনতার বেদনায় নিমজ্জিত করে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিজনের হৃদয় যন্ত্রণা ধরা পড়েছে এইভাবে –"এরপর থেকে রোজই কি এমনি হবে ? যেহেতু স্ত্রীর কোলে সে একটি শিশু এনে দিতে পারেনি, স্ত্রীর কোলে অন্যের শিশু দেখলে শিশুর মত ঈর্ষায় জর্জর হয়েছে তাই কোন দিনই কি সে আর স্ত্রীর কাছে পুরুষের সম্মান, পুরুষের মর্যাদা পাবে না! বিজন কল্পনা করতে লাগল সুনন্দার আলিঙ্গনের মধ্যে সে যেন আকারে অবয়বে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর কোন দায় নেই, দায়িত্ব নেই, আশঙ্কা নেই, লজ্জা নেই, অনুতাপ নেই, গ্লানি নেই। রাত্রির অন্ধকারে গোপন সুড়ঙ্গ পথে বিজন আবার যেন সেই মধুর শৈশবে ফিরে গেছে।"[২৯৪]

স্ত্রীর কোলে একটি শিশু এনে দিতে ব্যর্থ হওয়া ও অন্যের শিশুকে দেখে শিশুর মত ঈর্ষায় জর্জরিত হওয়া আসলে পৌরুষত্ব হীনতারই নামান্তর। এই পরিস্থিতিতে এসেই বিজন প্রথমে তা অনুভব করে। আসলে সে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই শিশুসুলভ। এত দিন ধরে তার শরীরে ও মননে এই ভাবনা ছিল তার প্রমাণ আজ সে পেয়েছে। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বেদনাগ্রস্ত। তাই বিজন সুনন্দার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নেয়, তারপর অর্ধ কৌতুকে, অর্ধ বিদ্রূপে, অর্ধ যন্ত্রণায়, অর্ধ বেদনায় একটি অস্পষ্ট অস্ফুট ধ্বনিকে ঈষৎ স্ফুটতর করে তোলে –'মা, মা, মা'। বিজনের এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিজের প্রতি নিজের। লক্ষণীয় বিষয়,

বিজনের এই প্রতিক্রিয়ায় সুনন্দা ঘুমের মধ্যে মৃদু হেসে গাঢ় আলিঙ্গনে তাকে আরও বুকের কাছে টেনে নেয়। আর নিজের কাণ্ড দেখে বিজন নিজেই এবার ঘামতে থাকে। এই প্রথম বিজন ঘেমে ওঠে। আসলে অর্ধচেতন অবস্থায় স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া বিজনের পৌরুষে আঘাত হানে। আর এই আঘাতের মাধ্যমেই বিজনের পৌরুষত্বের জাগরণ ঘটে। জাগ্রত হয় ভিন্ন অনুভূতি। সেই অনুভূতি একজন নারীর প্রতি একজন পুরুষের যৌনানুভূতি। আর এই অনুভূতির চরম পর্যায়ে যখন বিজন উপস্থিত হয়েছে তখনই সে ঘেমে উঠেছে। এই ঘাম তার তীব্র যৌনানুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ । এবং বলা যায়, এই স্তরে বিজনের শরীর থেকে ঘাম নিঃসরণের মধ্য দিয়ে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পদার্পণ করল।

এবার হয়ত বিজন তার স্ত্রীর কোলে সন্তান এনে দিতে সক্ষম হবে। যার ফলে তাদের গতানুগতিক দাম্পত্য জীবন এক নতুন অভিমুখ খুঁজে পাবে। তারই ইঙ্গিত যেন ঘামের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমরা জানি শরীর থেকে ঘাম নির্গমনের বিষয়টি একটি শরীরিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তা কীভাবে একটি সম্পর্কের বিভিন্ন স্তরকে উন্মোচিত করবার চাবিকাঠি হতে পারে তারই একটি দৃষ্টান্ত হল এই গল্পটি, যা লেখকের দক্ষ শিল্প-শৈলীর স্মারকচিহ্ন।

এবার আসা যাক **'ভালোবাসা'** গল্পে। এখানে স্বভাবের বৈপরীত্য দু'জন স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দূরত্বকে ত্বরান্বিত করে। তার ফলস্বরূপ স্ত্রী পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত হয়। তার পরিণতিতে সে স্বামী-সন্তান ও সংসার পরিত্যাগ করে পরপুরুষের সঙ্গে চলে যায়। এক্ষেত্রেও সেই মোহের তাড়না বর্তমান। তবে কোন অনুভূতি যেমন স্থায়ী নয় তেমন নিরবচ্ছিন্ন মিলনও সবসময় তৃপ্তি দেয় না। তা পুনরাবৃত্তির ক্লান্তি আনে। তখন মনের ন্যায় বোধ সজাগ হয়। এই বোধের বশবর্তী হয়ে গল্পের স্ত্রী চরিত্র সুধা পুনরায় স্বামী ও সন্তানের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু পূর্বের মত স্বামী শৈলেন আর তাকে স্থান দেয়নি। তাকে এক আশ্রমে পাঠায় মন-শুদ্ধির উপলক্ষে। দেখা যায়, শেষ জীবনে স্বামীর চিঠির এক প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রী জানায় – জীবনে সে একজনকেই ভালোবেসেছে, সে পরপুরুষ। আসলে এটি স্ত্রীটির মনের গভীর অভিমানের কথা। কেননা, সে স্বামীকেই একমাত্র ভালোবেসেছিল তা উপলব্ধি করেছিল বলেই পুনরায় স্বামীর কাছে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এই সত্য প্রকাশ করবার সাহস ও পরিস্থিতি কোনটাই তার কাছে ছিল না। স্ত্রীর উত্তর যে ভুল অর্থাৎ পরপুরুষ নয় স্বামীই তার ভালোবাসা – একথা উপলব্ধি করে স্বামীর মনের পূর্ব অবস্থা পরিবর্তিত হয়। ফলে স্ত্রীর প্রতি তার সহানুভূতি জাগে। আর এই অনুভবই তাদের

সম্পর্কের একটি ইতিবাচক দিককে সূচিত করে। ধরে নেওয়া যায়, দ্বন্দ্ব সংশয়কে সঙ্গী করে তাদের সম্পর্ক আর এক খাতে বাহিত হতে থাকবে।

বৈচিত্র্যময় দাম্পত্য সম্পর্কের আর একটি উদাহরণ হিসাবে **'সুখ'** গল্পটিকে তুলে ধরা যেতে পারে। এটি ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে 'ঘরণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সুখ হল বিশেষ মানবিক অনুভূতি, যা প্রত্যেকটি মানুষের মনের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এক একজন মানুষ নিজের মত করে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। আর এই 'চাওয়া' যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন মানব মনে সুখানুভূতির সৃষ্টি হয়। তবে এক সুখ কখনো আর এক সুখের বিকল্প হতে পারে না। অর্থাৎ এক প্রাপ্তির সুখ আর এক না পাওয়ার দুঃখকে কখনো ভুলিয়ে দিতে পারে না। প্রত্যেকটি অনুভূতিরই পৃথক পৃথক অস্তিত্ব থাকে। মানব মনে সেগুলির গুরুত্ব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমান। এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবার জন্য আমরা আলোচ্য গল্পের কাহিনীতে প্রবেশ করব। গল্পে প্রধান তিনটি চরিত্র যথা স্বামী বিজন, স্ত্রী কেয়া ও তাদের বন্ধু প্রবাল। এই তিনজন মানুষকে কেন্দ্র করেই জীবন দর্শনের একটি গভীর দিক উঠে এসেছে, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মানব-সম্পর্ক বয়ে চলেছে। দেখা যায়, কেয়া প্রথম জীবনে প্রবালকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু পরিবারের অসম্মতির কারণে তা বিবাহে পরিণতি পায়নি। কেয়ার স্বামী বিজন এই সম্পর্ক সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। বিয়ের পর কেয়া স্বামীর কাছ থেকে হয়তো অনেক কিছু পেয়েছে, আবার অনেক কিছু পায়নি – এই দুটি দিকই সত্য। তবে প্রবালকে নিয়ে সে নানারকম ইচ্ছে পূরণের স্বপ্ন দেখেছিল। কাজেই তার প্রতি কেয়ার মনে একটা দুর্বলতা ছিলই। আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বহুদিন পর প্রবালকে দেখে। তাই আমরা দেখি কেয়া বারবার নানা ভাবে প্রবালের কাছে তার বিবাহিত স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রবাল বাড়ি-গাড়ি করেছে কিনা তাও সে জানতে ইচ্ছুক। কথা প্রসঙ্গে প্রবাল কেয়া ও বিজনের ছেলের যানবাহনের কথা তুললে দেখা যায় কেয়ার কণ্ঠে আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয় –"হ্যাঁ ওই ছেলেরই হচ্ছে। আমাদের আর হবে না।"[২৯৫] আবার যখন স্বামী বিজনকে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের জন্য বন্ধু পরামর্শ দেয় তখনও কেয়া গভীর অভিমানে জানায় –"ওঁর কথা আর বোলো না প্রবালদা। এমন গেঁতো মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি। কেবল কলেজ আর বাড়ি, বাড়ি আর কলেজ। ছুটিছাটায় কাছাকাছি যে কোথাও বেরোব তাই হয়ে ওঠে না। দু'তিন বছর অন্তর অন্তর হয়তো বেরোই তাও অনেক টানা হেঁচড়া ঝগড়াঝাঁটির পর।"[২৯৬] স্ত্রীর মনের খাম্‌তি তথা অতৃপ্তি

বিজনের চোখেও ধরা পড়ে। তাই তার মনে হয় –"....কেয়াকে তার বাবা-মার হাত থেকে যতখানি নিয়েছে বিজন তার নিজের হাত থেকে ততখানি নিতে পেরেছে কিনা এ সন্দেহ তার এখনো আছে। হয়তো সারাজীবনই থাকবে।"[২৯৭] এই মানসিকতা থেকেই বিজন স্ত্রীর পাশে বিছানায় শুয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করে আজকের ঘটনায় কেয়ার দীর্ঘশ্বাস নির্গত হচ্ছে কিনা। এবং দেখা যায় একটা সময় পর বিজন স্ত্রীকে কাছে টেনে এনে বলে –"তোমার অনেক সাধ মেটেনি।" এই কথায় কেয়া এগিয়ে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ও আর্দ্র গলায় বলে –"কেন ওসব কথা বলছ ? তোমার সন্দেহ কি কিছুতেই যাবে না ? আমার কত সাধ মিটেছে তা কি আমি জানিনে ? যা চেয়েছি সবই তো পেয়েছি।"[২৯৮] স্ত্রী যে নিজেকে ও তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে তা বিজন স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। তার প্রমাণস্বরূপ এই প্রসঙ্গে স্বামীর মনোভাব তুলে ধরা যেতে পারে –"এই মুহূর্তে কেয়া বলছে সব পেয়েছে। ঝগড়ার সময় বলে কিছুই পায়নি। বিজনের মনে হল দুটোই অসত্য। আমরা কেউ সব পাইনে। কিছু পাই, কিছু পাইনে। কিন্তু আমাদের এক না পাওয়ার অভাব কি আর এক না পাওয়ায় পূর্ণ হয় ? এক সুখ কি আর এক দুঃখকে ভুলিয়ে দিতে পারে ?"[২৯৯] আসলে তা পারে না। বিজনের কাছ থেকে কেয়া যতই সুখ পাক না কেন তা কখনো প্রবালকে না পাওয়ার দুঃখকে ভুলাতে পারবে না। তা কেয়া ও বিজন দু'জনেই জানে। অথচ সব জেনেও পরস্পর পরস্পরকে মেনে নেয়। তারা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করে সম্পর্কের বাঁধন রক্ষার তাগিদে। এও এক বিচিত্র সম্পর্ক। যার সত্যরূপ উভয়ের অভিনয়ের আড়ালে থেকে যায়। তাই আমরা কাহিনীর শেষে দেখি স্বামী বিজন তার মনের প্রশ্নকে লুকিয়ে রেখে স্ত্রীর সিক্ত দুটি চোখে আর ঠোঁটে চুম্বন করতে থাকে।

'ফিরে দেখা' এবং **'ভালোবাসা'** গল্পদুটি যথাক্রমে 'গল্পমালা - ২ ও গল্পমালা - ৪' এ অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি **১৩৮১** বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অপরটি **১৩৭৩** বঙ্গাব্দে 'বসুমতী' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই দুটি গল্পের বিষয়বস্তু তথা ভাববস্তু প্রায় একইরকম। তাই এই গল্প দুটিকে একসঙ্গে রেখে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমে আসা যাক 'ফিরে দেখা' গল্পে। শারীরিক অক্ষমতা একটি দাম্পত্য সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করে তারই উদাহরণ এই গল্পটি। কাহিনীর পুরুষ চরিত্র অর্থাৎ সুরপতি শারীরিকভাবে অক্ষম। ডাক্তার জানায় এ ব্যাধি নয়, জন্মগত অর্গানিক ডিফেক্ট। এই অসম্পূর্ণতা সারাবার নয়। সব জানা সত্ত্বেও সুরপতি বিয়ে করে। এর পিছনে তার মনের যুক্তি ছিল বিবিধ।

প্রথমত – ছেলেবেলা থেকে যে মেয়েটি তার নয়ন হরণ ও মনোহরণ করেছে তাকে সে হাত ছাড়া করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত – তার সম্পর্কে সাধু-সন্ন্যাসীরা অন্যরকম ভরসা দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন মন্ত্রতন্ত্র, গাছগাছড়া, মাদুলী, কবচের ফল অবশ্যই ফলবে তবে সময় লাগবে। তৃতীয়ত – সুরপতির মনে একটি কূটযুক্তিও বাসা বেঁধেছিল। তা হল – যে দোষে সে কষ্ট পাচ্ছে বা পাবে, দাম্পত্য সুখ থেকে বঞ্চিত হবে সেও তার নিজের দোষ নয়, সেও এক দুর্ভাগ্য। আর এই দুর্ভাগ্য শুধুমাত্র তাকে নয়, আরও একজনকে দগ্ধ করুক। সর্বোপরি সুরপতি অনুভব করেছিল জীবনে শারীরিক সম্পর্ক-ই সব কিছু নয়। সে সর্বাণীকে ভালোবাসে। নানা ভাবে ও নানা উপায়ে ভালোবেসে সে তার শরীরের খামতিকে দূর করবে। তাই সে বিয়ে করে এবং দেখা যায়, বিয়ের পর সর্বাণীকে আদর সোহাগে অস্থির করে তোলে। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সে স্ত্রীর জন্য শাড়ি, সাবান, স্নো নিয়ে আসে। তবে তাতে সর্বাণীর মন ভরেনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আমরা জানি প্রত্যেক জীবেরই আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে অন্যতম প্রবৃত্তি হল যৌন চাহিদা। মানুষের ক্ষেত্রে একটি বয়স পর্যন্ত তার প্রাবল্য থাকে। তারপর সময়ের তালে তালে ম্লান হয়ে আসে। কাজেই বিবাহের পর একজন স্ত্রী হিসাবে তার স্বামীর কাছ থেকে দৈহিক সুখ লাভ করবার ইচ্ছা প্রত্যেক নারীর মধ্যেই কাজ করে। আলোচ্য গল্পে সর্বাণীও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সে যখন ধীরে ধীরে তার স্বামীর শরীরের অক্ষমতাকে উপলব্ধি করে তখন তার মধ্যে ক্রমশ মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ এখান থেকেই তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের অশান্তির সূত্রপাত ঘটে। দেখা যায়, সর্বাণী ক্ষণে ক্ষণে বিষন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে মনের স্বাভাবিকতাকে হারিয়ে স্বামীর প্রতি মুখরা হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে দ্বিচারিতাও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বাইরের লোকের সঙ্গে খুব সদ্ভাব অথচ সুরপতির কাছে তার ঠিক বিপরীত আচরণ পোষণ করে। তারা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও এই পর্যায়ে এসে যে অনেক বেশি মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমত পরিস্থিতিতে কাহিনীতে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে প্রবেশ করে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবক নীরদ মুখার্জী। স্বাভাবিকভাবে তাকে কেন্দ্র করেই সর্বাণী শারীরিক ও মানসিক সুখ পেতে চায়। আর এই বিষয়টি স্বামী সুরপতির মনে স্ত্রীর প্রতি একরকম তীব্র বিদ্বেষ সেই সঙ্গে নিজের প্রতি তার হীনমান্যতারও জন্ম দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বাণী গোপনে নীরদের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হলেও পরবর্তী সময়ে সুরপতির সামনেই তারা মিলিত হতে চায়। এক্ষেত্রে সর্বাণীর আচরণে ফুটে ওঠে যে সুরপতি জেনে শুনে বিয়ে করে তাকে শাস্তি দিয়েছে, সুতরাং, এ আচরণ আসলে তারই প্রতিশোধ। আবার এও হতে পারে, পৌরুষত্বহীন এই মানুষটির তুলনায়

সর্বাণীর কাছে মানসিক-দৈহিক সুখই তখন মূল বিষয় ছিল। তাই তার এমন আচরণ। আর তাতে সুরপতির যেন শারীরিক দুর্বলতার সমান্তরালে মানসিক দুর্বলতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত নীরদ ও সর্বাণী পালিয়ে যায়; সেই সঙ্গে সুরপতির দেওয়া সমস্ত টাকাপয়সাও সঙ্গে নিয়ে যায় সর্বাণী। এই পর্যন্ত গল্পের প্রাথমিক পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটে চল্লিশ বছর পর সর্বাণীর ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে। এর আগেও আমরা উল্লেখ করেছি শারীরিক তথা যৌন চাহিদা মানুষের একটি বয়স পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

এই বিষয়টি সুরপতির বোধের মধ্য দিয়েও ধরা পড়েছে –"অথচ পরিণত বয়সে এসে বুঝতে পেরেছেন যাকে তিনি অভিশাপ মনে করেছিলেন তা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। অন্ধতা, খঞ্জতা, বধিরতার মতই এও এক ধরণের অঙ্গহীনতা। তার জন্য সারাজীবন হীনমন্যতাকে বয়ে বেড়ানোর দরকার ছিল না।"[৩০০] একটি পর্যায়ে এসে দাম্পত্য সম্পর্কে শারীরিক সম্পর্ককে অতিক্রম করে মানসিক সম্পর্কই প্রধান হয়ে ওঠে। সর্বাণী চলে যাবার কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো তা উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু তার পর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও তা অনুভব করে। এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। সেই সঙ্গে সুরপতির প্রতি তার সহানুভূতি জাগে। তাই সে সুরপতির নানারকম খোঁজখবর নেয় তারই বন্ধুর কাছ থেকে। এবং আজ সে সুরপতির কাছে তার টাকা ফেরৎ দেবার উদ্দেশ্যে এলেও এখানে টাকা দেওয়া উপলক্ষ মাত্র। সে সহানুভূতির বশবর্তী হয়েই এতবছর পর পুনরায় প্রাক্তন স্বামীর কাছে এসেছে। সুরপতি জেনেছে – সে যেমন সর্বাণীকে দৈহিক সুখ দিতে পারে নি তেমনি নীরদ তাকে সন্তান সুখও দেয়নি বা দিতে অক্ষম হয়েছে। এই ক্ষেত্রে লেখক সর্বাণীর প্রতি যেন একরকম বিচার করেছেন। অর্থাৎ এ যেন তার কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ। কিন্তু সর্বাণী যদি মাতৃত্ব লাভ করত তা হলেও সে সুরপতির কাছে আসত, বা, বলা যায় – প্রাক্তন স্বামীর প্রতি পড়ন্ত বেলায় তার যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে তা হতই। কেননা, শারীরিক মোহ সাময়িক। অপরদিকে স্ত্রীর পরপুরুষের সঙ্গে চলে যাওয়া শুধুমাত্র নিজের পৌরুষত্বে আঘাত নয়, এ লজ্জা সমাজ ও পরিবারের কাছেও। তাই এতদিন বাদে যখন সর্বাণী নিজে থেকেই সুরপতির কাছে আসে তখন সেই লজ্জা ঘুচে যেন তারই (সুরপতির) জয়গান ঘোষিত হয়। আর তা সে পরিবারের সকলকে জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যায়, সুরপতির অশ্রুসিক্ত নয়ন ছাড়া সর্বাণীর এই উপস্থিতির কেউ সাক্ষী থাকে নি। যাই হোক, আলোচ্য গল্পে যে সম্পর্ক পারস্পরিক ভালোবাসার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল তা নানাভাবে বাহিত হয়ে এসে কোথায় যেন পুনরায় বাঁধনের এক ইঙ্গিত দিয়ে যায় সর্বাণীর এই উপস্থিতির মাধ্যমে।

দাম্পত্য জীবন বলয়ে আবদ্ধ মানব-মানবীর সম্পর্ক যে কত বিচিত্র তার একটি উদাহরণ হিসাবে **'ফেরিওয়ালা'** গল্পটিকে নেওয়া যেতে পারে। এই গল্পটি ১৩৮২ বঙ্গাব্দে 'ধনধান্যে' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে যৌবনের সঙ্গে জরার টানাপোড়েনের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। এখানে দেখা যায় নিম্নবিত্ত সমাজের অন্তর্গত দু'জন নারী-পুরুষ প্রয়োজনের তাগিদে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে গ্রহণ করে। অর্থাৎ পূর্ণযৌবনা একজন অসহায় অনাথ নারীর প্রতি করুণার বশবর্তী হয়ে এক প্রৌঢ় পুরুষ তাকে বিবাহ করে। হারানো যৌবন ছিল এই পুরুষ চরিত্রটির মনের দুর্বলতার প্রধান কারণ। সে অনুমান করে – হয়তো সে শরীর বা এই প্রৌঢ় মন দিয়ে স্ত্রীর হৃদয় জয় করতে ব্যর্থ হবে। এই পরাজিত মনোভাব তাকে ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে। ফলস্বরূপ সে স্ত্রীকে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখে। এমনকি, তার মনে হয় এই দেশকে যদি যুবক-শূন্য করা যায় তবে ভালো হয়। আসলে এ তার হীন মানসিকতারই প্রতিক্রিয়া। তবে এর সমান্তরালে তার বিবেকবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তার মনে হয় সে অন্যায় করছে। তাই সে এমন একজনকে মনে মনে খোঁজে যে তার স্ত্রীকে সব দিয়ে সারা জীবন সুখে রাখতে পারবে। এই মনোভাবের মধ্যেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গভীর ভালোবাসার দিকটি লুকিয়ে আছে। আর এই ভালোবাসা থেকেই স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলার একটা ভয় তার মধ্যে কাজ করে। সে যুবক সমাজকে এই কারণেই ঈর্ষা করে। স্বামীর এই হৃদয়ানুভূতি ও তাকে কেন্দ্র করে যে যন্ত্রণা তা তারই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে –"আমি শহরের পথে পথে হাঁটি। এর মুখের দিকে ওর মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু মনে মনে আর এক বস্তু ফেরি করে বেড়াই। আমার পরম ধন।"[৩০১] অর্থাৎ একদিকে বিবেকবোধ অপরদিকে প্রেমানুভূতির দ্বন্দ্বে স্বামীর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আসলে একটি সত্তাকে আর একটি সত্তা গভীর আবেগে স্পর্শ করতে চায়। কিন্তু জরাকে অতিক্রম করে সে জায়গায় পৌঁছোতে পুরুষ চরিত্রটি অক্ষম। আর এটিই তার হৃদয় যন্ত্রণার প্রধান কারণ ।

খ) বিবাহ পূর্ববর্তী জীবনে সম্পর্কের সমীকরণ

দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার জীবনে নানা ওঠা-পড়া, টানাপোড়েন যেমন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু গল্পে শিল্পিত রূপ পেয়েছে, তেমন বিবাহ পূর্ববর্তী নর-নারীর জীবনেও যে নানা ছন্দপতন ঘটে, কখনোই তা একমুখী হয় না, তারই নানা আলেখ্য গল্পের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আমরা এখন এই জীবন জটিলতার চিত্র যেসব গল্পে রয়েছে সেগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আলোচ্য অধ্যায়ে এই পর্বের প্রথম গল্প হল **'মালঞ্চ'** । ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় গল্পটি প্রথমে **'হাসপাতাল'** নামে প্রকাশিত হয়। এটি রূপান্তরিত হয়ে **'মালঞ্চ'** নামে লেখকের 'হলদে বাড়ি' (২য় সংস্করণ) গল্পগ্রন্থে স্থান লাভ করে। একটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে কাহিনীর কেন্দ্রিয় নারী চরিত্রের এক বিশেষ হৃদয়ানুভূতির সন্ধান লাভ-ই আলোচ্য গল্পের মুখ্য বিষয়।

'মালঞ্চ' গল্পের প্রেক্ষাপটে আছে অস্পৃশ্য নিম্নবিত্ত সমাজ। মূলত নমঃশুদ্র আর চাষী কৈবর্তদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও তাদের সমাজ-অর্থগত অবস্থান এখানে উঠে এসেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সমাজের অন্যান্য মানব গোষ্ঠীর তুলনায় এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা শিক্ষাসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে পিছিয়ে পড়া লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও শোষিত এক সামাজিক জীব সমষ্টি। তাদের জীবনের প্রাথমিক চাহিদা হল – খাদ্য, অর্থাৎ বেঁচে থাকার তৎপরতাই মুখ্য। এমন প্রেক্ষাপটে অবস্থানকারী মানুষের কাছে 'শরীর' মন্দির সম। কিন্তু সেই সমাজের অন্তর্গত আলোচ্য গল্পের নায়িকা মালঞ্চ কিছুটা ব্যতিক্রম। এলাকার একমাত্র ডাক্তার ও তার স্ত্রীর সাহচর্যে মালঞ্চের মনে লাগে আধুনিক রুচি-শিক্ষার স্পর্শ। আর তাতেই শরীরকে অতিক্রম করে মন তথা মানবিক অনুভূতি-ই তার কাছে প্রাধান্য পায়। তাই আমরা দেখি, পরিবারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত; সেই সঙ্গে নানারকম প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও মালঞ্চর অন্তর-জগৎ কল্পনার জাল বোনে। এই অবিবাহিত নারীটিকে আকৃষ্ট করে ডাক্তারের প্রাণবন্ত দাম্পত্য জীবন। তাই সে বারবার ছুটে যায় সেখানে। তবে এই আকর্ষণ শুধুমাত্র দু'জন স্বামী-স্ত্রীর প্রতিই নয়, তা সংকুচিত হয়ে কেবলমাত্র একটি সত্তার প্রতি নিবিষ্ট থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর ভিড়েও মালঞ্চের চোখে ডাক্তার বিভূতি ভিন্নভাবে ধরা দেয়। সে এই বিবাহিত পুরুষটিকেই ভালোবাসে। সামাজিক পরিভাষায় তা 'অবৈধ সম্পর্ক' হিসাবে পরিগণিত। কাজেই মালঞ্চ জানে এই সম্পর্কের কোন শুভ পরিণতি সম্ভব নয়। তথাপি তার মনের ক্ষুধা থেকেই যায় –"যেন এক রহস্যময় দামী মার্বেল পাথরের মূর্তি। তার চারিদিকটা নিষেধের বেড়ায় ঘেরা। তবু সেই বেড়া ডিঙ্গোতে লোভ হয়, ইচ্ছা হয় তাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে; যত ভয়, যত সংশয়, যত শাসনই থাক না কেন। ....কিন্তু যন্ত্রপাতি, সাবান, তোয়ালে এগিয়ে দিতে গিয়ে এ মূর্তিকে তো কতবার কত ছলে ছুঁয়েছে। কিন্তু একজনের ছোঁয়ায় লাভ কি ছোঁয়াছুঁয়ি যদি না হয় ? আঙুলের ছোঁয়া কি পৌঁছোয় পাথরের মধ্যে।"[৩০২] মনের এই চাওয়া-পাওয়াকে 'চরমক্ষণে' পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পরিস্থিতিতে গল্পকার একটি ঘটনাকে এখানে উপস্থাপন করেছেন; তা হল, শহর থেকে সিভিল

সার্জেনের আগমন এবং এই এলাকার সামান্য কিছু কর্ম সংস্থানের ও চিকিৎসার একমাত্র ভরসা হাসপাতালটিকে স্থানান্তরিত করবার প্রয়াস। এই বিষয়টি গল্পে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। যার মাধ্যমে সূচিত হয়েছে মনের আকাঙ্ক্ষা বনাম পেটের ক্ষুধার টানাপোড়েন।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গল্পে আমরা পাই যে – এই সংবাদে ডাক্তার বিচলিত হলেও তার স্ত্রী এতে স্বাভাবিক মত পোষণ করে। এক্ষেত্রে মালঞ্চ ধরে নেয়, এ বিষয়ে ডাক্তার স্বাভাবিক। তাই সে নিজের মত করে প্রতিবাদের প্রচেষ্টা চালায়। তবে মালঞ্চের এই ভুল বোঝাবুঝিতে ডাক্তার কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ফলে তা থেকে ডাক্তারের সঙ্গে মালঞ্চের যে কথোপকথন হয় তাতে স্বাভাবিকভাবে তিক্ততা ও বিদ্রূপের সুর মিশ্রিত থাকে। একটি কথার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তার তীক্ষ্ণ হেসে জানায় –"তাই নাকি ? আচ্ছা বেশ, তোমার জোরের নমুনাটা একবার দেখবার অপেক্ষায় রইলাম।"[৩০৩] লক্ষণীয়, ডাক্তারের তথা যে কোন প্রেমিক পুরুষের কাছ থেকে এমন আঘাতে নারী মনস্তত্ত্বের একটি গভীর দিক এক্ষেত্রে উঠে আসাটা স্বাভাবিক। কাজেই মালঞ্চের মনেও তা সমানভাবে প্রভাব ফেলে। সে ভাবে ডাক্তার তার হৃদয়ের আর্তিকে অস্বীকার করতেই পারে, কিন্তু তাই বলে নীচু জাতের সামান্য একজন নারী হিসাবে তাকে অবজ্ঞা করবার তার কোন অধিকার থাকতে পারে না। ডাক্তারের এই ব্যঙ্গপূর্ণ উক্তি আসলে তো মালঞ্চের অস্তিত্বের-ই অপমান করা ও অবহেলা করা। এই উপলব্ধিতে মালঞ্চ আত্মদগ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়। তার মনে গভীর অভিমানবোধ ক্রিয়া করে। আর এই জায়গা থেকেই সে হাসপাতালটিকে রক্ষা করবার নব উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বলা যায়, আর একটি দিকও তার ভাবনার জগতে ধরা দিতে পারে; তা হল – মালঞ্চ জানে সে ডাক্তার বিভূতিকে ভালোবাসলেও ডাক্তারের পক্ষে তাকে ভালোবাসা সম্ভব নয় বা হয়তো সে ভালোবাসেও না। অপরদিকে আর কাউকে ভালোবাসা মালঞ্চর পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা জানি, মালঞ্চর এই ভাবনায় নিহিত আছে আধুনিকতার স্পর্শ। যার মাধ্যমে সে মনের চাওয়া-পাওয়াকেই বড় করে দেখতে শিখেছে। তাই সে ভেবেছে আর কিছু না পারলেও নিজের ও এলাকার মানুষজনের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের ক্ষমতা আছে তারই হাতে। ফলে আমরা দেখি এই ভাবনা থেকেই মালঞ্চ সিভিল সার্জেনের ইচ্ছার কাছে নিজের দেহ দান করে এবং পরিবর্তে হাসপাতাল ফিরে পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গল্পের নায়িকার মনের আর একটি দিকও আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। ভিন্ন পুরুষের কাছে দেহ দানের বিষয়টিতে ডাক্তারের মনে কোন ঈর্ষা জাগে কিনা তা জানতে এবং মালঞ্চও যে অবজ্ঞার পাত্রী নয় সে কথা জানাতেই নায়িকার এই উক্তি –"হাত ধরে জবাব

আদায় করবার সাহস আপনার কতক্ষণ ধরে হল ডাক্তারবাবু। নিশ্চয়ই ভেবেছেন, এতক্ষণ একজন যখন ধরে রেখেছিল তখন আপনারও আর ধরতে বাধা নেই, কেমন ? কিন্তু আমারই না হয় জাত গেছে, নিজের জাতের ভয় তো আছে আপনার।"[৩০৪] এর প্রত্যুত্তরে ডাক্তার জানায় –"একটা কথার জবাব তোমাকে দেওয়া হয়নি মালঞ্চ। নিজের জন্য ভয় আমার কোন দিন ছিল না, ভয় ছিল তোমার জন্যই। এবার তা ভাঙল। কিন্তু তোমাকে ছুঁয়ে জাত আমার যায় নি, কোনদিন যাবেও না।"[৩০৫] অর্থাৎ মালঞ্চর প্রতি ডাক্তারের হৃদয়ানুভূতি তথা ভালোবাসার স্বীকৃতি তার এই উক্তির মধ্য দিয়েই স্পষ্ট ভাবে ধরা দেয়। আর সেই সত্য উপলব্ধি মালঞ্চর চোখে জল এনে দেয়। এ আসলে তার জীবন রস যা অশ্রুধারা রূপে প্লাবিত হয়েছে। এই জীবন রস তথা মানব রসই যুগ যুগ ধরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বাঁধনের মূল মন্ত্র।

'ক্রোড়পত্র' (গল্পমালা - ৩) গল্পটি ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে বিবাহ পূর্ববর্তী পর্বের দু'জন নর-নারীর মধ্যেকার একটি সম্পর্ক নানা পরিস্থিতির সমান্তরালে সময়ের গণ্ডী অতিক্রম করে একটি পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়। তারই ফল স্বরূপ বিশ্লেষণে আমরা গল্পের কাহিনীতে প্রবেশ করব।

এই গল্পের নায়িকা জয়ন্তী ও নায়ক অরুণের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য বর্তমান। যা তাদের সমাজগত অবস্থানকেও পৃথক করে তুলেছে। আর সেই কারণেই আমরা দেখি এই অবিবাহিত নর-নারীর ভালোবাসা পরিণতি লাভে ব্যর্থ হয়। প্রায় নিঃস্ব অরুণের পক্ষে অভিজাত পরিমণ্ডলে লালিত জয়ন্তীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা তখন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে অরুণ তার মনের দ্বিধা ও সংশয়কে কাটিয়ে উঠতে অসফল হয়েছে। তাছাড়া তার অপরিণত বয়সও এবিষয়ে দায়ী ছিল। তবে দেখা যায়, গল্পের নায়িকা কিন্তু তা অনুধাবন করতে চায়নি। সে অরুণের ভালোবাসা তথা পৌরুষত্বে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু সেই ভুল ভাঙলে অরুণের প্রতি এক তীব্র অভিমানকে সঙ্গী করে জয়ন্তী স্বামীর সংসারে পদার্পণ করে। তার এই মনোভাব প্রেমিক অরুণের কাছে প্রেরিত পত্রে ধরা পড়ে এইভাবে –"ভেবেছিলুম শত হলেও তুমি পুরুষ। তুমি কিছুতেই চুপ করে থাকবে না, তুমি কিছুতেই মুখ বুজে সইবে না। তুমি দাঁড়াবে বুক ফুলিয়ে – সমস্ত শাসন ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা গঞ্জনার সামনে তুমি দাঁড়াবে মুখোমুখি..... ভেবেছিলুম তুমিই তো আছ, তুমি থাকতে আমার ভাবনা কি। কিন্তু দেখলুম যা ভেবেছিলুম সব ভুল। ভালই হয়েছে সে ভুল এত অল্পেই ধরা পড়ল, এত অল্পেই চুরমার হল ভেঙে।"[৩০৬] তবে অরুণের প্রতি জয়ন্তীর শুধুমাত্র অভিমানই

ছিল না, ছিল গভীর ভালোবাসাও। আর তাই যে তাকে স্বামী ও সংসার সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছিল তা সকলের কাছেই অনুমেয়। দেখা যায় – জয়ন্তীর স্বামী ও তার পরিবার এই উদাসীনতার কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হয়। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে যে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে সে জর্জরিত ছিল, তার প্রমাণ কাহিনীসূত্রে পাওয়া যায়। এ সংবাদ অরুণকেও বিচলিত করে। আমরা দেখি, হৃদয়গত যন্ত্রণার সাদৃশ্যে অরুণ আবার নতুন ভাবে জয়ন্তীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।

এমত পরিস্থিতিতে জয়ন্তীর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু কাহিনীর ধারাকে অন্যখাতে বাহিত করে। এবার কিন্তু অরুণ তার সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে জয়ন্তীর সম্মুখে নিজেকে নব উদ্যমে উপস্থাপিত করে। তবে সময়ের তালে তালে জয়ন্তীর অভিমানও আরও পরিণত ও কঠোর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে তার চরিত্রে যুক্ত হয় বাঙালী বিধবা রমণীর প্রচলিত সংস্কার বোধ। এই দুয়ের কারণেই জয়ন্তী অরুণের প্রস্তাবকে খারিজ করে। অপরদিকে তার এমন চারিত্রিক গুণে অরুণ বিস্মিত হয়। পতিব্রতা নারী হিসাবে মৃত স্বামীর প্রতি জয়ন্তীর এমন নিষ্ঠা অরুণকে বিব্রত করে – "এবার আর বুঝতে বাকি রইল না অরুণের। চিনতে বাকি রইল না জয়ন্তীর স্বামীকে। সে ত শুধু নবনী নয়, সে জয়ন্তীর স্বামী। স্বামীত্বের আদর্শ রূপ। অরুণ বুঝতে পারল, মরে নবজন্ম নিয়েছে নবনী জয়ন্তীর মনে, মৃত্যু তাকে অমৃতত্ব দিয়েছে। মরলোকের মানুষ নবনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত অরুণ, কিন্তু জয়ন্তীর মনোলোকের মানস নবনীর কাছে সে একেবারে নিরস্ত্র, নিঃসহায়।"[৩০৭] দ্বিতীয়ত, সময়ের ব্যবধানে অরুণের মনে জন্ম নেয় এক বিশেষ বোধ –"জীবনের এসব বৃত্তান্ত ভোলাটাই সহজ, মনে রাখাই অত্যন্ত কঠিন। মনে রাখতে চাইলেই কি মনে রাখা যায়! জীবনের আরো অনেক দাবী আছে, দায়িত্ব আছে, প্রয়োজন আছে, তাদের স্বীকার না করে জো থাকবে না।"[৩০৮] উক্ত দুটি কারণ জয়ন্তী ও অরুণের মধ্যেকার মানসিক এবং শারীরিক দূরত্বকে আরও বিস্তৃতি ঘটায়।

অপরদিকে দেখা যায় – বাস্তবের তীব্র কষাঘাতে জয়ন্তীর কঠোর সংস্কার বোধ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। দেখা যায়, স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিতা ও লাঞ্ছিতা এক গৃহবধূর হয়ে জয়ন্তী কোর্টে লড়াই করে জয় লাভ করে। এ জয় আসলে তারই দাম্পত্য জীবনে প্রাপ্ত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জয়। এখান থেকেই তার জীবনের প্রথম জয়গান সূচিত হয়। এমনকি, পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, জয়ন্তীরই সমিতির অন্তর্গত এক বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহ সম্পন্ন হয় তার তত্ত্বাবধানে। এ যে তার মনের সুপ্ত বাসনারই বহিঃপ্রকাশ তা আমরা সহজেই উপলব্ধি

করতে পারি। কারণ জয়ন্তী হয়তো অনুধাবন করেছিল – যে অরুণকে সে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল পুনরায় তার কাছে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। আবার হয়তো বা সে অরুণের দাম্পত্য জীবন ও ঘর সংসারের সংবাদও পেয়ে থাকতে পারে। তবে এ বিষয়ে গল্পে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও জয়ন্তী যে শুধুমাত্র অরুণকেই ভালোবেসেছিল এবং বর্তমানেও তার মনোলোকে সেই অনুভূতিই যে জীবন্ত তারই প্রমাণ পাওয়া যায় জয়ন্তীর দ্বিতীয়বার বিবাহ না করা ও এ বিষয়ে বিভিন্ন জনের প্রশ্নকে তার এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াসেই। লক্ষণীয়, একদিন সে অরুণকে জানিয়েছিল হিন্দু নারীর বিবাহ জীবনে একবারই সম্পন্ন হয়। অথচ একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানেই তার সঙ্গে অরুণের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। যে অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা জয়ন্তী নিজেই। জীবন-ই তাকে এমন প্রেক্ষাপটে এনে উপস্থাপিত করে, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে মনের চাওয়া-পাওয়া; এক্ষেত্রে বাহ্যিক নিয়ম-নিষ্ঠা, রীতি-নীতিগুলি গৌণ হয়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে দেখা যায়, একদা অরুণ তার যে আংটি বিবাহপূর্ব জীবনে জয়ন্তীর সঙ্গে অদল-বদল করত সেটিই জয়ন্তী সমিতির কল্যাণকর্মের সাহায্যস্বরূপ চেয়ে নেয়। যার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যেকার হারানো সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর তাই হয়তো অরুণ ও জয়ন্তীর মধ্যে যে শুষ্ক সুপারিশ পত্র বিনিময় হয় তার মধ্যেও এক বিশেষ অনুভূতি তারা খুঁজে পায়, যা অব্যক্ত, কেবলমাত্র পরস্পরের অনুভব গ্রাহ্য। আসলে মানব-মানবীর সম্পর্ক যে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে তৈরী হয়, ভেঙে যায়, আবার গড়ে ওঠে, তারই এক একটি দিক গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক একটি গল্পের কাহিনীর মধ্যে বয়ন করেছেন। এই গল্পটি তারই একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের জীবন জিজ্ঞসার জটিল পর্বে দাঁড়িয়ে আর্থিক অসঙ্গতি বনাম হৃদয়বৃত্তির টানাপোড়েনের এক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে **'চেক'** গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমাজের অস্থিরতাময় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও সংস্কারকে ছাপিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে নারীরা বহির্জগতে কর্মমুখী হতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ সমাজ কাঠামোয় আর একটি নতুন স্রোতধারা যুক্ত হয়। তবে সে ধারায় যুক্ত নারীদের জীবন ততখানি সহজ ছিল না, কারণ পারিবারিক প্রয়োজনের তাগিদে অন্দরমহলের মেয়েরা যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাদের নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিনের ধরাবাধা রুটিনে পুরুষের কামার্ত ও লালসার দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করবার এক নীরব লড়াই সর্বদা তাদের মধ্যে কাজ করতে থাকে। প্রতিনিয়ত সেই জটিল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার

পরীক্ষায় তারা মগ্ন। কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে আসবারও কোন পথ থাকে না। ফলে একদিকে দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের বিরামহীন চাহিদাপূরণ অপরদিকে প্রতিকুল পরিবেশে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার তীব্র টানাপোড়েন তাদের জীবনের স্বাভাবিকতাটুকুকে মুছে দেয়। তাদের জীবনের দাবী সেখানে গৌণ হয়ে ওঠে। তবে সব কিছুর পরেও তারা মানুষ। তাদের হৃদয়ে আছে ক্ষুধা ও আকূতি। এর বশবর্তী হয়ে তারা কোন সম্পর্কে আবদ্ধ হলে সেখানেও আসে নানা জটিলতা। সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গভীর দৃষ্টিতেও নাগরিক সভ্যতার সেই কর্মী নারীদের জীবন-জটিলতা প্রতক্ষ্যভাবে ধরা পড়েছে। 'চেক' গল্পটি তারই একটি উদাহরণ।

এই গল্পের কাহিনী-জাল যেভাবে বয়ন করা হয়েছে তাতে দেখা যায় – কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র সরসীকে আর্থিকভাবে চরম সংকটাপন্ন এক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তুলে আনা হয়েছে, যে পরিবারে বাবা-মা, স্বামী পরিত্যক্তা দিদি ও তার ছেলে রয়েছে। সরসীর বাবা তার মধ্যবিত্ত মানসিকতা তথা মূল্যবোধের জায়গা থেকে সরসীকে পুরুষের অফিসে চাকরি করতে দিতে চাননি। তার মতে সেখানে কর্মে নিযুক্ত করা মানে মেয়েকে আগুনে ঠেলে দেওয়া। তবে তাকে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবার প্রয়োজনীয়তার কাছেই মাথা নত করতে হয়। চেনা সংসার ও সমাজের সীমানা ছাড়িয়ে অফিসের চাকরিতে যখন সরসী নিযুক্ত হয় স্বাভাবিকভাবেই কর্মক্ষেত্রের সব বয়সী পুরুষের কৌতূহল দৃষ্টিতে সে যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। এমত পরিস্থিতিতে অফিসেরই এক কর্মী পুরুষ তথা আলোচ্য কাহিনীর নায়ক সুবিমলের সহানুভূতি ও আন্তরিক সাহচর্য সরসীকে খানিকটা স্বস্তি দেয়। সেই সূত্র ধরেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটতে থাকে। তবে জীবনের চলার পথ ভিন্ন। তাই যে সম্পর্ক স্বাভাবিক বলে মনে হয় তাও আর স্বাভাবিক থাকে না। এপ্রসঙ্গে কথকের জীবনবোধ বিশেষভাবে উল্লেখ্য – "কিন্তু সুবিমলের ভুল হয়েছিল। জীবন কি সত্যিই অত সহজ, অত সরল, অত প্রাঞ্জল? আর জট কী জীবনে দু'একটি ? জট অসংখ্য। জীবনের এক জট খোলে, আর এক জট জড়ায়।"[৩০৯] কথকের জবানীতে এই জীবনদর্শন আসলে লেখকেরই জীবনদর্শন, যা চেনা জগতের চেনা অথচ অচেনা মানুষগুলির সত্তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছিল।

কাহিনীর ধারাবাহিকতায় উঠে আসে – ইনক্রিমেন্টে অফিসের সকলের মাইনে বাড়লেও সরসীর মাইনে অপরিবর্তিত থাকে। এমত পরিস্থিতিতে সম্পর্কের তুলনায় সরসীর কাছে আর্থিক চাহিদাই বড় হয়ে ওঠে। সেই চাহিদার সাপেক্ষেই সে অফিসের সকলের সামনে সুবিমলের

কাছে রুক্ষভাবেই এর কারণ জানতে চায়। শুধু তাই নয়, বিষয়টি নিয়ে সে জেনারেল ম্যানেজারের কাছেও যায়। ম্যানেজার তার মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারে আশ্বস্ত করে। আসলে ম্যানেজার নবীন চ্যাটার্জীর এই সহৃদয়ের মূলে ছিল সরসীর প্রতি তার লালসা। লক্ষণীয়, এই ঘটনা সরসীর মনান্তর ঘটায়। তাকে অনেক বেশি কর্মোদ্যোগী করে তোলে। তার মনের পরিবর্তন সাজ-পোশাক, আচার-আচরণেও ধরা পড়তে থাকে। কেননা, এর আগে সরসীর পোশাক-পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের ছাপ ছিল স্পষ্ট কিন্তু বর্তমানে বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল পোশাক ও দামী অলঙ্কারে সে নিজেকে আবৃত করে রাখে। কেবল তাই নয়, সুবিমলকেও এড়িয়ে চলে। অর্থাৎ এই পর্বে এসে তাদের সম্পর্ক অর্থগত চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ফলে সম্পর্কটির অবণমন ঘটে। তা ভিন্ন পথে বাঁক নেয়। অপরদিকে সরসীর সেই বোহেমিয়ান চাকচিক্যপূর্ণ জীবনও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে যখন নবীন চ্যাটার্জী কলকাতা শহরের প্রখ্যাত ব্যাঙ্কারের কন্যাকে বিবাহ করতে উদ্যত হয় তখন সরসীর সঙ্গে তার সম্পর্কটি স্থাপনের দাম হিসাবে একটি মোটা অঙ্কের চেক তুলে দেয়। আসলে সমাজে এই নবীন চ্যাটার্জীর মত মানুষের সংখ্যা বহু। তারা অর্থের বিনিময়েই সম্পর্কের দাগগুলিকে মুছে ফেলতে অভ্যস্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে সরসীর মত মেয়েদের প্রবঞ্চনার ইতিহাস চাপা পড়েই থাকে। সমাজ -সংসারে অবৈধ সম্পর্কের ধারায় এমন নানা স্তর বর্তমান; সেই সম্পর্কের লিখিত অলিখিত রূপ নিয়েই জীবন এগিয়ে চলে। অন্যদিকে জীবনের অভিজ্ঞতা সরসীকে এত দিনে কঠোর হতে সাহায্য করেছে। তাই দেখা যায়, হৃদয়াবেগকে, মনের ব্যাকুলতাকে চাপা দিয়েই সে নবীন চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে দাম কষাকষি করে শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতায় আসে। তবে হৃদয়ের আকূতি, যন্ত্রণা ও গভীর টানাপোড়েনকে প্রাধান্য দিয়ে সুবিমলের কাছে পুনরায় ফিরে যেতে সরসীর আত্মসম্মানে বেঁধেছে। তাই সে জীবনসঙ্গী নয়, এই টাকাগুলি দিয়ে সুবিমলের সঙ্গে সরসী ব্যবসার সঙ্গী হতে চেয়েছে। কিন্তু সুবিমল সরসীর সেই কঠিন সত্তার আড়ালে থাকা গভীর হৃদয় আর্তিকেই খুঁজে পায়। তাই চেকটি চার টুকরো করে সরসীকে সে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার দোল সংখ্যায় লেখকের বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক নিয়ে **'অসবর্ণা'** (গল্পমালা - ১) নামক গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পের নামটি যে একটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে তা আমরা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করতে সক্ষম হই। 'অসবর্ণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল – 'পৃথক বর্ণের অন্তর্গত মানব গোষ্ঠী'। এক্ষেত্রে আলোচ্য

গল্পের নামকরণে খানিকটা ব্যঞ্জনা মিশ্রিত আছে। সেখানে সমাজগত দিক থেকে দু'জন নর-নারী একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও অর্থগত দিক থেকে তাদের মধ্যেকার ব্যবধান বহু বিস্তৃত। অর্থাৎ আর্থিক বৈষম্যের নিরিখেই গল্পের নারী চরিত্রটি 'অসবর্ণা'। আর এই বিষয়টিই কাহিনীর নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এই গল্পে নায়ক প্রবীর এক উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত তথা অভিজাত পরিবারের সন্তান। সামাজিক পদমর্যাদায় তার পরিবার প্রথম সারিতে বিরাজমান। আর তারই দম্ভ পরিবারের বাকী সদস্যদের রক্তে সমানভাবে বর্তমান। অপরদিকে নায়িকা অঞ্জলিকে পাওয়া যায় – মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে আবিষ্ট, শিক্ষিত, মার্জিত রুচি সমন্বিত একজন মানবী হিসাবে। আমরা জানি আর্থিক সামর্থ্যই সামাজিক অবস্থানকে নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ অর্থের ভিত্তিতেই মানুষ বিভিন্ন গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পরিবেশ-পরিমণ্ডলের ব্যবধানে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ তথা জীবনবোধ ভিন্ন ভিন্ন আদলে গড়ে ওঠে। আর এই বিষয়গুলিই এক একটি চরিত্রকে এক এক ভাবে পরিচালনা করে থাকে। কাজেই আলোচ্য পাত্র প্রবীর ও পাত্রী অঞ্জলির মানসিক গঠন যে পৃথক হবে তা খুব স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, অভিজাত সমাজের নারীদের জীবনধারা, রুচি প্রবৃত্তি সম্পর্কে প্রবীরের প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল। এই ধারণায় অভ্যস্থ প্রবীরের চোখে মধ্যবিত্ত জীবন কাঠামোয় গণ্ডীবদ্ধ অঞ্জলির আচার-ব্যবহার, জীবনবোধ সর্বোপরি রূপ-লাবণ্য এক ভিন্ন মাত্রায় ধরা দেয়। তার কাছে নতুন লাগে, যা তার মনে নিজের বৌদির সঙ্গে অঞ্জলির একটি তুলনার জায়গা তৈরী করে। কাজেই বলা যায়, বিপরীত জীবনধারার প্রতি মোহ এবং একটি দুঃস্থ পরিবারের মেয়ের প্রতি প্রবল করুণা-বোধই ছিল অঞ্জলির উপর প্রবীরের আকর্ষণের মূল কারণ, যা সে ভালোবাসার মোড়কে আবৃত করে অঞ্জলির সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিল। হয়তো প্রবীরও অঞ্জলির প্রতি এই মুগ্ধতা ও করুণাকে নিজের অজ্ঞাতসারে 'ভালোবাসা' বলেই জেনেছিল এবং এই ভালোবাসাকে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানেও সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তবে তা অবশ্যই তার আভিজাত্যকে বজায় রেখে, সামাজিক পদমর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখে।

এই কারণে দেখা যায়, অঞ্জলিকে বিবাহ করবার পর তার বাবা বা ভাইকে ভালো কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করবার মাধ্যমে তাদেরকে সবর্ণে উপযোগী করে তুলবার পরিকল্পনা প্রবীর মনে মনে করতে থাকে। এই মানসিকতা থেকেই কিন্তু সে তাদের বিয়ের সামাজিক আচরণের পক্ষপাতি ছিল না। আইনের স্বীকৃতি অর্থাৎ রেজিষ্ট্রি বিয়েকেই তার পছন্দ করবার পিছনে

আসলে ছিল সমাজের কাছে নিজেদের সম্মান বজায় রাখবার তাগিদ। কাজেই প্রবীরের প্রতি অঞ্জলির মা ব্যবহারে আন্তরিক হয়ে উঠলেও প্রবীর কখনো এই পরিবারের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেনি। তার একমাত্র লক্ষ ছিল – অঞ্জলিকে লাভ করা বা তাকে উদ্ধার করে সবর্ণে আনয়ন করা। অর্থাৎ এই প্রয়াসের মূলে ছিল শুধুমাত্র করুণাবোধ। অপরদিকে অর্থগত দিক থেকে অনেক নীচের শ্রেণীতে অবস্থানকারী অঞ্জলির মনেও সংশয় ছিল এই 'অসবর্ণ' সম্পর্কের স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে। সামাজিক কারণেই তার পরিবারের সদস্যরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সুতরাং তারা যে এর বিরোধিতা করবে তা খুব স্বাভাবিক। এই কারণেই ভাড়া আদায়ের ছলে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে উক্ত পরিবারের সদস্যরা অঞ্জলির বাবাকে ভীষণভাবে অপমান করে। এবং দেখা যায়, একদিন পুলিশ এসে অঞ্জলির বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্জলি ভালোবাসার অধিকারবোধ থেকে প্রবীরের বুকে আশ্রয় নিয়ে বাবাকে ফিরিয়ে আনার আর্তি জানায়। কিন্তু প্রবীরের সম্ভ্রমবোধ সেই সাহায্য দানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে পুলিশের কাছে অঞ্জলিদের 'ভাড়াটে' বলে পরিচয় দেয়। এটি ছিল অঞ্জলির কাছে প্রথম আঘাত। দ্বিতীয়ত, যে পিতার আদর্শে সে নিজেকে গড়ে তুলেছিল তিনিই যখন চোর বলে প্রমাণিত হন তখন তা দ্বিতীয়বার অঞ্জলির বিশ্বাসে আঘাত হানে।

আসলে লেখক এই নারী চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্বময়ী, আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী, মূল্যবোধে সিক্ত একজন বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। আর ধীরে ধীরে জীবনযাত্রায় নানা পরিস্থিতি তার সেই সত্তার বহিঃপ্রকাশে সাহায্য করতে থাকে। অঞ্জলির বোধে ধরা দেয় প্রবীর তাকে ভালোবাসার নামে আসলে করুণাই করতে চায়। তাই প্রেমিক হিসাবে প্রবীর যখন অর্থ সাহায্য করতে চায় তখন তা গ্রহণে অঞ্জলির আত্মসম্মান বোধ বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, অর্থাভাবে প্রবীরের দেওয়া হীরের আংটিটি বাধা রাখবার সংবাদে প্রবীরের মনের অস্বস্তি তথা বিরূপতাকেও অঞ্জলি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কাজেই তা ফিরিয়ে আনবার সংকল্পও সে মনে মনে তখন থেকেই করতে থাকে। তাই আমরা দেখি, অঞ্জলি স্বসম্মান বজায় রেখে চাকরি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এই চাকরি গ্রহণের মূলে ছিল পরিবারের মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে আসলে আত্মসম্মান বজায় রাখবার উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অঞ্জলির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রবীরের পরিবারের সদস্যদের করা অপমানই তার বাবাকে মূল্যবোধ বিসর্জনে বাধ্য করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন পুলিশ এসে অঞ্জলির ভাইকে ধরে নিয়ে যায় তখন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার কাছে কোন যুক্তি ছিল না। এই পরিস্থিতি তাকে হীনমন্য ও নির্বাক করে তোলে। তার

অস্তিত্বকে আলোড়িত করে। তাই এবার সে আর আগের মত হৃদয় যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে প্রবীরের বুকে আশ্রয় নেয়নি। শুধু তাই নয়, প্রবীরের বিয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে অঞ্জলি জানিয়ে দেয় –"আমি ও ঘরে গেলে তোমার শুধু জাতই যাবে না, হয়তো ধন প্রাণ নিয়েও টান পড়বে। .....হয়তো বাবার মত এক হাতে চুরি করব। ভায়ের মত আর এক হাতে মাথায় লাঠি মেরে বসব। আমার আর গিয়ে কাজ নেই ওখানে।"[৩১০] আসলে সে অনুধাবন করে প্রবীরের সংসারে স্ত্রী হিসাবে পদার্পণ করা মানে পরিবারের অন্যান্যদের কাছে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্যের এবং প্রবীরের কাছে অনুকম্পা তথা করুণার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকা, যা অঞ্জলির মত ব্যক্তিত্বময়ী নারীর পক্ষে আত্মমর্যাদার সঙ্গে এই আপোস করা কঠিন। তাই দু'জন নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক অসবর্ণের ঘেরাটোপেই বাঁধা পড়ে থাকে। অঞ্জলি অসবর্ণা তা যেন প্রবীরের মাধ্যমেই ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। ফলস্বরূপ দুটি বিষম বলয় পরস্পরকে স্পর্শ করে একটি জায়গায় এসে যেন স্থির হয়ে আছে। কাজেই এই দুজন মানব-মানবীর হৃদয়াকাশে উদিত একফালি ভালোবাসার চাঁদ আজ স্থির, তাতে অমাবস্যাও নেই, পূর্ণিমাও নেই, আছে শুধু অস্তিত্ব।

'টর্চ' (গল্পমালা - ৩), গল্পটির রচনাকাল **১৩৫৬** বঙ্গাব্দ। ঐ বছর আষাঢ় মাসে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। টর্চ হল অন্ধকারে আলো জ্বালাবার একটি যন্ত্র। লেখক তাঁর শৈলীগুণে এই যন্ত্রটির সাহায্যে দু'জন নর-নারীর মনোলোকের ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর তারই নিরিখে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা নবরূপে নির্ণীত হয়েছে।

আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসাবে আঠারো-উনিশ বছরের যুবক মানিককে পাওয়া যায়। অর্থাভাবে পুথিগত বিদ্যা সঞ্চয়ে ব্যর্থ হলেও সে যে তা বুদ্ধিবলে পুষিয়ে নিতে সক্ষম তার পরিচয় পাওয়া যায়। মফঃস্বল শহরের আদপ-কায়দায় বেড়ে ওঠা এই চরিত্রটি প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তার বিপরীতে রয়েছে মানিকের চেয়ে বছর খানেকের বড়, এমনকি, বিদ্যা-বুদ্ধি-যশ-খ্যাতি রূপে, সর্বোপরি সামাজিক পদমর্যাদায় প্রথম শ্রেণীতে অবস্থানকারী নারী হিসাবে সুরমা চরিত্রটি। এটি পূর্ববর্তী গল্প 'অসবর্ণা' -এর বিপরীত কাঠামোরই প্রতিরূপ। সেখানে অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসাবে নারীটির মনের অহংবোধ ধরা পড়ে। বাবার এমন মফঃস্বল শহরে বদলির প্রসঙ্গে –"বাবা তোমাকে ভালো মানুষ পেয়ে তোমার সিভিল সার্জন বন্ধু এমন ক'রে ঠকালে তোমাকে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বদলি করলে ?"[৩১১] সুরমার এমন মানসিকতা গল্পের শুরুতেই সিনেমাহলের দ্বাররক্ষী বা পানওয়ালার সঙ্গে তার স্বামীর

সদ্ভাব প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাতেই উঠে আসে। এই গল্পে পাঁচবছর ব্যাপী বিস্তৃত একটি ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাতে সুরমার বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে তার দাম্পত্য জীবনের একটি পর্বে এসে। কাজেই তার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে গল্পের সূচনা হলেও বর্তমান থেকে অতীত এবং সেখান থেকে পুনরায় বর্তমান জীবনে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি এখানে পরিলক্ষিত হয়।

পাঁচবছর পূর্বে সূচিত একটি ঘটনার মূলে ছিল সুরমার প্রতি মানিকের মুগ্ধতার দিকটি। স্টেশনারী দোকানের সাধারণ সপ অ্যাসিস্টান্ট হয়েও মানিক তার শহরে নবাগত এই অভিজাত নারীটির প্রতি অনুরাগে রঞ্জিত হয়েই কিন্তু সে তাদের পরিবারের সঙ্গে নিজের চেষ্টায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ এই পারিবারিক একাত্মতার মূলে ছিল সুরমার সান্নিধ্য লাভ।

তাই আমরা দেখি মানিক সুরমার মায়ের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস যোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক একদিন এক একরকমের দেশি ফুল সে সুরমাকে উপহার দেয়। আর সেই ফুল দিয়ে গাঁথা মালা সুরমা যখন তার পড়ার টেবিলের ফুলদানীকে সাজিয়ে তোলে তখন মানিক আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। তবে শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা অর্থগত পার্থক্যে সমাজের বহু নীচে অবস্থানকারী এই পুরুষ চরিত্রটিকে সুরমা অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখেছে। যদিও মানিকের রূপ ও বুদ্ধির প্রতি খানিকটা আকৃষ্ট হয়েই সুরমা ভেবেছিল, সে যদি তার সমকক্ষ হত তাহলে বোধ হয় আরো বেশী আপন হয়ে উঠতে পারত। এইটুকুই, মানিকের সম্পর্কে এর বেশী ভিন্ন কোন অনুভূতি সুরমার মনে জন্ম নেয়নি। তবে সদ্য বয়ঃসন্ধি অতিক্রান্ত তথা যৌবনের উচ্ছ্বলতায় আবিষ্ট এই যুবকটির মনে তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর কথার মায়াজাল এক বিশেষ অনুভব সঞ্চরণে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া একজন অনাথ মানুষ সর্বদা ভালোবাসার ভিখারি, সেখানে তার প্রণয়প্রার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্য সামান্য সদ্‌ব্যবহার যে মনের কোণে বিশেষ ভাবাবেগের জাগরণ ঘটাবে তা খুব স্বাভাবিক। অর্থাৎ সুরমার কথা বলবার ভঙ্গিমা ও তার আচার-ব্যবহার মানিকের হৃদয়ানুভূতিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আরো প্রগাঢ় করতে সহায়তা করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই ঘটনাক্রমে দেখা যায়, একদিন রাতের অন্ধকারে মানিকের বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে ভেবে সুরমা তার টর্চটি দিতে দিতে মানিককে জানায় –"হুঁ, যেতে পারবে বললেই হোল আর কি। যাওয়া যেন অতই সোজা।"[৩১২] এই কয়েকটি কথা মানিকের মনে ভিন্ন প্রভাব ফেলেছিল। সে সত্যিই সেই রাতে বাড়ি ফিরতে পারেনি। তাই গভীর রাতে সুরমার জানালা দিয়ে সেই টর্চের আলো ফেলে তারই কথার পুনরাবৃত্তি করে জানায় –"না যাইনি, যেতে পারিনি। যাওয়া কি অতই

সোজা ?" এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানিকের শারীরিক ভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে এইভাবে –"শিউরে উঠল সুরমার সর্বাঙ্গ, মানিক। তার হাতে কেবল টর্চই জ্বলছে না। টর্চের চেয়েও হিংস্রভাবে জ্বলছে দুটো চোখ।"[৩১৩] লক্ষণীয়, সুরমার শিউরে ওঠার বিষয়টি। সে যে মানিকের মনের ভাবাবেগকে নানাভাবে ত্বরান্বিত করেছিল, হয়তো সে বিষয়ে সুরমা জ্ঞাত ছিল। কেননা প্রথমত – একজন নারী হিসাবে, দ্বিতীয়ত – তার মত চতুর ও শিক্ষিত যুবতীর পক্ষে একজন যুবক এতদিন কোন্ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে তা জানা খুব সহজ ছিল এবং বিষয়টিকে সে প্রভাবিত করেছিল। তাই হয়তো গভীর রাতে নিজের জানালার সামনে মানিকের উপস্থিতি তার মনে আশঙ্কা জাগায়। কারণ তার দিক থেকে মানিকের প্রতি সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর তা থেকেই সুরমা মানিককে 'চোর' বলে অপবাদ দেয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সুরমার বাবা বাড়ির দারোয়ানের সাহায্যে মানিককে শাস্তি প্রদান করেন। অর্থাৎ মানিকের ভালোবাসার উপস্থাপনের ভঙ্গিমাকে সুরমা মনঃবিকৃতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু মানিকের মনের অনুভূতি যে নিষ্পাপ ও খাঁটি তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুরমা চোর বলে অপবাদ দিলেও সে পালিয়ে যায় নি। মানিক দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে শাস্তি গ্রহণ করেছে।

আসলে শহুরে সংস্কৃতিতে বড় হওয়া সুরমার মনের আসল গতি-প্রকৃতিকে মানিক ধরতে পারেনি। সুরমার আচরণের এমন বৈপরীত্য তাকে স্তব্ধ করে দেয়। আমরা দেখি, এই ঘটনার পর গভীর অভিমানে মানিক নানা ভাবে নিজ চরিত্রের অবনমন ঘটায়। এর পর কাহিনীকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এনে উপস্থিত করা হয়েছে। আর সেখানে দেখা যায় – সিনেমা হলে টর্চ হাতে পুনরায় মানিকের সঙ্গে সুরমার সাক্ষাৎ হয়। এবং সে স্বামীর কাছে মানিকের পরবর্তী অধঃপতিত জীবনের নানা সংবাদ পায়। আর তাতেই খানিকটা অনুশোচনায় সুরমার মন আহত হয়। যদিও মানিকের এমন উচ্ছন্নে যাওয়ার সম্পূর্ণ দায় সে গ্রহণ করেনি। আসলে তখনও সুরমা মানিকের অন্তর্জগতের আবেগকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তাই সে মানিকের মনোবিকৃতি দূর করবার উদ্দেশ্যে শুভাকাঙ্ক্ষিণী হিসাবে তাকে উপদেশ প্রদান করতে চেয়েছিল – "এসব চপলতা ছাড়ো মানিক। বিকৃতি দূর কর মনের। সৎ হও, সুন্দর হও, বলিষ্ঠ হও, সুখী হও জীবনে।"[৩১৪] সুরমা মনে করে একদিন সে এই উপদেশ দানে অসমর্থ ছিল। কারণ সে ছিল বাবা মায়ের অধীনে থাকা এক যুবতী কন্যা। কিন্তু আজ সে প্রাপ্তবয়স্কা ও বিবাহিতা। কাজেই তার আর কোন ভয় থাকবার কথা নয়। এরকম একটা মানসিকতা নিয়ে সে মানিকের সঙ্গে দেখা করতে যায় এবং মনে মনে আশা করে মানিক সেই আগের মতই তার মুখে টর্চের আলো

ফেলবে। তবে দেখা যায় অপ্রত্যাশিতভাবে মানিক তার মুখে নয়, পায়ে আলো ফেলে প্রস্থানের দিকে নির্দেশ করে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে মানিকের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে এইভাবে –"মানিকের চোখে কোন ঔৎসুক্য নেই, কৌতূহল নেই, পরিচয়ের চিহ্ন নেই। কিংবা মানিক তাকায়নি তার দিকে, নিতান্ত অভ্যস্তভাবে সুইচ টিপেছে টর্চের। সুরমা একটু থামল, একটু ইতস্তত করল। মানিক যন্ত্রবৎ দোরের দিকে টর্চটা আরো একটু বাড়িয়ে ধ'রে কালো পর্দাটা ফাঁক করে দিয়ে বলল, – 'যান, এই তো রাস্তা।' ...কিসের একটা ব্যর্থতা আর অপমানে বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্ছে। আজও মানিক তাকে অপমান করছে। মুখের উপর টর্চের আলো জ্বেলে নয়, না জ্বেলে। আজ আর দুঃষহ রকমের উচ্ছ্বল নয় মানিকের টর্চ। ভারি ক্ষীণ, নিবু নিবু। আর পরিচয়ের আলো একেবারেই নিবে গেছে।"[৩১৫]

আসলে এই প্রথম সুরমা অনুভব করল কোন মন বিকলন নয়, মানিক সত্যিই তাকে ভালোবেসেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও গভীর ও শান্ত আকার ধারণ করেছে, পূজায় পরিণত হয়েছে। তাই হয়তো মানিক তার মুখে নয়, পায়ে টর্চের আলো জ্বেলেছে। অথচ সুরমার জন্যই তার জীবনের এমন পরিণতি। এই সত্য বোধ সুরমাকে অনুশোচনায় ও আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করে তোলে। হয়তো মানিক সত্যিই একটি 'বিশেষ মুখ' কে এতদিন খুঁজে চলছিল। কিন্তু যেদিন সে মুখের সন্ধান পায় এবং অনুধাবন করে তার পরম প্রিয় পাত্রীটি দাম্পত্য জীবনে সুখে ও শান্তিতে আছে, সেদিনই হয়তো তার অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটে, যা তাকে নিরুৎসাহ ও কৌতূহলহীন করে তোলে। আর এই কারণেই সে পরিচয়ের চিহ্ন রাখতে চায়নি। কেননা, সুরমার কোন ক্ষতি সে কখনোই চাইতে পারে না। তাই একদিন সুরমা তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিলেও মানিক আজ পরিচয়ের চিহ্ন মুছে ফেলে নিরাপদে বাইরের পথ প্রদর্শন করেছে। এখানেই মানিক যেন হেরে গিয়েও জয়লাভ করে। আর হৃদয়ে বেজে ওঠে বিষাদের করুণ সুর। মানিকের অন্তর্জগৎ স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। অন্ধকারে আলো জ্বালবার সময় টর্চের একদিকে থাকে অন্ধকার অপর প্রান্তে আলোর ঝর্ণা নেমে আসে। সুরমার মনের অন্ধকার যেন সেই আলোর ধারায় সিক্ত হয়ে বিলীন হয়ে যায়। অথবা বলা যায়, টর্চের আলো আঁধার রাতে বিভিন্ন বিষয় যেমন আবিষ্কার করতে সহায়তা করে ঠিক তেমনি সুরমার আজ এই বিশেষ ক্ষণে টর্চের আলোর দ্বারা মানিকের মনের প্রধান রসধারার সন্ধান পায়, রহস্য উন্মোচিত হয়। কৃতকর্মের দায়ে এবং এই উন্মোচিত রহস্যের ক্রিয়ায় সুরমার মনোলোক -এর ক্ষত ক্রমশ গভীর হতে থাকে।

একটি টর্চের মাধ্যমে লেখক এই দু'জন নর-নারীর মনের আলো-অন্ধকারের দিকটি

তুলে ধরেছেন। প্রথমাবস্থায় সুরমা হয়তো মানিকের সঙ্গে সেভাবে কোন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়নি। কিন্তু এই প্রথমবার নবলব্ধ অনুভূতির মাধ্যমে সে অনুভব করল – আসলে মানিকের সঙ্গে তার বাঁধনের মূল বহু গভীরে বিস্তৃত। কেননা, মানিক এখনও সেই সম্পর্কের ভার তার জীবনে বয়ে নিয়ে চলছে। তবে আজ সেই জয়ী। কেননা, সত্য অনুধাবন এবং কৃতকর্মের আত্মগ্লানি সুরমার মনে সঞ্চরণে মানিক শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে।

এই সম্পর্ক যেন এক বিজেতার সঙ্গে আর এক পরাজিতার সম্পর্ক। যাতে আছে দুই হৃদয়ের সূক্ষ্ম টানাপোড়েন।

মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুরূপতায় আরও একটি পালক যুক্ত করে দেয় **'অমনোনীতা'** নামক গল্পটি। এখানে প্রাক্-বিবাহ জীবনের অন্তর্গত দু'জন যুবক-যুবতীর মনের এক বিশেষ ভাবাবেগ সময়ের ব্যবধানে তাদের দাম্পত্য জীবনপর্বে এক আকস্মিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবরূপ লাভ করে। যেহেতু কাহিনীর নায়ক-নায়িকার মধ্যেকার এই বিশেষ সম্পর্কের সূত্রপাত তাদের বিবাহ পূর্ববর্তী জীবনে তাই গল্পটিকে আলোচ্য পর্বে রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি ('অমনোনীতা' - গল্পমালা-৩) ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'মাসিকপত্র' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই গল্পে সময়কাল চার বছর ব্যাপী বিস্তৃত। সেখানে আছে দুটি স্তর যথা – প্রাক্ বিবাহ ও বিবাহ পরবর্তী জীবন পর্ব। পরিবার যখন কোন প্রাপ্তবয়স্ক যুবতীর বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে তখন, সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে নারীটির মনে বিশেষ ভাবাবেগ জন্ম নেয়। আলোচ্য গল্পের নায়িকা ফুল্লরার মনের এই আবেগ ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে পূর্বরাগের জন্ম দেয়। আমরা জানি, পূর্বরাগ সৃষ্টির মূলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শ্রবণ ও দর্শনজনিত কারণও নিহিত। কাহিনীর নায়ক তথা পাত্র ধীরঞ্জন মিত্র সম্পর্কে নানারকম তথ্য ফুল্লরা তার পরিবার সূত্রে লাভ করেছিল। শুধু তাই নয়, পাত্রের চিত্র দর্শনেরও সুযোগ ঘটেছিল তার। কাজেই সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীকে কেন্দ্র করে ফুল্লরার মনের কোণে যে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা গড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। আর এই কারণেই ধীরঞ্জন -এর আগমনে ফুল্লরার মনের সেই প্রতিক্রিয়া তার নানা আচরণে ফুটে উঠতে থাকে। তাই দেখা যায়, পাত্রকে প্রত্যক্ষ দর্শনের পূর্বেই দাদার জবানীতে লেখা ধীরঞ্জন -এর হস্তাক্ষরের চিঠি নিয়ে ফুল্লরা তার ভাই-এর সঙ্গে বাজি রাখে; নিজের হাতে কাঙ্ক্ষিত অতিথির জন্য বিভিন্ন পদ রান্না করে। কেবল তাই নয়, সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর জন্য পরিপাটি করে বিছানা সাজায়, নিজের হাতের কাজের নমুনা হিসাবে বালিশের উপর ঢাকনি জড়িয়ে দেয়, ফুলদানিতে

রাখে কয়েকটি রজনীগন্ধা। ভাই -এর হাতে পান সেজে পাঠায়। আবার ধীরঞ্জন -এর ধুমপানের সামগ্রী হিসাবে দেশলাই নিয়েও ভাই -এর সঙ্গে ফুল্লরা ছদ্ম-কলহে মত্ত থাকে। আসলে এর মূলে ছিল ধীরঞ্জনের কাছে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করা।

পরের দিন দু'জন পাত্র-পাত্রীর প্রত্যক্ষ দর্শনে ও কথোপকথনের মাধ্যমে ফুল্লরার মনের যে পুলক এবং প্রসন্নতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা বিশেষ লক্ষণীয়। এছাড়া আমরা আরও একটি বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, ফুল্লরা ধীরঞ্জন-এর কথায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয় এবং তাদের এই অলিখিত সম্পর্কের পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আশ্বস্ত হয়। আর তাই হয়ত ধীরঞ্জনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়-এর পর ফুল্লরার ছদ্ম আড়ষ্টতা দূর হয়। সে অনেক বেশি সহজ ও সাবলীল আচরণ করতে থাকে। কল্পনার রাজ্যে সে হয়তো এই সম্পর্কের পারদ ক্রমশ চড়াতে থাকে। তবে ফুল্লরার মনের এই পূর্বরাগ পাত্র ধীরঞ্জনের মনে সঞ্চারিত হতে পারেনি। নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত পাত্র ধীরঞ্জনের পক্ষে একটি মফঃস্বল শহরে পাত্রী দেখতে যাওয়া ছিল প্রথম বিরক্তির কারণ। সেই বিরক্তি ফুল্লরার পরোক্ষ আতিথেয়তায় এবং তার পরিবারের সেবা যত্নে খানিকটা প্রশমিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই উদ্যোগপর্ব পাত্রের মনে কোন রোমান্স সঞ্চারিত করতে পারেনি। বরং পরের দিন সরাসরি পাত্রী দর্শনে তার চক্ষু ও হৃদয় পীড়িত হয়। অত্যন্ত কালো ও কুৎসিত ফুল্লরা ধীরঞ্জনের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে সেই মুহূর্তে অমনোনীতা হয়ে যায়। তবে ধীরঞ্জন তার মনোবৃত্তি প্রকাশ করেনি বরং বিপরীত আচার-আচরণে ও কথার মায়াজালে ফুল্লরার জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটুকুকে মাহেন্দ্রক্ষণ করে তোলে। এ বিষয়ে তার স্বীকারোক্তি –"একবার যেন মায়া হল। মনে হল, আর কেন, ছেড়ে দিই এই নিরীহ আশ্রমমৃগীকে। কথার মায়াজালে ওকে মিছিমিছি জড়িয়ে আমার লাভ কি, কি দরকার এই নিষ্ঠুর খেলায়! কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। ভাগ্য কি আমার সঙ্গেই কম খেলা খেলেছে ? কি দরকার ছিল এর জন্য আমাকে এতদূরে এই রংপুর পর্যন্ত টেনে এনে সমস্ত রাত ভরে সকাল ভরে বিচিত্র বর্ণের পটভূমি তৈরী করে শেষে তার ওপর আকস্মিক এই কালো তুলি বুলিয়ে দেওয়া ? আমি কেন তার শোধ নেব না ?"[৩১৬] আমরা ধরে নিতে পারি যে, ধীরঞ্জনের এই ভাবনার মূলে ছিল তার বয়স ও শহুরে সংস্কৃতিসম্পন্ন মানস-কাঠামো। যেখানে দাঁড়িয়ে গুণের তুলনায় রূপই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। তার মতে নারীর রূপও দুর্লভতম গুণ। এই মানসিকতার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে গল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই ঘটনার চার বছর পর কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করবার আগে একটি তথ্য

আমরা লাভ করি – ফুল্লরার তুলনায় ধীরঞ্জনের পত্নী মনোরমা হলেও তার মনোবৃত্ত্যানুসারিণী হয়নি – এই বিষয়টিও লক্ষণীয়। এরকম পরিস্থিতিতেই ফুল্লরার সঙ্গে ধীরঞ্জনের আকস্মিক ভাবে একবার সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে দেখা যায়, ফুল্লরা পূর্বপরিচয় স্বীকার করে ধীরঞ্জনের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে। এখানে আরও একটি বিষয় ধরা পড়ে – অবিবাহিত জীবনে যেখানে ফুল্লরা অমনোনীতা হিসাবে গণ্য হয়েছিল, সেখানে বিবাহিত জীবনের সাজ-পোশাকে সজ্জিতা ফুল্লরার সৌন্দর্য ধীরঞ্জনের চোখে এক বিশেষভাবে ধরা দেয়। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পিছনে আছে সময় ও পরিস্থিতির রূপান্তর। স্বাভাবিকভাবে ফুল্লরা অপমানবোধে পূর্বপরিচয় স্বীকার নাও করতে পারত। কিন্তু তা সে না করে সৌজন্য ও শিষ্টাচারেরই পরিচয় দেয়। এই বিষয়টিই গল্পের নায়কের মানসলোকে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার ভাবান্তর ঘটায়। আর সেই হৃদয়গ্রন্থী থেকেই তার মনে বার বার প্রশ্ন উঁকি দেয় – ফুল্লরা সত্যিই তার দাম্পত্য জীবনে সুখী হয়েছে কি না। হয়তো বা সেই সুখের বার্তা ধীরঞ্জনের কাছে ঘোষণা করবার জন্যই তার এমন বিপরীত আচরণ। আবার হয়তো ফুল্লরার জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিই চরম সত্য। আর সেই সত্যানুভূতিরই ক্রিয়া তার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে। মনের কোণে ভিড় করে ওঠা নানা প্রশ্নের জবাব কাহিনীর নায়ক ধীরঞ্জনের জানা সম্ভব না হলেও আমরা পাঠকবর্গ অনুমান করি – ফুল্লরার জীবনের এই দুটি দিকই সত্য। গোপনে সযত্নে রাখা মনের কোণের সেই কাঁচা রং লাগানো বিশেষ ক্ষণটিই তার জীবনের মূলধন। আর সাজ-পোশাক, বিলাস-বহুলতা তার বাহ্যিক সুখ-সমৃদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হয়তো তা কখনোই তার অন্তরকে স্পর্শ করেনি। আর এটাই ফুল্লরার জীবনে সবচেয়ে বড়ট্র্যাজেডি।

অপরদিকে জীবনের এক প্রান্তে এসে নায়কের হৃদয়ভূমিতে জাগ্রত নানা অনুভূতি তথা ভাবান্তর মানব-মানবীর বৈচিত্র্যময় সম্পর্কের আর একটি দিককে সূচিত করতে সাহায্য করে, যা এই গল্পের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে।

এই পর্যায়ে আলোচ্য পরবর্তী গল্প **'শুল্ক'** (গল্পমালা-৪)। আর্থিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। তবে উক্ত বাহ্যিক কাঠামোকে অতিক্রম করে মননক্ষেত্র থেকে উত্থিত এক বিশেষ অনুভবেই আলোচ্য গল্পের মূল রস নিহিত। আর এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই দু'জন মানব-মানবীর মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় – যা থাকে অপ্রকাশিত, অস্বীকৃত, যার অস্তিত্ব শুধুমাত্র দুটি হৃদয়ের অনুভবে বিরাজমান।

১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'বসুমতী' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'শুল্ক' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রতিফলিত হয়েছে। সেই পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আলোচ্য কাহিনীর নায়ক চরিত্রকে এক অভিজ্ঞ নিপুণ ব্যবসায়ী হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে; পাশাপাশি নায়িকা চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে উদ্বাস্তু জীবনযাত্রার একজন প্রতিনিধি রূপে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অর্থসংকটে জর্জরিত একজন মানুষের কাছে পারিবারিক চাহিদা পূরণ ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার বিষয়টিই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রয়োজনের তাগিদে গল্পের নায়ক পূর্ববাংলার বাসিন্দা লালমোহন ভারত থেকে সস্তায় পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে নিজের দেশে চড়া দামে বিক্রি করবার ব্যবসাকে বেছে নিয়েছে। যদিও এই নিষিদ্ধ ব্যবসায় এর আগে একবার সে ধরা পড়ে। তথাপি বাধ্য হয়ে সে পুনরায় এই কাজে নিযুক্ত হয়। তবে লালমোহন পূর্বের তুলনায় যে আরও অনেক বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা আমরা কাহিনীসূত্রে লাভ করি। সে জেনেছে পুরুষ কাস্টমস্ অফিসারের তুলনায় লেডী কাস্টমস্ অফিসার খানিকটা নরম। তারা মেয়েদের তেমন সার্চ করে না। তাই কোন নারীকে যদি আত্মীয় -এর পরিচয় দিয়ে অফিসারের সামনে উপস্থাপন করা যায় তাহলে মালগুলিকে পাস করাতে বিশেষ সুবিধা হবে। এই উদ্দেশ্যে সামনে লালমোহন বেরিয়ে পড়ে। তখন গল্পের নায়িকা চম্পার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। উঠে আসে রেলস্টেশনের পাশে ছড়িয়ে থাকা উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর জীবন চিত্রণ। সেখানে প্রতিনিয়ত তারা পরস্পরের বাঁচার লড়াই-এ মত্ত। মানসিক সম্পর্ক তথা মূল্যবোধ সেখানে ঠুন্‌কো। নারীর আব্রু ও সম্মান প্রতিমুহূর্তে সেখানে স্খলিত হয়। সেই জগতেরই প্রতিনিধি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে চম্পা। অনাহারে ক্লিষ্ট হয়ে সে স্বভাববশত লালমোহনের কাছে হাত বাড়ায়। চম্পার অভিজ্ঞতায় আছে এমন যুবকদের কাছে হাত বাড়ালে তার পরিবর্তে তাকেই কিছু দিতে হয়, কারণ তাদের চোখের ক্ষুধা আরও বেশি তীব্র ও ভয়ানক। লালমোহনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না তা সে ধরে নিয়েই এগিয়ে যায়। কিন্তু লালমোহনের স্ত্রী সাজবার প্রস্তাবে চম্পা বিস্মিত হয়। এই প্রস্তাব যেন চম্পার বদ্ধ মনে মুক্ত হাওয়ার সমান, যা মনের কোণে দোলা দেয়। দেখা যায়, ছদ্ম স্বামী লালমোহনের তৎপরতায় ধীরে ধীরে চম্পা স্ত্রী রূপে সেজে ওঠে, পরিপূর্ণতা আনতে লালমোহনের নামে সিঁদুর পরে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, প্রত্যেকটি কুমারী নারীর মনেই তার সম্ভাব্য স্বামী, বিবাহিত জীবন, সন্তান ইত্যাদি বিষয়ে নানা কল্পনার দানা জমাট বাঁধতে থাকে। আসলে সমগ্র জীবনধারায় বিবাহ একটি বিশেষ পর্ব যার মধ্য দিয়ে মানব-মানবীর জীবনে নতুনের জোয়ারে আসে নানা

পরিবর্তন। এই পরিবর্তন নারীর সমগ্র ব্যক্তিসত্তায় পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। বিশেষত, হিন্দু রমণীর ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রতিফলিত। কারণ তারা বিশেষ সাজ-পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা-সিঁদুর বিবাহিত জীবনের স্মারকচিহ্ন হিসাবে পরিধান করে থাকে। কাজেই এই পর্বের বিশেষ রূপ-সৌন্দর্য ও সংস্কার হিন্দু নারীর রক্তে যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী বহমান। তাই এই বিষয়টি যে কুমারী নারী হিসাবে চম্পার রক্তেও সম্পৃক্ত থাকবে তা খুব স্বাভাবিক। এই কারণে বলা যায়, তার সাজ-সজ্জা ছদ্ম হলেও মনের অনুভূতি ও পুলক ছদ্ম ছিল না। মিথ্যার আড়ালে ছিল সত্যের আবেশ। তাই হয়তো নিজেকে সাজিয়ে তুলতে তুলতে চম্পা আড় চোখে লালমোহনের দিকে তাকায়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের গৌরবর্ণ, সুন্দরপনা, ছিপছিপে এই যুবক তথা স্বামীকে দেখে চম্পা মুগ্ধ হয়। মনোলোকের জাগ্রত বিশেষ অনুভূতির অস্তিত্বকে প্রশমিত করে বা বলা যায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চম্পার এই মুগ্ধ দৃষ্টির মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, এই ভাবাবেগ থেকেই সে লালমোহনকে প্রশ্ন করে - "....কিন্তু অবিয়াত মাইয়া। এ সিন্দুর সিঁথিতে কতক্ষণ রাখতে পারব ? মাইনষের চউখ পড়বে যে।"[৩১৭]

অপরদিকে দেখা যায়, কুমারী চম্পা যখন ধীরে ধীরে বধূ হিসাবে সেজে ওঠে তখন তার রূপ-সৌন্দর্যের মুগ্ধতা ব্যবসায়ী লালমোহনকেও স্তব্ধ করে দেয়। তবে তার প্রয়োজনের তাগিদ সেই অনুভবকে গভীরে অনুপ্রবেশ করতে বাধা দেয়। তাই সে চম্পার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং একটা সময় দেখা যায়, চম্পার সহায়তায় লালমোহনের সমস্ত প্রয়াস সফল হয়। সে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যাত্রাপথে তারই বিপরীত বেঞ্চে বসা এক বিবাহিত মহিলাকে দেখে লালমোহনের হৃদয়ভূমিতে চম্পার প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাজানো স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিল ছদ্ম স্বামী। তার এই বিশেষ অনুভূতি এবার গভীরে প্রবেশ করে ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় লালমোহনের উদাস মন ছুটে গিয়ে চম্পার হাতখানা ধরতে চায়। আবার পরক্ষণেই মনে আশঙ্কা জন্মায় – "কিন্তু কার হাত ধরবে লালমোহন ? এই ভিড়ের মধ্যে চম্পাকে ফের কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে ? ফের কি চেনা যাবে তাকে ? সেই সিঁদুরের ফোঁটা কি সে এখনও ধরে রেখেছে কপালে ? অপমানে, অভিমানে সঙ্গে সঙ্গে কি মুছে ফেলেনি ? কিংবা সেই অভিমানের বশেই ওই একটু সিঁদুরের ফোঁটা সম্বল করে এতক্ষণে চম্পা আর একজনের সঙ্গিনী সেজে তার মাল পাস করাচ্ছে কি না, তা-ই বা কে জানে ?"[৩১৮] আসলে ভালোলাগা তথা ভালোবাসা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয়, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চাহিদাকে অতিক্রম করে একজন মানবীর প্রতি

একজন মানবের হৃদয়ের এ আর্তি ও ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। মনের এই অনুভবই সত্য ও খাঁটি, যা মানব-সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উপকরণ।

আলোচ্য গল্পে চম্পার প্রতি লালমোহনের মনে যখন থেকে এই বোধ জাগ্রত হয়, বা বলা যায়, যখন সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় সেই মুহূর্ত থেকেই এই দু'জন মানব-মানবী অলিখিত এক বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যায়।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের সমাজ কাঠামোয় অর্থনৈতিক দিক থেকে মেয়েরা অনেকখানি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল ঠিকই কিন্তু বেশিরভাগ নারীরাই ছিল পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন বিত্তবান সচ্ছল পুরুষকেই প্রত্যেকটি মেয়ে তার জীবনসঙ্গী হিসাবে কামনা করত সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-এর আশায়। এই বিষয়টি খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছে **'দীপান্বিতা'** গল্পে। সেই সঙ্গে এখানে আছে দু'জন যুবক-যুবতীর পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। আর এই দুইয়ের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা একটি সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয় তাই আমরা এখানে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে দুই বন্ধুর পুনর্দর্শনের মধ্য দিয়ে আলোচ্য গল্পের কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। সেখানে নায়ক চরিত্র অর্থাৎ বীরেনের যে পরিচয় ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায়, সে অত্যন্ত সৌখিন রুচির অধিকারী। আর তা যে আর্থিক সংগতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব সে বিষয়টি অর্থ সমস্যায় জর্জরিত থাকা বন্ধু শিশির ও তার পরিবারের সদস্যরা অনুমান করতে করতে পেরেছিল এবং বীরেনের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছিল । বিশেষত, শিশিরের বোন তথা এই গল্পের নায়িকা অরুণা স্বাভাবিকভাবে এই সুদর্শন ও অর্থবান যুবকটিকে ভাবী জীবনসঙ্গী হিসাবে মনে মনে গ্রহণ করে বসে। এর ফলশ্রুতিতে তার মনে পুলক সঞ্চারিত হয়। আর তা আরও ঘনীভূত হয় চা দিতে গিয়ে বীরেনের সঙ্গে তার হাতের আকস্মিক স্পর্শে। এই স্পর্শ অরুণার শরীরের মধ্য দিয়ে হৃদয়তন্ত্রীতে পৌঁছোয়। অপরদিকে বীরেনের চোখেও অরুণা মোমের আলোয় এক অন্য রূপে ধরা দেয়। কাজেই বলা যায়, প্রথমদিন থেকেই এই দুটি 'মন' এক অলিখিত সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। আর সেই সম্পর্ককে অরুণার পরিবারের সদস্যরাও মান্যতা দেয় বীরেনের অর্থগত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। ফলস্বরূপ মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে দুটি মানুষ পরস্পরকে আপন করে নেয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, বীরেন চরিত্রগত দিক থেকে যেমন সৌখিন, অন্ততপক্ষে সৌখিনতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে তেমন অন্যের জীবনকেও সে

সৌখিনতার আলোয় আলোকিত করতে চায়। এ তার এক বিশেষ রুচির-ই বাহক। বৈদ্যুতিক বাতির সংযোজন নাগরিক সভ্যতায় বিলাসিতা তথা সৌখিনতারই আর এক রূপ। যার স্পর্শ দানে বীরেন সফল হয়েছিল শিশিরের বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো সচল করবার মাধ্যমে। হয়তো সে অরুণার জীবনকেও নিজের মত করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করত। কিন্তু পরিস্থিতি অন্য কথা বলে। ঘটনাক্রমে আমরা দেখি, অরুণা ও তার পরিবার সত্যের মুখোমুখী হয়ে জানতে পারে বীরেন কোন মার্চেন্ট অফিসে কর্মরত নয়, সে একজন সামান্য 'ইলেকট্রিক মিস্ত্রি'। বাস্তবের এই আঘাতে অরুণা আহত হয় এবং বীরেনের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। গল্পের চূড়ান্তরূপ শেষ লাইনে –"দু'দিকের বাড়িগুলিতে তখন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠেছে"[৩১৯] এ বিষয়ে বলা যায়, 'দীপান্বিতা' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল - 'দেওয়ালীর রাত্রি'। লক্ষণীয়, গল্পে বস্তুজগত যখন আলোকধারায় স্নাত ঠিক তার বিপরীতে তখন একটি 'মন' অন্ধকারের গভীরে কূপে নিমজ্জিত। যেখানে যুক্ত থেকে যায় একটি সম্পর্কের ভবিষ্যৎ। একটি প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার চতুর্দিক আলোক শিখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রদীপটি তার নিজের দেহের কালিমাকে মোচন করতে সক্ষম হয় না। বীরেন অরুণার মনে প্রেমের দীপশিখা প্রজ্জ্বলনে সমর্থ হলেও নিজের অন্ধকারময় সত্তাকে অরুণার কাছে আলোকিত করতে সে ব্যর্থ। আর এই ব্যর্থতার উপরেই তাদের সম্পর্ক নির্ভরশীল হয়ে থাকে। মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুমুখী ধারায় আর একটি দিক প্রতিফলিত হয়েছে এই 'দীপান্বিতা' গল্পে। পরবর্তী সময়ে একটি 'মন' (অর্থাৎ অরুণার সত্তা) বস্তু জগৎ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে কিনা, অপরদিকে আর একটি সত্তা (বীরেন) আপন আঁধার ঘুচিয়ে একাকার হওয়ার শক্তি অর্জন করবে কিনা আলোচ্য গল্পে সে প্রশ্ন ভবিষ্যৎ সময়ের কাছে তোলা রইল।

'সুদর্শন চৌধুরী' নামক গল্পটিতে কেন্দ্রিয় চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে গল্পের নামকরণ রচিত হয়েছে। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে 'মন্দিরা' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কাহিনীসূত্রে লব্ধ একজন যুবক তার ভালোলাগার বিষয়টি ভালোবাসায় বিকশিত করবার মাধ্যম হিসাবে 'গল্প লেখা'কে বেছে নেয়। গল্পের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে সে তার মানসলোকের নানা অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করে। তার ভাবাবেগের কেন্দ্রে থাকা নারীটি যেন তার বেঁচে থাকবার প্রেরণা স্বরূপ। তার মন এই ভালোলাগার পাত্রীকে ঘিরে নানা স্বপ্নের জাল বোনে। আর সেটি গল্পের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত করেছিল। তবে এই হৃদয়ের আর্তি তার ভালোবাসার মানুষটির 'মন'কে স্পর্শ করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, পারিপার্শ্বিক পাঠকবর্গও তা উপলব্ধি করতে

অক্ষম হয়। কাজেই তারা গল্পটিকে সহজভাবে গ্রহণ করে না। ফলে তার জীবন থেকে একসময় 'গল্প লেখা' হারিয়ে গেলেও প্রেমানুভূতি জীবন্ত থাকে। আর তার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে 'প্রবন্ধরচনা' -কে সে বেছে নেয়। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই প্রাবন্ধিক উপলব্ধি করে, যে তার সমস্ত জীবনভাবনায় জড়িয়ে আছে সে এখনো তার সেই ভাবাবেগকে অনুভব করতে সমর্থ হয়নি। শুধু তাই নয়, গল্প লেখক থেকে তার প্রবন্ধিক হয়ে ওঠার গোপন বেদনাও অন্ত রালে থেকে গিয়েছে। অর্থাৎ তার মনের ভাবকে আর একটি মনে সঞ্চারণে সে ব্যর্থ। আলোচ্য গল্পে এই ব্যর্থ জীবনেরই বাহক সুদর্শন চৌধুরী। সে শুধুমাত্র নিজের বৃত্তেই আবদ্ধ। তার মনবৃত্তে আকাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে যেমন সে উপস্থাপন করতে পারেনি তেমনি নিজেও অপর হৃদয়বৃত্তে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাদের সম্পর্ক একমুখী রয়ে গিয়েছে। তার কোনরকম বিকাশ ঘটেনি। এই ব্যর্থতার যন্ত্রণায় সুদর্শন চৌধুরী ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। এই দিকটাই গল্পে মু খ্য বিষয় হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

একটি নারীকে কেন্দ্র করে দুজন পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুটিত হয়েছে **'দয়িতা'** গল্পে। এটি মূলত ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী। যার এক প্রান্তে দু'জন পুরুষ চরিত্র আছে। এই দুই যুবক আবার পরস্পরের বন্ধুত্বর সম্পর্কে আবদ্ধ। আমাদের সামগ্রিক আলোচনায় মানব-মানবীর মধ্যেকার প্রেমের সম্পর্ককে মূলত আমরা প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আসলে মানব হৃদয়ের প্রেমানুভূতি-ই জীবন চলার পথে এক শ্রেষ্ঠ পাথেয়। এই প্রেমের সম্পর্কেও যে নানা বৈচিত্র্যের রং সংক্রামিত থাকে তারই একটি দৃষ্টান্ত আলোচ্য গল্পটিতে। যেহেতু ত্রিকোণ কাহিনী কাজেই এখানে সমান্তরাল দুটি সম্পর্কের রূপরেখা উঠে এসেছে। কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করব।

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'বসুমতী' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় 'দয়িতা' গল্পটি 'প্রেম' নামে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তন করে লেখকের 'অসবর্ণা' গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গল্প কাহিনীতে প্রাপ্ত প্রধান তিনটি চরিত্র হল – অর্চনা, গৌতম ও শ্যামল। দেখা যায়, অর্চনার সঙ্গে শ্যামলের পরিচয় ছেলেবেলা থেকে। উচ্চশিক্ষিতা অর্চনা শ্যামলের তুলনায় বছর দুয়েকের বড়। জীবনের এক প্রান্তে এসে তাদের পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে। অপরদিকে শ্যামল ও গৌতম দু'জন সহকর্মী ও বন্ধু। বর্তমান কর্মস্থলে এসে তাদের মধ্যে সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সখ্যতার মূলে ছিল তাদের প্রায় একই রকমের পারিবারিক চাহিদা ও সমস্যা। অর্থসংকট এবং সমাজগত

অবস্থানের সাদৃশ্য। সেই সঙ্গে তারা একই বেতন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এই বাহ্যিক সাদৃশ্যের আড়ালে অন্তরের দিক দিয়ে তারা ছিল দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা।

প্রথমে আমরা গৌতম নামক চরিত্রটি সম্পর্কে জেনে নিই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গল্পের কথকই যে গৌতম সে তথ্য পাঠকবর্গের কাছে উপস্থিত। এই গৌতমের মধ্যে একটি 'শিল্পী মন' বর্তমান। কাজেই বাস্তব জগতের চেয়ে কল্পনার রাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে সে বেশি ভালোবাসে। তাই অফিসের কাজের প্রতি তার তেমন দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায় না। সে আপন কথার মায়াজালেই মুগ্ধ। গৌতম তার কথার যাদুস্পর্শে পারিপার্শ্বিক সকল মানুষকে আকৃষ্ট করতে চায়। সে একটু আধটু গান গাইতে পারলেও গাওয়ার চেয়ে গান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার প্রতি তার ঝোঁক বেশি, 'কলম দিয়ে লেখার চেয়ে স্কেচ আঁকতেই ওর বেশি উৎসাহ'। বিভিন্ন সম্পর্কের স্বাদ আস্বাদন করবার উদ্দেশ্যে সে নানা সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী। এমনকি, গৌতম বিশ্বাস করে আমরা প্রতিটি মানুষই খণ্ড। কেউ পূর্ণ ভাই, স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু বা প্রিয় হতে পারি না। কাজেই খণ্ড খণ্ড সত্তাকে জয় করতে করতে সে পূর্ণতায় পৌঁছোতে চায়। কঠিন বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়াই তার স্বভাবের একটি বিশেষ দিক। কল্পনাবিলাসী এরকম একটি চরিত্রের সঙ্গে শ্যামলের সূত্র ধরে গল্পের নায়িকা অর্চনার পরিচয় ঘটে। গৌতম শ্যামলের সমবয়সী। সুতরাং সেও অর্চনার চেয়ে বয়সে ছোট। তথাপি অর্চনাকে দেখে তার মনে কৌতূহল জন্মে। এরকম একজন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তার মন উৎসাহী হয়ে ওঠে।

অপর দিকে কাহিনীতে ঝলকের মাধ্যমে উঠে আসে অর্চনার পূর্ব জীবন-অভিজ্ঞতা। সেখানে দেখা যায়, অর্চনা জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত ও নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। প্রেমিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির পথে এগিয়ে চলে এবং একটা সময় তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। প্রেমিক-পুরুষটি অন্যত্র বিবাহ করে। এই ঘটনা অর্চনার জীবন ও মনে গভীর ভাবে আঘাত হানে। প্রতিক্রিয়ায় সে শহরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে যুক্ত করে। হয়তো সেই কর্মক্ষেত্রও তার একাকীত্বকে দূর করতে ব্যর্থ হয়। তাই পুনরায় সে ফিরে এসে কাজের খোঁজে শ্যামলের কাছে উপস্থিত হয়। আসলে অর্চনা রক্ত-মাংসে গড়া একজন সাধারণ নারী। স্বামী-সন্তান নিয়ে একটি সুখী দাম্পত্য জীবনকে সে মনে মনে কামনা করে। আর অর্চনার মনের এই আকাঙ্ক্ষাকে ক্রমশ প্রভাবিত করেছিল তার ছোট বোনদের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনের দিকটি। সে জানত তার বোনেরা দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে যতই বিরক্তি প্রকাশ করুক না কেন আসলে এগুলি তাদের মনের কথা নয়। তারা যে এক অদ্ভুত সুখের সন্ধান পেয়েছে, রস আর রহস্যে ভরা এক অপূর্ব

পৃথিবীর খোঁজ পেয়েছে সেই জগতের আনন্দানুভূতির স্নিগ্ধতা পরোক্ষভাবে অর্চনার মনকেও স্পর্শ করতে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে ঐ রহস্যময় জগতের স্বাদ আস্বাদনে তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই বাসনাকে ভর করেই অর্চনার মন সর্বদা এক নির্ভরযোগ্য মানসিক আশ্রয়কে খুঁজে ফেরে।

এমত পরিস্থিতিতে গৌতমের আন্তরিকতা তাকে স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট করে। ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। এবং একটা সময় দেখা যায়, পরম নির্ভরযোগ্য এই মানুষটিকে অর্চনা তার জীবনের সর্বস্ব সমর্পণ করতেও দ্বিধা বোধ করে না। বরং এই প্রিয় মানুষটিকে একজন নারীর জীবনের সব থেকে মূল্যবান যে সম্পদ তা দিতে পেরে অর্চনা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। পুলকিত চিত্তে সে গৌতমকে জানায় –"আর আমার কোন ভয় রইল না, দায় রইল না। এখন থেকে সব তোমার।"[৩২০] অর্চনার এই উক্তির মধ্য দিয়েই তার মনের সহজ স্বাভাবিক দিকটি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। তবে তার এই দান গৌতমের মনে কোন ভাবাবেগ জাগায়নি। শুধু তাই নয়, অর্চনা যতবার এই সম্পর্কের পরিণতি দানের কথা বলেছে গৌতম ততবারই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিতে চায়নি। আসলে গৌতম সম্পর্ক স্থাপনের নেশায় এই সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। একটি সম্পর্কের ভিত্তিমূলে যে বিশেষ অনুভূতি থাকে তা গৌতমের ক্ষেত্রে মনের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় নি, বা বলা যায়, প্রত্যেকটি সম্পর্ক বজায় রাখবার মূলে থাকে সেই সম্পর্কের দায়িত্ব-কর্তব্যকে মন থেকে পালন করার বিষয়টি, যা গৌতম নামক চরিত্রটির মধ্যে অনুপস্থিত। তাই আমরা লক্ষ করি, অর্চনা যতবার তাদের বিষয় সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে কথা বলতে গৌতমকে নিয়ে যেতে চেয়েছে ততবারই সে নানা অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছে।

তার চরিত্রের এই স্বভাব আর একটি ক্ষেত্রেও ধরা পড়ে। গৌতমের মা যখন টাকা চেয়ে ছেলের কাছে চিঠি পাঠায় তখন সন্তান হিসাবে তার দায়িত্ব পালনেও সে কুণ্ঠা বোধ করে। প্রতিক্রিয়ায় সে কখনো বাবা, মার প্রতি ক্ষুব্ধ হয় আবার কখনো তার মনে হয় এর জন্য অর্চনাও দায়ী। কেননা সে টাকার চেষ্টা না করে অর্চনার সঙ্গে অনেক সময় নষ্ট করেছে। আসলে গৌতম একজন কর্মভীরু মানুষ। নিজের ক্ষমতার প্রতি তার আস্থা কম। মূলত বিভিন্ন সম্পর্কের রস আস্বাদনই ছিল তার জীবনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য। এই কারণেই তাদের সম্পর্কের পরিণতি দানে তথা অর্চনার দায়িত্ব গ্রহণের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গৌতম সামান্য অজুহাত দেখিয়ে সমস্ত দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে সহজেই পালিয়ে যেতে পেরেছিল। অর্থাৎ এই সম্পর্ক তার মনের গভীরতম অনুভূতির রসে সিক্ত হতে পারেনি। কাজেই মনের এই অভিব্যক্তির সমর্থনে নর-নারীর

রহস্যময় সম্পর্ক প্রসঙ্গে তারই একটি উক্তিকে তুলে ধরা যেতে পারে –"মেয়ে আর পুরুষের মধ্যে যে সৌহৃদ্য যে ঘনিষ্ঠতা, তা খুব কম সময়েই বন্ধুত্বকে ছাড়িয়ে প্রেমে গিয়ে পৌঁছোয়। একজন পৌঁছয় তো আর একজন সেই লক্ষ ছুঁতেও পারে না। আমরা দূর থেকে দেখি আর ওরা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আসলে হাবুডুবু তো দূরের কথা, হয়ত গলা জলও হয়নি, বুক জল হয়নি, নেহাৎই হাঁটুজল মাত্র।"[৩২১] গৌতমের এমন দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে অর্চনার সম্পৃক্ত সম্পর্ককে ত্বরান্বিত করেছিল।

এর পরবর্তী পর্যায়ে অর্চনার জীবনে শ্যামলের অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রাথমিক স্তরে গৌতমের কারণে অর্চনার এমন শারীরিক ও মানসিক অবনতি শ্যামলের মনে বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়। তবে পরবর্তী সময়ে তার মনের ভাব পরিবর্তিত হয়। আসলে গল্পের প্রথম পর্যায়ে অর্চনা ও শ্যামলের মধ্যেকার সম্পর্কে যে রহস্যের আবরণ ছিল তা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। সেখানে দেখা যায়, বয়সে বড় এবং শিক্ষিতা অর্চনাকে শ্রদ্ধাভক্তির আড়ালে শ্যামল ছেলেবেলা থেকেই ভালোবেসেছে। তবে তা প্রকাশ করতে তার সংকোচ বোধ হয়। নিজেকে সে সর্বদা অর্চনার যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেছে এবং প্রিয় পাত্র হিসাবে স্থান করে নিতে চেয়েছে। শ্যামলের এই প্রয়াস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এই অধ্যায়ে পূর্বে আলোচিত 'টর্চ' গল্পের নায়ক মানিককে। কাহিনী সূত্রে লব্ধ শ্যামলের কৈশোর জীবনে প্রথম আঘাত ছিল অর্চনার প্রথম প্রেমিকের উপস্থিতি। অর্চনার সম-গুণ সম্পন্ন এই মানুষটিকে তবু শ্যামল মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তারই সমপর্যায়ের ও সমবয়সী বন্ধু গৌতম যখন শ্যামলের প্রেয়সী তথা মানসী প্রতিমাকে নীচে নামিয়ে এনে অবহেলা করে তখন সে সহ্য করতে পারেনি। তাই আমরা লক্ষ করেছি, যখন গৌতম ও অর্চনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন শ্যামল ক্রোধে ক্ষোভে ও অভিমানে তাদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। আবার আমরা এটাও লক্ষ করি, অসহায় অর্চনার দুঃসময়ে সে পুনরায় তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

আসলে আলোচ্য গল্পে শ্যামল চরিত্রটিকে লেখক গৌতমের ঠিক বিপরীত আদলে গড়েছেন। শ্যামল একজন রক্ত-মাংসে গড়া এই বাস্তব জগতের মানুষ। গৌতমের মত কোন মাহেন্দ্রক্ষণে সে বিশ্বাসী নয়। তার কাছে প্রতিটি মুহূর্তই বিশেষ মুহূর্ত। জীবনের প্রত্যেকটি ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়া তার কাছে অনেক বেশি দামী। উভয়ের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরের পূর্ণতা লাভ করাই তার উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকা আবেগের গুরুত্ব তার কাছে অনেক বেশি। শ্যামলের এই মানসিকতাই তার আকাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের পরিণতি দানে সহায়ক

হয়েছিল। এইভাবেই দু'জন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দুটি সমান্তরাল সম্পর্কের রূপরেখা আলোচ্য গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে, যা আলোচনার ধারাকেও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে সাহায্য করেছে।

'চা' এক ধরণের অত্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় পানীয় বিশেষ। এই অতি সাধারণ একটি পানীয় বস্তু কীভাবে দু'জন মানব-মানবীর মধ্যেকার সম্পর্ককে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, আবার সেই সম্পর্ককে অবনমিত করবার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তারই একটি দিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'চা'** গল্পে উঠে এসেছে। সেখানে আমরা লক্ষ করি, দু'জন নর-নারী চা পান করাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের কাছে আসে। তারা নিজ মনের আবেগকে উক্ত পানীয়-এর সঙ্গে মিশ্রিত করে দেয়। ধীরে ধীরে পরস্পরের মনের সেই আবেগ ভালোলাগার স্তরে উন্নীত হয়। আসলে এই পর্বে চা পান করাটা ছিল তাদের কাছে উপলক্ষ মাত্র। কাজেই চা এর স্বাদ মধুর অথবা তিক্ত যাই হোক না কেন তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। স্নিগ্ধ সম্পর্কের ঘনীভূত নির্যাস আস্বাদন করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সেই একই চা পান করবার ক্ষেত্রে তার স্বাদ গ্রহণটাই নায়কের কাছে বড় হয়ে ওঠে। যেখানে মনের ভাবাবেগ 'বাস্তব'কে ছাপিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতির এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তাদের সম্পর্কের সমীকরণটিও উন্মোচিত হয়ে যায়।

আলোচ্য গল্পটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'মন্দিরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়িকা নীলিমার সঙ্গে নায়ক শুভেন্দুর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই কাহিনীটির সূত্রপাত ঘটে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়। কাহিনীসূত্রে আমরা পেয়ে থাকি, শুভেন্দু অর্থ-যশ-খ্যাতির বিচারে সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থানরত। অপরদিকে একদা অভিজাত পরিবারের মেয়ে নীলিমা ঠিক তার বিপরীত পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, আর্থিক সঙ্গতির নিরিখেই মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্নীত হয়। আর সেই সমাজে বসবাস করতে করতে কতগুলি অভ্যাস জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবেই মানুষ গোত্রান্তরিত হয় এবং এক একটি গোত্রের মানুষকে আর 'Life Style'-এর দ্বারাই চিহ্নিত করা যায়। আমরা দেখি নায়ক শুভেন্দুর জীবনেও আভিজাত্যের ছোঁয়া লাগে। সে যাই হোক, দীর্ঘদিন বাদে প্রাক্তন প্রেমিকাকে দেখে তাদের সম্পর্কের সুরভী তথা মোহ লাভে শুভেন্দুর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কাজেই সে নীলিমার বর্তমান জীবনের সঙ্গে

সামঞ্জস্য রেখে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। আমরা লক্ষ করি, এই 'অভিসার' তার প্রথম জীবনের প্রেমানুভূতিপূর্ণ দিনগুলিকে যেন ফিরিয়ে দেয়। তার হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিকে সে কল্পনার রাজ্যে অর্থাৎ প্রাক্তন এই সম্পর্কের প্রতি শুভেন্দুর একটি বিশেষ মোহ ছিল। বিভিন্ন কারণে তা পরিপূর্ণ করবার সুযোগ তার ঘটেনি। কাজেই কল্পলোকে তারই পূর্ণতা দানে সে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং শুভেন্দু যে কাঁচা চামড়ার কারখানা বা দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমা অতিক্রম করে নীলিমার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে সে বিষয়ে তার নজর ছিল না। তবে নীলিমার দেওয়া সস্তা চায়ের 'ফ্লেভারে' তার দারিদ্র্যের গন্ধ ভেসে ওঠে। আর সেই গন্ধই শুভেন্দুর চমক ভাঙায়। কল্পজগৎ থেকে তাকে বাস্তবের মাটিতে টেনে নামায়। এখানেই গল্পের মূল রস নিহিত। যেখানে মানবিক অনুভূতি চায়ের কটূ গন্ধকে অতিক্রম করে উঠতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ তাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মনের ভাবাবেগ সেই মুহূর্তেই গৌণ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চায়ের স্বাদ আস্বাদন করবার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। আসলে শুভেন্দু বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করলেও তার অন্তরকে কোনভাবেই বদলাতে পারেনি। আভিজাত্যময় জীবনধারণে অভ্যস্ত নায়ক শুভেন্দু নীলিমার দারিদ্র্যকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়া চা পানের সঙ্গে সঙ্গে তার বিকৃত মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ চা পান করাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে একটু করে যে সম্পর্ক একদিন স্থাপিত হয়েছিল তা হয়তো শুধুমাত্র ভালোলাগার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল, গভীরে তা প্রবেশ করতে পারেনি। হয়তো বা সেটাও ছিল জীবনের এক শৌখিন অভ্যাস। তবে সময়ের তালে তালে পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটে এবং তারই সমান্তরালে পরিবর্তিত হয় 'মন'। কাজেই সেখানে পূর্বের আবেগ ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে, যা স্বাভাবিকভাবেই 'বাস্ত বতা'কে প্রতিহত করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে – যার প্রমাণ উঠে এসেছে 'এক কাপ চায়ের ফ্লেভারে'। আর এই কারণেই হঠাৎ করে শুভেন্দুর মনে জেগে ওঠে সেই দীর্ঘ বিশ্রী পথ, দুদিকে কাঁচা চামড়া আর দুর্গন্ধময় নর্দমার কথা। শুধু তাই নয়, তার মনে হয় এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পার করে কতক্ষণে সে একটি স্বাদু সুরভিত চায়ের কাপ মুখে তুলতে পারবে। সুতরাং বলা যায়, আলোচ্য গল্পের দু'জন নর-নারীর সম্পর্ক যে আসলে কোন স্তরে স্থিতিশীল ছিল তারই সত্যরূপ এই এক কাপ চা-এ প্রকাশিত হয়ে গেল। অর্থাৎ দু'জন মানব-মানবীর মধ্যে মূলত যে প্রেমের তথা অনুরাগের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাতেও নানা স্তর বর্তমান থাকে। সেই একই সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় স্তরের একটি রূপ আলোচ্য গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে।

বাহ্যিক ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নর-নারীর সম্পর্কের একটি স্নিগ্ধ রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে লেখকের **'ছদ্মনাম'** (১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'অঙ্গনা' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত) গল্পটিতে।

ছদ্মনাম ব্যবহারের মূলে মানুষের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। আলোচ্য গল্পে ছদ্মনামের সঙ্গে মানব-মানবীর সম্পর্কের কী সম্বন্ধ রয়েছে তা বুঝে নেওয়া যাক।

এই গল্পে অবিবাহিত দু'জন যুবক-যুবতীর মধ্যেকার সম্পর্কের উত্থান-পতনই মুখ্য বিষয়। একদিকে আর্থিক সংকট, অপরদিকে মানসিক চাহিদা – এই দুইয়ের টানাপোড়েনে গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র ক্ষত-বিক্ষত। অর্থকষ্টে জর্জরিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই উভয়ে উঠে এসেছে। দেখা যায় – কাহিনীর নারী চরিত্রটি অর্থাৎ নমিতা একজন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, যার আর্থিক উপার্জনের উপর সমস্ত পরিবার নির্ভরশীল। অন্যদিকে অসবর্ণ পুরুষ – রাজ্যেশ্বরের সংসারেও অভাব-অনটন নিত্যসঙ্গী। সেই সঙ্গে ঘরে কুৎসিত অনূঢ়া বোনও তার বর্তমান। বাবা ছেলের বিয়ে দিয়ে পাওয়া যৌতুকের সাহায্যে মেয়ে বিয়ে দিতে চান। কাজেই যতবার দাদার বিয়ের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ততবারই বোনের চোখ উল্লাসে ভরে ওঠে। কিন্তু দাদার অসমর্থনে পরক্ষণেই বোনের চেহারায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এইরকম একটা জটিল পারিবারিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দু'জন নর-নারী পরস্পরের কাছে এসে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারাও স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘটনাক্রমে পরস্পরের প্রতি প্রেমানুভূতির তুলনায় প্রয়োজনবোধকেই তারা বড় করে দেখতে বাধ্য হয় অর্থাৎ বলা যায়, পারিবারিক দায়বদ্ধতা, কর্তব্যবোধ তাদের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তাই দেখা যায়, নমিতা যেমন অসবর্ণে বিয়ে করে তার মৃত্যুপথযাত্রী বাবাকে আঘাত করতে পারে না, তেমন অপরদিকে রাজ্যেশ্বরকে তার পরিবার বিয়ে করবার জন্য অনবরত তাগিদ দিতে থাকে। ফলে উভয়ের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে চলেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক সম্পর্ক ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। এই মুহূর্তে নমিতা বিয়ে করতে না চাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যেশ্বর ধৈর্য হারিয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এইভাবে – "আমাদের পরিবারের মান-সম্মানের দিকে তোমার মোটেই দৃষ্টি নেই। তা যদি থাকত তাহলে তুমি আমার কথা শুনতে। .....কেবল বাবা আর বাবা। সেই বে-আক্কেল নির্বোধ বুড়ো কত কাল আর তোমাকে আগলে রাখবে?"[৩২২] এখানেই হয়তো দু'টি মানুষের অবনমিত সম্পর্কের চূড়ান্ত রূপরেখাটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মানসিক দূরত্বের অস্তিত্বও প্রকট হতে থাকে। তাই নমিতা এর প্রত্যুত্তরে তীব্র

ঝাঁঝাল গলায় জানায় – "তোমার মত স্বার্থপর পশুর হাত থেকে যতকাল আগলে রাখতে পারেন ততই ভালো।"[৩২৩] সুতরাং এই স্তরে এসে তাদের সম্পর্ক এক ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের অবনমনের বিপরীতে উত্থানের দিকটিও আছে। কেননা, পরিস্থিতি ও মানবিক অনুভূতি সর্বদা পরিবর্তনশীল। তাই দু'জনের মধ্যে কোন সাড়ায় যেন নমিতা যে 'একজিবিশন'-এ রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, সেখানে সে প্রতিদিন যায়। সেখানে সে তার সেই ভালোবাসার মানুষটিকে খুঁজে ফেরে। কিন্তু নিজেকে ধরা না দেওয়ার উদ্দেশ্যে নমিতা 'উপস্থিত খাতায়' ছদ্মনামে সই করে এবং প্রসঙ্গক্রমে সে জানতে পারে কোট-প্যান্ট পরা একটি পুরুষ তারই মত একটি নামকে প্রতিদিন খোঁজে। এই সংবাদে নমিতা উচ্ছ্বসিত হয়। এই যে ছদ্মনামের আড়ালে সে যে সত্যটুকু পেল, তা-ই তার কাছে পরম পাওয়া।

এই অনুভূতিই হয়তো তাদের হারানো সম্পর্ককে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করবে, নতুনভাবে উজ্জীবিত করবে। নামটা ছদ্ম হলেও পরস্পরের প্রতি পাওয়া যে অনুভূতি তা সত্য-খাঁটি ও চিরন্তন, যা একটি সম্পর্কের মূল জিয়নকাঠি। আলোচ্য গল্পে ছদ্মনামের সঙ্গে এই দু'জন নর-নারীরর সম্পর্কের সম্বন্ধ এখানেই। এইভাবে একই সম্পর্কের ধারায় নানা তরঙ্গের ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহমান সম্পর্কটি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

'সুপুরুষ' গল্পটি ১৩৬১ বঙ্গাব্দে নবারুণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটির নামকরণ পুরুষ চরিত্র কেন্দ্রিক হলেও এখানে আছে একজন নারী চরিত্রের অব্যক্ত হৃদয়-যন্ত্রণার কথা।

তার এই মন-বেদনার মূলে নিহিত আছে দুটি অন্তরের সংযোগে স্থাপিত এক পরিণতিহীন সম্পর্কের প্রভাব। আমরা জানি, জীবন-চলার পথে নানা সম্পর্ক গড়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু সম্পর্ক পরিণতি তথা স্বীকৃতি পেলেও তার বেশীর ভাগই জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তাতে হয়তো জীবন থেমে থাকে না ঠিকই তবে সেই 'হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক'ও বেঁচে থাকে মনের গোপন কোণে, অনুভবের রসে সিক্ত হয়ে। তার-ই প্রভাবে আলোড়িত হয় 'মন', আন্দোলিত হয় 'জীবন'। এমনই একটি দিক আলোচ্য গল্পে আমরা খুঁজে পাই।

'সুপুরুষ' গল্পে নায়িকা হিসাবে একজন বিকলাঙ্গ নারী চরিত্রকে আমরা পেয়ে থাকি। কাহিনীসূত্রে জানা যায়, শৈশবের একেবারে প্রাথমিক স্তরে টাইফয়েডের কোপে তার কোমর থেকে শুরু করে বাঁ পা-টা পুরোপুরি শুকিয়ে যায়। জীবনের এই ক্ষতিটা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও কঠোর ভাবে উপলব্ধি করেছিল মনিকা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, আমরা মানুষেরা সমাজে

বসবাসকারী সাধারণ এক জীবগোষ্ঠী। জন্ম থেকেই আমরা খুব স্বাভাবিক নিয়মেই 'শৈশব থেকে কৈশোর', 'কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্ব' – এই পর্বগুলিকে অতিক্রম করতে করতে জীবনের পথে এগিয়ে চলি। কাজেই জীবনের পথে আগত 'স্তর' সম্পর্কে প্রত্যেকটি নারী-পুরুষের মনেই নানা স্বপ্ন গড়ে ওঠে। মনিকা একজন সাধারণ মানুষ। তার ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আকস্মিক বর্ষিত এক অভিশাপ তার জীবনের এই স্বাভাবিকত্বটুকুকে কেড়ে নেয়। সে জানে শরীরগত ও মনোগত নানা চাহিদা তার জীবনে কখনোই পূরণ হবার নয়। তবে দেখা যায়, মনিকার শরীরের একটি অঙ্গ অচল হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার মনের গতি অনেক বেশী সক্রিয়। পূর্ণ যৌবনের কড়িকাঠে দাঁড়িয়ে আগত দিনগুলিকে সে নানা কল্পনার রঙে রঙিন করে তুলেছিল। অর্থাৎ তার জীবনের খাম্‌তিগুলি এই কল্পলোকে এসে পূর্ণতা লাভ করত। আর তা-ই তাকে বেঁচে থাকবার অনুপ্রেরণা দান করেছিল। তবে মনিকার এই মনলোককে তার পরিবার বা সমাজ কেউই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তাদের কাছে মনিকার বিকলাঙ্গ রূপটিই একমাত্র সত্য। কাজেই বাস্তবের আঘাতে মনিকাকে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে। ব্যাহত হয়েছে তার স্বপ্নের ধারা। আমরা দেখেছি, তার জন্য কখনো আনা হয়েছে বোবা অথবা অন্ধ পাত্র। আবার হয়তো কখনো তাকে দেখতে এসে তার বোন অনীতাকে পছন্দ করে গিয়েছে পাত্রপক্ষ। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা মনিকার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করেছে। হয়তো তারই এক প্রতিক্রিয়ায় সে বোনকে জানায় –"আমার কিছুই হবে না অনি। কিন্তু তোর অনেক হবে। স্বামী, ছেলেমেয়ে। তোর পাওয়ার মধ্যে দিয়েই আমি পাব।"[৩২৪] তার মনের এই আবেগ আমাদেরকে ভাবায়। আবার কখনো অভিমানের সুরে তার মা যখন জানায় – "তোকে তো আর মা হতে হয়নি।"[৩২৫]। এর প্রত্যুত্তরে মনিকা অদ্ভুত একটু হেসে জবাব দেয় –"তা ঠিক। এজন্মে শুধু পুরোপুরি মেয়ে হয়ে থাকার সুখই ভোগ করে গেলাম। কারো মা বউ হওয়ার দুঃখ আর পেতে হল না। সেই এক সান্ত্বনা।"[৩২৬] তখন তার মনের এই দুঃখ ও আক্ষেপ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় লেখকের 'যৌথ' গল্পের নায়ক স্বরূপকে। কল্পলোকে পুনরায় পদার্পণ করবার পর হয়তো মনিকার মনের এই ক্ষোভ ক্রমশ প্রশমিত হয়ে যায়। এইভাবে স্বপ্নের ভাঙা-গড়ার খেলায় সে যখন মত্ত তখন বোন অনীতার বিয়ে উপলক্ষে তার জীবনে একজন পুরুষ চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে।

কাহিনীসূত্রে এই পুরুষ চরিত্রটির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, প্রায় অনাথ এই মানুষটি ভীষণ আমোদপ্রিয় এবং সুপুরুষ। কাজেই প্রথম দর্শনেই মনিকা তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তবে শারীরিক ত্রুটির জন্য তার মনে সংকোচ ছিল। কিন্তু পুরুষটি অর্থাৎ সঞ্জয়

গতানুগতিকভাবে আর পাঁচটা মানুষের মত মনিকাকে সহানুভূতি জানায়নি। বরং জবাব দিয়েছিল –"ছুটতে হলে চাই মন। ব্যোমযানটা হালের আমদানী, মনোযানটা চিরকালের। পা না থাকে নাই থাকল, মনটা তো আছে।"[৩২৭] আবার সে জানায় –"তোমাকে দেখে দেখে আমার কি মনে হয় জানো ? ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে আস্ত এক দেবী মূর্তি। .....মনি, তুমি হৃদয় ধনে ধনী।"[৩২৮] অর্থাৎ মনিকার জীবনে এই প্রথম এবং একমাত্র মানুষ যে মনিকার 'মনন'কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং, এই মানুষটিকে ঘিরে গল্পের নায়িকার মনের স্বপ্নগুলো যেন ভাষা পেতে চায়। তার চোখে সে-ই সুপুরুষ। যাকে কেন্দ্র করে মনিকা তার সত্তার পূর্ণ বিকাশ করতে চেয়েছে। অপরদিকে আমরা দেখি, সঞ্জয় নানা প্রতিভার অধিকারী হলেও তার স্ফূরণে সে ব্যর্থ। শুধু তাই নয়, তার নামের সঙ্গে বিভিন্ন অপবাদও যুক্ত হয়েছে। আসলে এই গল্পে সে একজন অসহায় চরিত্র। মানসিকভাবে আশ্রয়হীন এই মানুষটি চায় আন্তরিকতা ও ভালোবাসা। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তাকে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু মনিকা একমাত্র নারী, যার কাছে সঞ্জয় মানসিক আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। তাই আমরা দেখি, বিভিন্ন সময়ে সে মনিকার কাছে বার বার ছুটে এসেছে, তার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা মুগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করেছে। কাজেই সমাজের ক্রমশ বিদ্রূপ বাণে হতাশাগ্রস্ত ও ক্লান্ত সঞ্জয় যখন জীবনে প্রথমবার মনিকার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পায় তখন সে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লক্ষ করা যায়, সে মনিকাকে জড়িয়ে ধরে, তার কাঁধে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আসলে তথাকথিত সামাজিক পরিভাষায় এই দুই ঋণাত্বক সত্তা পরস্পরের সংযোগে পূর্ণতায় পৌঁছোতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের এই ইচ্ছাকে পরিবার তথা সমাজ গুরুত্ব দিতে চায়নি। তাই কাহিনীর অন্ত্যপর্বে পাওয়া যায়, উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনিকার বাবা সঞ্জয়ের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। ফলে দুটি মনের মিলন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর সেই যন্ত্রণাকে বুকে চেপে রেখে মনিকা প্রত্যেকদিন জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে তার জীবনের একমাত্র সুপুরুষের প্রতীক্ষায়। দুটি হৃদয়ের টানে গড়ে ওঠা একটি সম্পর্ক পূর্ণতা পায়নি ঠিকই কিন্তু তার অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত করে রেখেছে মনিকা অনুভবের মাধ্যমে।

একজন ব্যক্তি মানুষের হীনমন্যতার সমান্তরালে সমাজভাবনা যখন বড় হয়ে ওঠে তখন একটি সম্পর্ক কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তারই একটি উদাহরণ হল **'বসন্তপঞ্চম'** গল্পটি। ১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'যুগান্তর' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় এটি 'কুমার-কুমারী' নামে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী

সময়ে নাম পরিবর্তিত হয়ে 'বসন্তপঞ্চম' গল্পগ্রন্থে স্থান লাভ করে।

আলোচ্য গল্পে যৌবন উত্তীর্ণ দু'জন নর-নারীর জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে। কাজেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন জীবন-প্রেক্ষাপট এখানে উদ্ভাসিত। আমরা দেখি, গল্পের নায়ক বিজয়বাবুর পরিবারের সকল সদস্যই উচ্চ-প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশেষ সামাজিক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু সেখানে জীবনের এই প্রতিযোগিতায় বিজয়বাবু একজন পরাজিত মানুষ। কাজেই এই বিষয়টি ক্রমশ তাকে হীনমন্য করে তোলে। আর তা থেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি অবিবাহিত থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেননা, তার অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত আছে যে, পরিবারের সর্বনিম্ন উপার্জনশীল সদস্যর পদমর্যাদা সব থেকে নীচের শ্রেণীতেই অধিষ্ঠিত। সুতরাং সেখানে বিজয়বাবুর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কাজেই তিনি তার এই ব্যর্থতাকে অন্য একটি জীবনে সঞ্চরণের পক্ষপাতি ছিলেন না। আসলে আত্ম-বিশ্বাসহীন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সমন্বিত এবং দায়িত্ব গ্রহণে অসমর্থ তথা অনিচ্ছুক এক সত্তা হিসাবেই তার পরিচয় আলোচ্য গল্পে প্রস্ফুটিত হয়েছে। অপরদিকে নায়িকা সুমিতাকে নায়ক বিজয়বাবুর ঠিক বিপরীত আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। রূপ-গুণও দেশী-বিদেশী নানা ডিগ্রীর অধিকারী এই চরিত্র পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতই ছিলেন উচ্চাভিলাষী। কাহিনীর প্রবাহমানতায় উঠে আসে, পরিবারের সকলে যখন সুমিতার জন্য যোগ্য থেকে যোগ্যতর পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত তখন তিনিও তার 'কেরিয়ারের' সাধনায় মগ্ন। জীবনের এই প্রথম পর্বে তার ধারণা ছিল আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাধনায় নিমগ্ন থাকলেই সমস্ত চাওয়া-পাওয়াকেই লাভ করা সম্ভব। কিন্তু রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের সবরকম চাহিদা যে এই সাধনা থেকে পূরণ হয় না এই সত্য যখন তিনি উপলব্ধি করলেন তখন লক্ষ করলেন তার জীবন থেকে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। কাজেই বিদ্যা-বুদ্ধি ও রূপের ঘেরাটোপে থাকা তার বন্দী সত্তা বর্তমানে মুক্তি কামনায় ক্রমশ উদ্‌ভ্রান্ত। যশ-খ্যাতির প্রাচীর লঙ্ঘন করবার শক্তি তার আজ বিনষ্ট। সুমিতার অনুভবে ধরা দেয়, বিদ্যা-বুদ্ধির আবরণ তার জীবনের স্বভাবিকতাকে হরণ করেছে। ডিগ্রী ও রূপের ধনে ধনী সুমিতার এই অন্তরাত্মা আসলে ভালোবাসার ভিখারী। তাই তার কণ্ঠে উঠে আসে –"ভালোবাসা রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। যে পাবার সেও সব না থাকলেও পায়। যে পায় না, সে সব থাকলেও পায় না। ..... ও সব অনেক সময় অনেকের বেলায় বাধা, অন্যের কাছে বাধা, নিজের কাছেও বাধা।"[৩২৯] অর্থাৎ সব বাধাকে অতিক্রম করে জীবনের সমস্তরকম রূপ-রস-গন্ধকে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করবার এক প্রবল ইচ্ছা যে সুমিতার মনে জন্ম নিয়েছিল, সে বিষয়ে আমরা পাঠকবর্গ সকলেই একমত। জীবনের

এমন এক প্রেক্ষাপটে এসেই এই দুটি চরিত্রের পুনর্দর্শন হয়। বিজয়বাবুও যে সুমিতারই মত একজন নিঃসঙ্গ মানুষ তা পরস্পরের অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে সুমিতার কাছে স্পষ্ট হয়। ফলে সমপর্যায়ের এই মানুষটিকে কেন্দ্র করে সুমিতার মনের বাসনাগুলি পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায় বা বলা যায়, তার মনোলোকের স্বপ্নগুলি যেন পূর্ণতা পেতে চায়। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা লক্ষ করি, সুমিতা এক আবেগঘন মুহূর্তে বিজয়বাবুর উদ্দেশ্যে আর্তি জানায় -"কিন্তু এমন ঢেউ কি নেই যা সব ভাসিয়ে নিতে পারে!"[৩৩০] তবে এক্ষেত্রেও নায়ক বিজয়বাবুর হীনমন্যতা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এমন কোন শক্তিকে তিনি খুঁজে পান না যার দ্বারা তার মনের সমস্তরকম সংকোচকে অতিক্রম করে সুমিতাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ভরা যৌবনকে যদি উদ্দাম-উচ্ছল-দুর্বার এক নদীর প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করি তবে বিগতযৌবনকে নদীর আর এক শান্ত-স্নিগ্ধ-ঢেউহীন রূপের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। অর্থাৎ এ বয়সে এসে মানুষের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলি অনেক বড় হয়ে ওঠে। আর মনের এই সংশয়-ই কিন্তু সমাজ-পরিকাঠামোর দোহাই দেয়। তাই বিজয়বাবুর কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই – "কি করে হবে! বয়স হয়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে, চুলে পাক ধরেছে যে। এখন হঠাৎ কিছু করা তো ভালো কল্পনা করবারও সাহস নেই। এতকাল আইবুড়ো থেকে সুমিতার মতো মেয়ে কি সাধারণ একজন সেলসম্যানকে বিয়ে করতে পারে। লোকে ছি-ছি করবে যে। আর আমি স্বামী হতে পারলাম না সেই দুঃখে কেন এক অধ্যাপিকার বেয়ারা হয়ে থাকবো। হলোই বা সে যশস্বিনী। আমার অন্তরাত্মা যে অনুক্ষণ ধিক্কার দেবে। তার চেয়ে এই কলম সারাবার চাকরি অনেক ভালো।"[৩৩১] ফলস্বরূপ এই দু'জন নর-নারীর মধ্যে নবপর্যায়ে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা একটি কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তার কোন বিস্তৃতির সম্ভাবনা দেখা যায় না। সমাজ-সংসারে ভাসমান বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্কের আর একটি দিকই এই 'বসন্তপঞ্চম' গল্পে ধরা পড়েছে।

দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী যখন মনগত দিক থেকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামগ্রিক অর্থে তাকে - যদি আমরা প্রেমের সম্পর্ক ধরি তবে তারও নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ পরিলক্ষিত হয়। আসলে দুটি হৃদয়লোকের মাধ্যমে এই প্রেমের সম্পর্ক মনের অজান্তেই গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হতে থাকে। আমাদের সমাজ-কাঠামোয় সেই সম্পর্ক সাধারণ ভাবে পরিণতি পায় বিবাহের মাধ্যমে। তবে এই গতানুগতিক স্তরকে অতিক্রম না করেও শুধুমাত্র অনুভবে প্রতিমুহূর্তে একটি সম্পর্ক

কীভাবে জীবিত থাকে তার প্রতিরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিখ্যাত গল্প **'বিকল্প'** তে। আলোচ্য গল্পে যদিও একটি সম্পর্কের প্রধান নিয়ামক নায়িকার বাবা তবে সে দিকটি গৌণ রেখে মানব-মানবীর বহুমুখী সম্পর্কের আর এক প্রকৃতি আমরা এখানে অন্বেষণ করব।

'বিকল্প' (১৩৬২ বঙ্গাব্দে ভাদ্রমাসে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম প্রকাশ) গল্পের নায়িকা হিসাবে সুধার যে পরিচয় পাই তাতে দেখি, সে সাধারণত পরিবার কেন্দ্রিক জীবনধারণেই অভ্যস্ত। অর্থাৎ বাবা ও ভাইকে কেন্দ্র করেই তার জীবনচক্র আবর্তিত। সুধার এই নিস্তরঙ্গ জগৎ-এও চতুর্থ ব্যক্তির আগমন ঘটে। যার প্রেম-স্পর্শে সে যেন আর এক ভাবে নিজেকে খুঁজে পায় এবং এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধকে নতুনভাবে আস্বাদন করতে সক্ষম হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি, এই ঘটনা তার এতদিনের ভাবনার জগৎকে পরিবর্তন করেছিল। গল্পে এই দু'জন নর-নারীকে কেন্দ্র করে একটি স্নিগ্ধ সম্পর্ক জন্ম নেয় ও তারই প্রতিক্রিয়ায় দুটি চরিত্র পরিচালিত হয়। যদিও সে তথ্য কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না, হাবুলের জবানবন্দীতে টুকরো টুকরো রূপে উঠে আসে। সেখানে দেখা যায়, সম্পর্কটির সূত্রপাত ঘটে কিন্তু সামাজিক অর্থে তার পরিণতি হয়েছিল কিনা সে প্রসঙ্গ প্রশ্নাযোগ্য। তবে তা যে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ পায়নি সে বিষয়টি আমরা পাঠকবর্গ একমত। তাতে প্রধান অন্তরায় ছিলেন সুধার বাবা। তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তিনি তাদের সম্পর্কটিকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্তর রসে জড়িয়ে সম্পর্ক যে বাইরের কোন বাধা-নিষেধকে স্বীকার করে না তা আরও একবার সুধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই গল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইন্দুভূষণের মৃত্যুর পূর্বে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি একরকম ছিল। বলা যায়, সেই সম্পর্কই পূর্ণরূপে বিকশিত হয় তার মৃত্যুর পরেই। বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ না হয়েও সুধা বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করে ঐ সম্পর্কের বাহক হিসাবে। কারণ এখানে দুটি 'মন' একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। আর তা সামাজিক নিয়ম কানুনের অনেক উর্দ্ধে স্থাপিত। কাজেই ভালোবাসার মানুষটি উপস্থিত না থাকলেও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে সুধা শরীর ও মনে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিল। ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, সেই সম্পর্কের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে সুধার বৈধব্য রীতি-নীতি পালনের মধ্য দিয়ে। আসলে সুধার কাছে এই সম্পর্ক হল ইন্দুভূষণেরই দোসর-পরিপূরক তথা দ্বিতীয় সত্তা, যা অনুভব করে বা যাকে লালন-পালন করে সুধা প্রতিমুহূর্তে তার প্রাণের মানুষটিকেই কাছে পায়। অর্থাৎ এখানে সম্পর্ক ও সত্তা একাকার হয়ে ওঠে। আর এখানেই বোধ হয় গল্পের নামকরণটি সার্থক হয়ে ওঠে। এইভাবেই মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুমুখী শাখার একটি রূপ

আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে, যেখানে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একটি সম্পর্ক বিকশিত হয়ে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

'স্মৃতিগন্ধ' এবং **'বাসনাবিপুল'** গল্পদুটি এক বছরের ব্যবধানে রচিত। এই দুই গল্পকে একসঙ্গে রেখে আমরা আলোচনা করব। কারণ গঠনগত দিক থেকে এদের প্রকৃতি একই রকম। এখানে দেখা যায়, দুটি ক্ষেত্রেই গল্পের নায়ক-নায়িকা বিবাহপূর্ববর্তী জীবনে একটি সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী সময়ে দাম্পত্য জীবনপর্বে উপস্থিত হয়ে তারা তাদের পূর্ব সম্পর্ককে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে উপলব্ধি করে। তবে কাঠামোগত ঐক্য থাকলেও একই প্রকার সম্পর্কের (মূলত প্রেমের সম্পর্ক) দুটি পৃথক রূপ উন্মোচিত হয়েছে।

প্রথমে আসা যাক - **'স্মৃতিগন্ধ'** গল্পে। গল্পটি প্রথমে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে 'স্মারক' নাম সহযোগে বেতারে পঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তিত হয়ে লেখকের 'রুপালী রেখা' গল্পগ্রন্থে এটি স্থান পায়। কাহিনী সূত্রে আমরা পেয়ে থাকি, আলোচ্য গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র প্রণবেশ ও মীনাক্ষীর মধ্যে বিবাহপূর্ববর্তী পর্বে যে সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল তার স্থায়িত্ব ছিল চার বছর; এই বিস্তৃত সময়-পর্বে সম্পর্কটি যে বিকশিত হবে তা খুব স্বাভাবিক। তবে সামাজিক অর্থে তার কেন পরিণতি সম্ভব হয়নি সে বিষয়ে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট তথ্য না থাকলেও এটুকু অনুমান করা যায় শেষ পর্যন্ত মীনাক্ষী-ই পিছিয়ে আসে। কারণ হিসাবে সে হয়তো সাহসের অভাবকে তুলে ধরে। আসলে মীনাক্ষীর এই অভাব সাহসের নয়, ভালোবাসার। ভালোবাসার মানুষটির প্রতি তার বিশ্বাসের খাম্‌তি ছিল। আর তারই ফলশ্রুতিতে হয়তো তার কাছে বস্তু জগৎ অর্থাৎ ধন-ঐশ্বর্য, সামাজিক মান-মর্যাদা, নানাবিধ নিষেধ অনেক বেশি প্রাধান্য পায়। তাই দেখা যায়, মীনাক্ষী পরবর্তী ক্ষেত্রে একজন বিত্তবান পুরুষকেই আপন জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নেয়। তবে যে কোন সম্পর্কেই দুটি চরিত্রের মধ্যে জড়িয়ে থাকে এক বিশেষ আবেগ ও অধিকার বোধ। এই বিষয়টি আলোচ্য গল্পের প্রধান দুই নর-নারীকেও প্রভাবিত করেছিল। তাদের সম্পর্ক পরিণতি পায় নি ঠিকই কিন্তু তার সূত্র ধরে অন্তরে গড়ে ওঠা ভাবাবেগ দীর্ঘ সময় অতিক্রম করেও কতখানি উজ্জ্বল ছিল বা বলা যায় আপন অস্তিত্ব প্রণবেশের মনে কোন্ পর্যায়ে বর্তমানে উপনীত তা জানবার প্রবল ইচ্ছা মীনাক্ষীর মনে জাগ্রত হয়। এই মনোবাসনা তারই কণ্ঠে ধরা পড়ে এইভাবে –"সময়ের প্রলেপে সব মান-অভিমান দুঃখ জ্বালার নিবৃত্তি হয়েছে। এখন শুধু কৌতুহল। প্রণবেশ কি সে কথা মনে রেখেছে ? যদি রেখে থাকে কিভাবে

রেখেছে ?"[৩৩২] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, মীনাক্ষীর মনে উদিত এই প্রশ্ন শুধুমাত্র কৌতূহল বশতঃ নয়। আসলে এখানে নারী মনস্তত্ত্বের এক গভীর দিক লুকিয়ে আছে। প্রত্যেকটি নারী চায় আপন অস্তিত্ব অন্যের হৃদয়ে (বিশেষত, পুরুষ হৃদয়ে) একটি বিশেষ স্থান দখল করে থাকুক। কাজেই তা প্রণবেশের অন্তরে কোন্ পর্যায়ে আছে বা নেই তাই মীনাক্ষী যাচাই করে দেখতে চেয়েছিল। তবে দেখা যায়, বর্তমান জীবনে অর্থ-যশ-সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারিণী হিসাবে মীনাক্ষী নিজেকে প্রণবেশের সম্মুখে যতবার প্রতিফলিত করেছে প্রণবেশ তার সম্পর্কে ততবারই উদাসীন মনোভাব ব্যক্ত করেছে। আর তাতে মীনাক্ষীর অহংবোধ আহত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় তার মনে ভেসে ওঠে –".....মানমর্যাদা প্রণবেশের আছে, মীনাক্ষীর কি নেই ? ঢের বেশি, ঢের বেশি আছে।"[৩৩৩] আবার আমরা লক্ষ করি, অন্য নারীর সঙ্গে প্রণবেশ যখন হেসে কথা বলেছে তাতেও মীনাক্ষী ঈর্ষাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আসলে তার এই ঈর্ষা অধিকারবোধ থেকেই জাগ্রত হয়েছে। হয়তো তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রণবেশের উদাসীন ব্যবহারে সে কঠিন প্রত্যাঘাত করতে চেয়েছে। আর এই উদ্দেশ্য পূরণ করতেই মীনাক্ষী ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে প্রণবেশের দেওয়া আংটির মত হুবহু একটি আংটিকে তার সামনে তুলে ধরে প্রশ্ন করে যে প্রণবেশ তা চিনতে পেরেছে কিনা। প্রতিক্রিয়ায় হারিয়ে যাওয়া প্রেমের স্মারকচিহ্নকে দেখে প্রণবেশের চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। আর এই বারি বর্ষণের মধ্য দিয়েই প্রণবেশের হৃদয়ে আপন অবস্থান সম্পর্কে মীনাক্ষী সচেতন হয়। সে আত্মতুষ্টি লাভ করে। প্রথম জীবনে গড়ে ওঠা একটি সম্পর্কে সম্পৃক্ত গভীর ভাবাবেগ যে আজও বিলীন হয়নি সে বিষয়ে মীনাক্ষী নতুনভাবে অবগত হয়। তাকে তা যেন স্বস্তি দেয়। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্ক নবরূপে উজ্জীবিত হয়।

'বাসনাবিপুল' গল্পটি পূর্ববর্তী গল্পের একবছর পর রচিত হয়। এই গল্পটির নামের প্রতি যদি আমরা লক্ষ রাখি তবে উপলব্ধি করতে পারি যে, কোন একজন চরিত্রের মনের কামনা-বাসনার উপর ভিত্তি করেই আলোচ্য গল্পের নামকরণটি রচিত হয়েছে। একটি সম্পর্ককে ঘিরে নানা স্বপ্ন ও বাসনা জন্ম নেয় একথা যেমন সত্য ঠিক এর বিপরীতভাবে বলা যায় কখনো কখনো মনের কতগুলি আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের তাগিদেও সম্পর্ককে গড়ে তোলা হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কামনা-বাসনা নয়, কামনা-বাসনার উপরই সম্পর্ক নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এই বিষয়টি আলোচ্য গল্পের নায়িকা চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

কাহিনীসূত্রে পাওয়া যায়, এই গল্পের প্রধান নারী চরিত্র হল অমিতা। তার জীবনে

শীতাংশু দ্বিতীয় পুরুষ। প্রথম পুরুষকে ভালোবেসেই অমিতা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরেই নিবিড় হয় তাদের ঘনিষ্ঠতা। আর তারই ফলশ্রুতির রূপ অমিতার মাতৃত্বলাভে প্রতিফলিত। তবে সেই প্রেমিক পুরুষের প্রবঞ্চক সত্তা যখন তার সম্মুখে উন্মোচিত হয় তখন তার স্মারক চিহ্নকে সমূলে বিনাশ করতে গিয়ে অমিতা চিরতরে তার মাতৃত্বকে হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, অমিতা সামাজিক শারীরিক ও মানসিক ভাবে তার জীবন থেকে স্বাভাবিকতাকেও হারিয়ে ফেলে। তার জীবনের এই প্রথম সম্পর্কের ভিত্তিমূলে ছিল ভালোবাসা। অর্থাৎ সেই সম্পর্ক হৃদয় রসে সম্পৃক্ত ছিল। যাকে কেন্দ্র করে মনের কামনা-বাসনাগুলি খুব স্বাভাবিক নিয়মেই জন্ম নিয়েছিল। এর আগেও আমরা উল্লেখ করেছি। একটি সম্পর্ক সূচিত হওয়ার পর তা সামাজিক ভাবে বিবাহের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি লাভ করে স্বামী-সন্তান-সংসার-এর আবরণে আবৃত হয়ে নানা স্তর অতিক্রম করতে করতে বিকশিত হয়। প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে এই কয়েকটা পর্যায়ের মাধ্যমে একটি সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এই ধাপকে গতানুগতিক বলে মনে হলেও প্রতিটি মানুষ যখন এই স্তরগলি অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার স্বাদ পায় তখন তার কাছে তা এক ও অনন্য হয়ে ওঠে। অমিতার ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। তবে ঘটনাক্রমে তার জীবনের বাসনাগুলি অপূর্ণ রয়ে যায়। এই অপূর্ণতাই হয়তো তাকে জীবন সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছিল। আর এমত পরিস্থিতিতেই সেখানে দ্বিতীয় পুরুষ হিসাবে শীতাংশুর আগমন ঘটে। আমরা লক্ষ করি, সময়ের তালে তালে শীতাংশুর তাগিদে ও অনুপ্রেরণায় খানিকটা ইচ্ছা-অনিচ্ছার বশবর্তী হয়ে অমিতা আর এক নব সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত হয়। আসলে এক্ষেত্রে এই সম্পর্কের ভিত্তিমূলে ছিল অমিতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুপ্ত বাসনা। অর্থাৎ এখানে ভালোবাসা মুখ্য নয়, প্রয়োজন বড় হয়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মূলত অমিতা আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মত সাংসারিক মোহ-মায়াকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল, জীবনের স্বাভাবিক গতিকে ফিরিয়ে আনতে বোন শমিতাকে দেখে অমিতার সম্বিৎ ফেরে। সে উপলব্ধি করে মাতৃত্ব লাভ জীবনের একটি অংশ। যার সহযোগে সংসারের পরিপূর্ণতা আসে। আর সেই পূর্ণতা দানে সে ব্যর্থ। অর্থাৎ তার কামনা-বাসনা কখনোই সম্পূর্ণতা লাভ করবে না। এই বোধ থেকেই অমিতা দ্বিতীয় সম্পর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। মানব-মানবীর বৈচিত্র্যময় সম্পর্কের আর একটি প্রকৃতি এইভাবে আলোচ্য গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে **'সোহাগিনী'** গল্পটিকে আলোচনা করা যায়। এটি একটি ব্যতিক্রমী গল্প

এই অর্থে গল্পকার এখানে দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দু'জন নর-নারীর মধ্যেকার একটি সম্পর্কের রূপরেখাকে চিত্রিত করেছেন। বিপরীত ধর্ম সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করে তার একটি দিক আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে। লক্ষণীয়, গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র এ সম্পর্কটির কোন মিলনান্তক পরিণতি টানেননি। হয়তো তৎকালীন সমাজ কাঠামোয় দাঁড়িয়ে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে আমাদের গল্পের প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলাদেশের পল্লী-প্রকৃতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে দেখা যায়, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষগুলি জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। তারই মাঝে গল্পের নায়ক মতি মিঞা যৌবনধর্মের স্বাভাবিক আকর্ষণে প্রতিবেশী হিন্দু নারী তুফানীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, দেহগত রূপ-সৌন্দর্য্যের উপর ভিত্তি করে অনেক সময় যেমন ভালোবাসা জন্ম নেয় তেমন এই দেহকে কেন্দ্র করেই ভালোবাসা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ দেহ-ই প্রেমানুভূতির ধারক ও বাহক। মতি মিঞাও তুফানীর রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে একে জৈবিক চাহিদা মনে হলেও আসলে শরীরকে অতিক্রম করে তুফানী মতির 'মন' কে স্পর্শ করেছিল। সেই কারণেই আমরা দেখি তুফানীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও মতি তারই প্রতীক্ষায় দিন গোণে, আশায় বুক বাঁধে। এ বিষয়ে বলা যায়, মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতিতে বহুবিবাহ প্রচলিত। সেখানে দেখা যায় একজন বিবাহিত নারী যেমন দ্বিতীয়বার 'নিকা' করতে পারে তেমন পুরুষের একাধিক বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অপর দিকে হিন্দু সমাজে নারী একবার মাত্র বিবাহের ছাড়পত্র পায়। কাজেই আলোচ্য গল্পে দু'জন নর-নারীর মধ্যে ভিন্ন সংস্কারগত টানাপোড়েন বর্তমান ছিল। যা তাদের সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছিল। তবে ঘটনাক্রমে পাওয়া যায় – শেষপর্যন্ত তুফানী নয় মাসের গর্ভবতী অবস্থায় মতির কাছে ধরা দেয়, তার অন্তরের কথাকে ব্যক্ত করে। তখন মতি মিঞা ক্ষোভে-ঈর্ষায় ও দৃঢ় আবেগে তুফানীকে বুকে আঁকড়ে ধরে। আসলে মতির এই প্রতিক্রিয়া তার জৈবিক তাড়নার প্রতিরূপ নয়, তুফানীর প্রতি প্রবল অধিকারবোধ এবং ভালোবাসার গভীরতাকে প্রকাশ করতেই তার এই উদ্যোগ। কিন্তু বুক ভরা ভালোবাসা নিয়েও মতি মিঞা তার প্রাণের মানুষটিকে বাঁচাতে পারেনি। এই ব্যর্থতার যন্ত্রণায় সে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। আর তাই আজও সেই ভালোবাসার বেদনাকে সে তার স্ত্রীর প্রসব যন্ত্রণায় খুঁজে পায়। সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীকে সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে সে তুফানীর স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে তোলে। এইভাবেই মতি মিঞা আজও মনের গোপন কোণে তার প্রিয়তমার সত্তা ও সম্পর্ককে লালন করে চলে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গল্পটি প্রথমে 'তুফানী' নামে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তন করে 'পত্রবিলাস' গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অপরদিকে গল্পে আমরা তুফানীর স্বামী হিসাবে বনমালীকে একজন নেশাগ্রস্ত, অমানবিক চরিত্র হিসাবে পাই ঠিকই কিন্তু সেও তার স্ত্রীকে ভালোবাসত। তার পরিচয় পাওয়া যায় গর্ভবতী অবস্থায় স্ত্রীর পছন্দের নানা খাবার এনে দেওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে। তবে তার ভালোবাসার তুলনায় অধিকারবোধ ছিল অনেক বেশি। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সেই অধিকার প্রয়োগের যখন আর সুযোগ থাকে না তখন তার সুপ্ত ভালোবাসার জাগরণ ঘটে। আর তারই বশবর্তী হয়ে অনু শোচনায় ক্লিষ্ট হয়ে সেও স্ত্রীকে শেষবারের মত দেখবার জন্য শ্মশানে আসে। এইভাবেই আলোচ্য গল্পে দুটি সমান্তরাল সম্পর্কের রূপরেখা উদ্ভাসিত হয়েছে।

এই পর্বের আর একটি গল্প **'পত্রবিলাস'**। এখানে পূর্ববর্তী গল্পের ঠিক বিপরীত পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নারী-হৃদয় একটি সম্পর্কের ধারক ও বাহক। পাঁচ বছরব্যাপী পত্র-বিনিময়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি সম্পর্কের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচ্য গল্পে ধরা পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, একটি সম্পর্কের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি লাভ নারীর অন্তরের অন্তঃস্থলেই আবদ্ধ থেকে গিয়েছে।

'পত্রবিলাস' গল্পটি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে 'আন্দবাজার' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'পত্রবিলাস' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় –'পত্রকে কেন্দ্র করে যে বিলাস'। অর্থাৎ মনের এই সুখভোগ জাগরণের মূলে আছে পত্রের ভূমিকা। কাজেই বলা যায়, 'পত্র' এখানে অনু ঘটক। কাহিনীর মূল অংশ অনুপ্রবেশের পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, মানুষের শারীরিক কাঠামোতে পরিপূর্ণতা বা তথাকথিত সৌন্দর্য্য না থাকতেই পারে কিন্তু তাতে মনের বিকাশে কোন খাম্‌তি হয় না, বরং স্বাভাবিক নিয়মেই অন্তরের কোণে ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি ভিড় করে ওঠে। আর সেগুলির পরিপূর্ণতা দানে হৃদয়লোক সর্বদা ব্যস্ত থাকে। এই বিষয়টি আলোচ্য গল্পের নায়িকা মিনতি ওরফে মিনুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেখা যায়, মিনতির দুই দিদি বীথি ও নীতির চোখ-মুখের গড়ন, দেহের বর্ণ, স্বাস্থ্য আর দেহসৌষ্ঠব অনেক বেশি আকর্ষণীয়। সে তুলনায় মিনতি অনেক নীচের স্তরে অবস্থানরতা। স্বাভাবিকভাবে এই দিকটি তার মনকে দুর্বল করে দেয়। মিনতির এই দুর্বলচিত্ত আরও বেশি প্রভাবিত হয় যখন পরিবারের সকলে এবং আত্মীয় পরিজনরা এই বিষয়টিকে সহানুভূতি ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে। ফলে এক মানসিক অস্থিরতা ক্রমাগত তার মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সে একজন মানসিক রুগীতে পরিণত হয়। মিনতির দিদিরা শুধু রূপে নয়, বিদ্যার ক্ষেত্রেও অনেক বেশি এগিয়েছিল।

তারা দুজনেই এম.এ. পাশ করেছে কিন্তু মিনতি বি.এ.-র চৌকাঠও পার হতে পারে নি। এটি তার হীনমন্যতার আরও একটি কারণ ছিল। ফলত মনের দুর্বলতা শরীরকেও শীর্ণ করে তোলে। কাহিনীতে পাওয়া যায়, মালদা থেকে শুরু করে কলকাতার নামজাদা ডাক্তাররা মিনতির অসুখ সারাতে পারেনি। তাদের ধারণা ব্যাধিটা তার মনের। এই পরিস্থিতিতে মিনুর বাবা তাকে মনস্তাত্ত্বিক-এর কাছে নিয়ে যেতে চাইলে মিনতিই অভিমান-বশত তাতে সায় দেয় না। আসলে সকলের দৃষ্টিতে মিনতির ত্রুটিপূর্ণ শরীরই মুখ্যভাবে ধরা দেয় কিন্তু তার অন্তরালে যে একটি 'মন' আছে আর তাতে আছে বহুমুখী চাওয়া-পাওয়া তা কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। এমত অবস্থায় সঙ্গীত শিল্পী উৎপলবাবুর আগমন ও তার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ মিনতির মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। উৎপলবাবুর কাছে তার অটোগ্রাফ দানের আবেদন জানায় মিনতি, এর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ নামজাদা শিল্পী মিনতির উদ্দেশ্যে একটি কবিতা উপহার দেন। প্রতিদানে মিনতিও একখানা কবিতা লেখে। দেখা যায়, এই দান-প্রতিদানের মধ্য দিয়ে মিনতি যেন এক নতুনত্বের স্বাদ পায়। এক বিশেষ অনুভূতি তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সত্তাকে নব রসে সিক্ত করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ঘটনা মিনতির মরু-হৃদয়ে যেন এক ওয়েসিসের বার্তা বহন করে। ফলস্বরূপ পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এইভাবেই একটি সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে যায়।

এর পরবর্তী ঘটনাক্রম লক্ষ করা যায়, মিনতি পত্রের মাধ্যমে তার অন্তর জগৎকে উদ্ভাসিত করে দেয় অপর পক্ষের কাছে এবং ঐ অন্তরের চাহিদা অনুযায়ী বিপরীত পক্ষের রচিত শব্দ-বাক্যগুলিকে মিনতি নিজের মত ব্যাখ্যা করে নেয়। তার মনের সেই গোপন কার্যটি কাহিনীতে উঠে আসে এইভাবে –"ভাষা ত সঙ্কেত, ভাষা ত এক ধরণের ইশারা ছাড়া কিছু নয়। সেই সঙ্কেতের ভিতর থেকে কী নিগূঢ় অর্থ বের করা যায়, কথার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে, মনের কোন গোপনতম গহ্বরে পৌঁছান চলে, বারবার সেই চেষ্টা করেছে মিনতি। না করে উপায় ছিল না। এ তো দিদিদের দাম্পত্যপত্র নয়। যার আবরণের জন্যে শুধু একখানা খামই যথেষ্ট। চিঠি ভরে যে কথাগুলি মিনতির কাছে এসে পৌঁছোয়, শুধু খাম ছিঁড়লেই কি তার অর্থ ধরা পড়ে ? সেই নিহিত অর্থ কখনো থাকত প্রকৃত বর্ণনায়, কখনো থাকত সঙ্গীতের তত্ত্ব আলোচনায়, কখনো থাকত উদ্ধৃত গানের কলিতে কলিতে লুকানো। আর এই লুকানো পথেই ত অভিসারের আনন্দ।"[৩৩৪] আসলে উৎপলবাবুকে কেন্দ্র করে মিনতির মনে প্রেমানুভূতির জাগরণ ঘটে। সে এই বিশেষ অনুভূতিকে মানসিকভাবে আস্বাদন তথা ভোগ করতে চায়। সেই সূত্র ধরেই এই প্রেমানুভূতিকে বিকশিত করবার জন্য সে অবিরাম মগ্ন থাকে। মনের এই বিশেষ ভাবাবেগের

অস্তিত্বকে মিনতি চিঠির পাতায় পাতায় ধরে রাখতে চায়। হয়তো মিনতির মনের এই ইচ্ছাগুলির অনুপ্রেরণায় উৎপলবাবুর রচিত সাধারণ শব্দ-বাক্যগুলি ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছিল। আসলে এ হল মিনতির এক মানসিক বিলাসিতা। যাকে ভিত্তি করে একটি কল্পিত সম্পর্ক রচিত হয়েছে। যার বিস্তৃতি মিনতির কল্পজগতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। তবে তাদের চিঠিগুলি ছিল মিনতির স্বপ্নলোকের ফেরিওয়ালা, বা বলা যায়, তার কল্পলোকের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। সেখানেই মিনতির সৃষ্টি তথা ভাবনা বাস্তবতা লাভ করত।

কাজেই আমরা লক্ষ করি, সুনিয়মে চিঠি আসাটাই ছিল মিনতির কাছে ভালোবাসা। কাহিনীর চুড়ান্ত পর্যায়ে দেখা যায়, উৎপলবাবুর কয়েকবারের চিঠির উত্তর দিতে মিনতি নীরব থাকলে তিনি মিনতির স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার দাদার কাছে জানতে চেয়ে টেলিগ্রাম পাঠান। এই ঘটনা যেন মিনতির নিজ হাতে গড়া সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয়। উৎপলবাবুর উদ্বিগ্নতাকে ভালোবাসার নামান্তর ভেবে মিনতি উৎফুল্ল হয়। তার মনের সেই বাঁধনহারা উল্লাসকে লেখক বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠা চঞ্চলা মহানন্দার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একটি অসুস্থ মন ধীরে ধীরে নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকতা লাভ করে। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মনের এই সূক্ষ্ম গতি-প্রকৃতিকে গল্পকার অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা। আমরা দেখি, মিনতির সুস্থ-স্বাভাবিক মন তার শরীরকেও স্পর্শ করে। আর উক্ত মনেই ধরা দেয়, –"চিঠিগুলির যে অর্থ মিনু করেছে হয়ত সবই তার নিজের মনের বানানো। তিনি বানিয়েছেন একরকম করে, মিনু বানিয়েছে আর একরকমে। মুখের কথার মাটির মূর্তিতে যে মনের রং লাগিয়েছে, আজ সেই মিথ্যার মূর্তির বিসর্জনের সময় এসেছে। সে নিরঞ্জন জলেই হোক আর আগুনেই হোক - একই কথা।"[৩৩৫] আসলে মিনতি বাহ্যিক নানা ভোগবিলাসের মত প্রেমকেও ভোগের সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করেছিল। কিন্তু প্রেম যে বিলাসের বস্তু নয়, সেই ভুল ভাঙে তার অন্যত্র বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে। অন্তরের গোপন কোণ থেকেই প্রেমানুভূতি উৎসারিত হয় এবং মনের অজান্তেই কখন যেন তা গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে। যা চিরন্তন ও শাশ্বত। আর তাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সম্পর্কের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা দুঃসাধ্য।

চারিত্রিক অহংবোধ ও অনমনীয়তা কখনো কখনো সম্পর্কের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে। এই বিশেষ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে **'পূর্বতনী'** গল্পে। এটি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে 'বিংশশতাব্দী' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আমরা জানি, প্রত্যেকটি মানুষই নিজেকে ভালোবাসে। এই কারণে সে অন্যকেও ভালোবাসে। যে ব্যক্তিটি নিজেকে যত বেশি ভালোবাসে অপরের প্রতি তার ভালোবাসা বোধ হয় তত গভীরতা লাভ করে। তবে এই সংবাদটি ব্যকিতটির আত্ম-সর্বস্বতার আড়ালে গোপন থাকে। ফলে তার বিপরীত চরিত্র অর্থাৎ ভালোবাসার মানুষটির কাছে ভুল বার্তা পৌঁছোয়। এর প্রতিক্রিয়ায় সম্পর্ক তার স্বাভাবিকতাকে হারায়। উক্ত বিষয়টি আলোচ্য গল্পের নায়িকা-চরিত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে নায়িকা হিসাবে মন্দিরা নামক চরিত্রটি আমরা পেয়ে থাকি। সে একজন কঠিন ব্যক্তিত্বময়ী, দাম্ভিক ও জেদী স্বভাবের নারী। আত্ম-কেন্দ্রিকতা তার মধ্যে প্রবল। লক্ষ করা যায়, প্রায় সম-মানসিকতা সম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ অমরেশের সঙ্গে মন্দিরার বন্ধুত্ব হয়। যেখানে দুজনই একে অন্যের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। যৌবনের উন্মাদনায় আবৃত এই দুই তরুণ-তরুণী সর্বদা 'নতুন কিছু' করবার জন্য উদ্‌গ্রীব, যা তাদের বয়স ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক ছিল। আসলে নতুন নতুন পরীক্ষামূলক কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে তারা 'ব্যতিক্রমী চরিত্র' হিসাবে সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তাই দেখা যায়, মধ্যবিত্ত জীবন কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হয়েও গতানুগতিক সামাজিক প্রথাকে লঙ্ঘন করে তারা পাশ্চত্য সংস্কৃতি হিসাবে -'লিভ-টুগেদার'কে গ্রহণ করে। এই ভাবে সংস্কার বিরুদ্ধ কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নতুনরূপে খুঁজে পাওয়ার ভিতরেই মূলত তাদের আনন্দ ছিল। এ ছিল মৌলিকতার স্তম্ভ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস। কাজেই এমন চরিত্র কখনোই নমনীয় হতে পারে না। তারা পরস্পরকে ছাপিয়ে যেতেই চায়। আর এই প্রচেষ্টার ফাঁকে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে 'স্ব-তন্ত্রের' ঘেরাটোপে ক্ষীণ বলে মনে হয়। কাজেই সামান্য কারণ তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। আমরা দেখি, হোটেল পক্ষ মন্দিরাকে অমরেশের 'মিসট্রেস' বলে আখ্যা দেয়। তাতে মন্দিরা অপমানিত বোধ করে। আর এর প্রতিক্রিয়ায় অমরেশ নমনীয়তা প্রদর্শন করলে মন্দিরার কাছে তা ব্যক্তিত্ব তথা পৌরুষত্ব-হীনতার সামিল বলে মনে হয়। এখান থেকেই তাদের মধ্যে মন-মালিন্যের সূত্রপাত ঘটে। তবে ছোট হয়ে ভুল স্বীকার করে তা দূর করবার প্রয়োজন কেউ তারা অনুভব করেনি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, অমরেশ চরিত্রে মিশে আছে যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের মানসিকতা। এই অমরেশের মত মানুষেরা যতই আধুনিক হয়ে উঠুক না কেন তাদের ধারণায় বদ্ধ আছে নারীরা হবে অত্যন্ত সহনশীল, নমনীয় ও ব্যক্তিত্বহীনা। মূলত তারা থাকবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল এবং আপন অধিকার সম্পর্কে অসচেতন। কিন্তু ঘটনাক্রমে মন্দিরা

ছিল তার ঠিক বিপরীত আদলে গড়া। এই কারণে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অমরেশের কাছে দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অমরেশের মনে হয়েছে সে মন্দিরাকে পছন্দের চেয়ে অপছন্দই বেশি করে। তার কাছে মন্দিরা পুরুষালি মেয়ে হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, অমরেশের পৌরুষের উপর মন্দিরার আস্থা না থাকা এবং তার স্বভাবের ক্ষীণতাকে দূর্বলতা বলে মনে করবার বিষয়টিতে অমরেশের সত্তা আহত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় তার পুরুষজনিত অহংবোধ ও দাম্ভিকতা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তারই আভাস পাওয়া যায় এইভাবে –"অমরেশের মনে হল রাজনীতি মন্দিরাকে আর কোন শিক্ষাই দেয়নি, শুধু মর্যাদাবোধের নামে দম্ভকে জাগিয়ে দিয়েছে, ব্যক্তিত্বের নামে স্ব-তন্ত্রকে সার বলে শিখিয়েছে। নারী কি অমরেশের কাছে এতই অপরিহার্য যে নতজানু হয়ে তার করুণা ভিক্ষা করতে হবে ?"[৩৩৬] কাজেই এমন মানসিকতা তাদের সম্পর্ককে আর এক ভিন্ন পথে বাহিত হতে সাহায্য করে।

তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় মানুষের জীবনবোধও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই হয়তো বিগত যৌবন পর্বে উপস্থিত হয়ে মন্দিরার অহংবোধ অনেকখানি প্রশমিত হয়েছিল। আর সেই সুযোগে সম্পর্কে জড়ানো আবেগ তার মনের কোণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আড়ালে থাকা সম্পর্কের গুরুত্ব মন্দিরা হয়তো সেই সময়পর্ব থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কাজেই বলা যায়, ঐ সম্পর্কের প্রতি দুর্বলতা ছিল বলেই মন্দিরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আর অন্যত্র বিয়ে করেনি। অমরেশের প্রতি উদাসীন মনোভাব ব্যক্ত করলেও তার জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্যই যে মন্দিরার কাছে ছিল তা কোলকাতার বাইরে এক সাক্ষাৎকারে উভয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে আসে। শুধু তাই নয়, এত ঘটনার পরেও মন্দিরার মত কঠিন স্বভাবের মেয়ে তৃতীয় ব্যক্তির অনুরোধে অমরেশের সঙ্গে একঘরে থাকতে সম্মতি জানায়। এই সমস্ত ঘটনা ক্রমেই তার মনের কোমল অংশকে পাঠকবর্গের কাছে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। শুধু পাঠক নয়, অমরেশও এই কঠোর আবরণের অন্দরে থাকা কোমল অংশের সন্ধান পেয়েছিল। তাই তার উপলব্ধিতে উঠে আসে – ".....সে বলে দিয়েছে এত দ্বেষ-বিদ্বেষ শত্রুতা বিরোধিতার মধ্যে রুদ্ধ হৃদয়ের এক নির্জন কন্দরে একটি জানালা এখনও খোলা আছে।"[৩৩৭] সুতরাং বলা যায়, এতদিন আড়ালে থাকা তাদের সম্পর্কের রূপরেখা এই প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার অস্তিত্বকে তারা গভীর ভাবে অনুভব করে।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে মানব-মানবী নানাবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই অর্থে পরিণতি পাবে তা নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে পূববর্তী গল্পে আমরা দেখলাম

আত্মসর্বস্ব ও আত্মাভিমান সম্পর্কের পরিণতিতে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। ঠিক তেমনিই কখনো কখনো মনের বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসকে অতিক্রম করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাতে সম্পর্কটি সংকটাপন্ন হয় ঠিকই, কিন্তু ঐ সম্পর্কের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগকে কখনো অস্বীকার করা যায় না। আর এই দুর্বলতাই বারবার সেই সম্পর্কের বলয়ে ব্যক্তি মানুষটিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। তাই চেষ্টা করেও সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। এমনই একটি সূক্ষ্ম বিষয় ধরা পড়েছে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'স্বরসন্ধি'** নামক গল্পে।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'গল্পভারতী'র পূজা সংখ্যায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কাহিনী সূত্রে প্রাপ্ত দুটি চরিত্র হল – নায়ক সুধাংশু এবং নায়িকা অঞ্জনা। আমরা দেখি, অঞ্জনার স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে কাহিনী ফ্ল্যাস ব্যাকে যায়; আর সেখানে নায়িকা চরিত্রের যে পরিচয় ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায় – অঞ্জনা ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ও সৎ মায়ের দ্বারা লালিত একজন সাধারণ কিশোরী। এই সময় পর্বে বয়সের ধর্মে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে জন্ম নেয় ভালোলাগা। কাজেই তারই বশবর্তী হয়ে সে পাড়ার মোড়ের ওষুধের দোকানের মালিক সুধাংশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন অঞ্জনার বাবা-মা-এর দৃষ্টিতে সুধাংশু অতি সাধারণ এক অসৎ চরিত্রের পুরুষ বলে মনে হলেও অঞ্জনা কিন্তু সেই সাধারণের মধ্যেই অসাধারণকে খুঁজে পেয়েছিল। অপরদিকে নায়ক চরিত্র হিসাবে আটাশ বছর বয়সী সুধাংশুর বিষয়ে একজন সাধারণ কেমিষ্ট ছাড়া আর কোন পরিচয় সেই সময়পর্বে পাঠকবর্গের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে বলা যায়, তথ্য অনুযায়ী অঞ্জনার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সের অধিকারী ছিল সুধাংশু। কাজেই অঞ্জনার মনে সুধাংশু হয়তো প্রেমিক সত্তার তুলনায় অভিভাবক হিসাবে বিশেষ ক্রিয়া করেছিল। বোধ হয় সুধাংশুকে অঞ্জনা তার জীবন নিয়ন্ত্রক হিসাবেই দেখতে বেশি পছন্দ করত বা বলতে হয়, তাতেই তার বেশি আনন্দ ছিল। ফলে এই বোধ থেকে অঞ্জনা সুধাংশুর প্রতি মানসিক ভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ভালোলাগার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমিক পুরুষটির প্রতি অঞ্জনার অগাধ বিশ্বাস জড়িয়ে ছিল। তার 'ইচ্ছা' পূরণের মধ্য দিয়ে সে যেন জীবনের মানে খুঁজে পেতে চায়। মনের এই আকাঙ্ক্ষার দিকটি লেখক তুলে ধরেছেন এইভাবে – "মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে কী যে আনন্দ হল অঞ্জনার তা সে নিজেই জানে। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা শুধু তো তার নিজের নয়, আরো একজনের। নিজের ইচ্ছার চেয়ে সে ইচ্ছায় বেশি উদ্দীপনা, মাধুর্য।"[৩৩৮] আর এই উদ্দীপনাই বোধ হয় এ সম্পর্কের পক্ষে থেকে পরিবারের বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে অঞ্জনাকে লড়াই করবার শক্তি জুগিয়েছিল। এইভাবেই আলোচ্য কাহিনীতে দু'জন নর-নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি

সম্পর্ক সময়ের তালে তালে বিকশিত হয়ে পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে।

তবে একটি সম্পর্ক যখন বাহিত হয় তখন তাকে নানারকম অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। আর তারই সূত্র ধরে সম্পর্কে আসে বহুমুখী সংকট। তৃতীয় ব্যক্তির আগমন, কখনো বিপরীত পরিস্থিতির উপস্থাপন আবার হয়তো বা দুর্বলতার মধ্যেই উক্ত সংকটের কারণ নিহিত থাকে। আলোচ্য গল্পে লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র নায়ক চরিত্রের বিশেষ কতগুলি বৈশিষ্ট্যকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দুটি প্রধান চরিত্রের মানসিক গতি-প্রকৃতিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এখনো তিনি তুলে ধরেছেন। কাহিনীতে দেখা যায়, অঞ্জনা যখন সুধাংশুর সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন তার চেনা-জানার গণ্ডী ছিল সীমিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে জীবনবোধ গড়ে তোলে। আর সেই বোধই তার সঙ্গে থাকা সম্পৃক্ত সম্পর্ককে নতুন নতুন ভাবে উপলব্ধি করতে এবং যাচাই করতে সাহায্য করে থাকে। অঞ্জনার জীবনবোধেও তা ধরা পড়েছিল। অভিজ্ঞতা ও পরিচিতির সীমা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে সুধাংশুর দুষ্কর্মের সংবাদগুলি আসতে থাকে। আর এই বিষয়গুলি তার বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে একটু একটু করে আঘাত হানে। স্বাভাবিকভাবেই একদিকে ভালোবাসা তথা বিশ্বাস অপরদিকে বাস্তবের কঠিন কষাঘাত – এই দুই স্বরূপের টানাপোড়েনে অঞ্জনা ক্রমশ বিচলিত হয়ে ওঠে। এবং ঘটনাক্রমে লক্ষ করা যায়, সমস্ত টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে অঞ্জনার কাছে সাধারণ একজন লম্পট ও প্রতারক সত্তা হিসাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সে যে একজন বিবাহিত পুরুষ, সেই সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয়। কাজেই এক প্রতিক্রিয়ায় অঞ্জনার মানসিক অবস্থা কেমন হবে তা আমরা পাঠকবর্গ খুব সহজেই অনুমান করতে পারি।

ঘৃণা ও বিদ্বেষে অঞ্জনা নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কিন্তু এত ঘটনার পরেও সুধাংশু যে অঞ্জনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় তারই একটি বাতাবরণ দিয়ে এই 'স্বরসন্ধি' গল্পের সূচনা হয়েছিল। এখানে সুধাংশু চরিত্রটি লক্ষণীয়। তার আচরণ আমাদেরকে বিস্মিত করে। আসলে বিচিত্র এই মানব-মন। আর তাই বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ মানব সম্পর্ক। সুধাংশু বিবাহিত ছিল। মানসিক বা শারীরিক যাই হোক না কেন, কোন এক চাহিদা সে হয়তো তার স্ত্রীর কাছ থেকে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে নি। তাই তার এমন বহির্মুখী অন্বেষণ। অথবা সে আসলেই একজন কামার্ত পুরুষ ছিল। নারী তথা সম্পর্কের প্রতি তার বিশেষ আসক্তি ছিল। যদিও এই সম্পর্কের সঠিক তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে যে কারণেই হোক না কেন সে যে বহু নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তা প্রমাণিত। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে – অঞ্জনার প্রতি তার দুর্বলতা এখনো কেন

বর্তমান ? এ বিষয়ে বলা যায়, আমরা প্রত্যেকটি মানুষই প্রত্যেকের থেকে আলাদা। তথাপি একটি সম্পর্কে যখন দু'জন মানুষ আবদ্ধ হয়, তখন পরস্পর পরস্পরের নানা দোষ-গুণকে আত্মীকরণ করে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে অঞ্জনার সঙ্গে থেকে সুধাংশু তার মনকে খানিকটা মার্জিত পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল। অথবা বলা যায়, অঞ্জনার প্রতি তার বিশেষ অনুকম্পা ও সহানুভূতি ছিল; কেননা, ঐ নারী চরিত্রটিকে আপন স্বপ্ন দিয়ে সে যত্ন করে গড়ে তুলেছিল। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই শুভ-অশুভ দুটো দিক থাকে। অঞ্জনা হয়তো সুধাংশুর সেই শুভ দিকটিরই প্রতিরূপ। তাই সে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে চায়।

অপর দিকে তাদের সম্পর্ক বর্তমানে এক জটিল কূপে নিমজ্জিত হয়। ছলনাময় পুরুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক অঞ্জনার কাছে অভিশাপ স্বরূপ এবং মিথ্যার সামিল। কিন্তু এই সম্পর্ককে ঘিরে অঞ্জনা একটু একটু করে যে স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল, তার হৃদয়লোকে যে আবেগ উত্থিত হয়েছিল তা কখনোই মিথ্যা ছিল না। আর তারই বশবর্তী হয়ে সে এখনো সুধাংশুকে তার মন থেকে উৎখাত করতে পারেনি। আসলে অবিশ্বাস-বিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে সে এখনো সুধাংশুকে ভালোবাসে। তাই আমরা লক্ষ করি, সুধাংশুর সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে অঞ্জনা নিজেই মনে মনে অনুতপ্ত হয়। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তার আন্তর্লোকে জমাট বাঁধে। তারা উভয়েই জানে, তাদের সম্পর্ক কখনোই আর স্বাভাবিকতা লাভ করবে না। অথচ এই দুটি মন পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকতে চায়। তাই সারাদিন নানা কাজকর্মের পর সুধাংশু একবার অঞ্জনাকে ফোন করে তার অস্তিত্বকে নতুনভাবে অনুভব করে। অপরদিকে অঞ্জনাও মনে মনে এই ফোনটিরই প্রতীক্ষায় থাকে। তাই সে মুখে যতই বলুক এ বিষয়ে পুলিশে খবর দেবে কিন্তু কখনোই তার দ্বারা সম্ভব হবে না। তাই হয়তো তাদের মধ্যে কখনো শারীরিক বা মানসিক মিলন ঘটবে না, শুধুমাত্র একটি স্বরের সঙ্গে আর একটি স্বরের সন্ধি থেকে যাবে। আর এই স্বরসন্ধিতেই বেঁচে থাকবে তাদের সম্পর্ক।

সাধারণত দু'জন মানব-মানবীর সম্মতিদানের মধ্য দিয়ে একটি সম্পর্ক সূচিত হয় এবং তা স্পষ্টরূপে তথা সাবলীলভাবে গতি লাভ করে থাকে। অর্থাৎ ঐ সম্পর্কের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে দু'জন মানুষই অবগত থাকে। কিন্তু কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটে। দেখা যায়, একপক্ষ নিলিপ্ত থাকলেও অপরপক্ষের হৃদয়ে তাকে ঘিরে বিশেষ আবেগ ঘনীভূত হয়। কাজেই নির্লিপ্ত থাকা ব্যক্তি না চাইলেও বা তার অজ্ঞাতসারেই বিপরীত মানুষটির সঙ্গে অলিখিত একটি

সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যায়। যার অস্তিত্ব শুধুমাত্র বিপরীত ব্যক্তির অন্তর্লোকেই বর্তমান থাকে। এমনই এক বিশেষ দিক লেখকের কয়েকটি গল্পে ধরা পড়েছে।

প্রথমে আসা যাক **'চোর'** নামক গল্পে। এটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, একই ছাদের তলায় যদি দু'জন সম-বয়সী নর-নারী বসবাস করে তবে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মনে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। এক্ষেত্রে তাদের বাহ্যিক পরিচয় তুচ্ছ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পুরুষের মনে একজন নারী হিসাবে, বিপরীতভাবে নারীর মনে একজন পুরুষের সত্তাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আলোচ্য গল্পে প্রধান দুটি চরিত্র হল – গোপাল ও নন্দিতা। তারা অসম বিত্ত এবং বৃত্তির অন্তর্গত দু'জন মানুষ। কাহিনীসূত্রে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, নন্দিতা একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। তার দাদা অফিসে কর্মরত। সে কলেজে পাঠরতা এবং নৃত্যকলায় পারদর্শিনী একজন নারী। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি চরিত্র হিসাবে সে এখানে উপস্থাপিত। তাদের পরিবারে গোপাল পরিচারক হিসাবে নিযুক্ত হয়। এই পুরুষ চরিত্রটির শিক্ষাগত যোগ্যতা কতখানি তার কোন সুস্পষ্ট তথ্য গল্প কাহিনী থেকে পাওয়া যায় না। তবে জানা যায়, অফিসে বেয়ারা হওয়ার যোগ্যতা তার বর্তমান। এই বস্তু জগৎকে পাশে সরিয়ে রেখে গোপালের চিত্তলোকে প্রবেশ করলে জানা যায়, বয়সের স্বাভাবিক ধর্মে প্রথম থেকেই নন্দিতাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়। নৃত্য-চঞ্চল নন্দিতার রূপ গোপালকে বিস্মিত করে। এই নারী সত্তা তার মানসলোকে বিশেষ উদ্দীপনার জাগরণ ঘটায়। বিগত ছয় মাস সময় ব্যাপী সে নন্দিতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

গোপাল খুব ভালোভাবে অবগত যে, কোন কোন বিষয়ে নন্দিতার খুশি জড়িয়ে আছে। কাজেই লক্ষ করা যায়, গোপাল নন্দিতার নির্দেশ ও আবদার পূরণে সর্বদা ব্যস্ত। আসলে সে তার প্রাণের মানুষটির ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতে চায়। শুধু তাই নয়, গোপালেরও যে একটি 'শিল্পী মন' আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় – পরিচর্যার মধ্য দিয়ে সে যখন গাছে গাছে ফুল ফোটায় আর সেই ফুল হাসি মুখে নন্দিতা খোঁপায় গোঁজে তখন তার শিল্পী সত্তা দোলায়িত হয়। আর তাই মনের গোপন কোণে নন্দিতাকে ঘিরে সে যে সম্পর্কের সূত্রপাত করেছে তাকে লালন করবার প্রেরণা জোগায়। যদিও তার মনের বার্তা বিপরীত মানুষটির হৃদয়ে সঞ্চারণে সে ব্যর্থ, অপরদিকে নন্দিতা গোপাল সম্পর্কে উদাসীন। তার কাছে গোপালের পরিচারক সত্তাই মুখ্য। তবে যাই হোক না কেন নন্দিতাকে ঘিরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি কখন যেন নিজের অজান্তেই গোপালের

মনের কোণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আর তাদেরই প্রতিক্রিয়ায় এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সে নানা স্বপ্ন গড়ে তোলে। এই স্বপ্ন যে ক্রমশ বিকশিত হয়ে চলেছে সেই সংবাদ শুধুমাত্র তার কাছেই প্রকাশিত।

ঘটনাক্রমে এই স্বপ্নপূরণের তাগিদে গোপাল নন্দিতার সখের ঘড়িটি চুরি করে বসে। জানা যায় – এর আগে সে কয়েকবার হাতসাফাই করলেও এবারের ঘটনার বিশেষত্ব আছে। কেননা, এই ঘড়ি বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তাই একটি অফিসে বেয়ারার চাকরির জন্য সে ঘুষ হিসাবে দেবে। আসলে এই চাকরির মধ্যে দিয়ে সে তার বৃত্তি ও বিত্তের খানিকটা পরিমার্জন করতে চায়। নিজের একটি ঘর তৈরী করে সেই ঘরে নন্দিতাকে সে স্ত্রী হিসাবে পেতে চায়। অর্থাৎ যে সম্পর্ককে সে আপন মনের রূপ-রস দিয়ে যতন করে গড়ে তুলেছিল, তাকে এক সুষ্ঠু পরিণতি দানে উদ্যোগী হয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, মনের ভাবাবেগ একটি চরিত্রকে কোন্ পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়। কাহিনীর প্রবাহমানতায় উঠে আসে, নন্দিতা তার প্রিয় ঘড়িটি হারানোর ঘটনায় ভারাক্রান্ত, গোপালের প্রাণের সেই চঞ্চলমূর্তি আজ পাথর-প্রতিমায় পরিণত হয়েছে, যা এই প্রেমিক পুরুষের কাছে দুঃসহনীয়। নন্দিতার মলিন বদন ও অশ্রুজল গোপালকে বিচলিত করে। তার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়। তাই দেখা যায়, সে ঘড়িটি যথাস্থানে রেখে নিজেকে চোর হিসাবে প্রকাশিত করে। এই ঘটনা নন্দিতা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ধরে নেয় – পুলিশ ও গণৎকারের ভয়ে গোপাল ঘড়িটি ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোন্ আবেগে সে নিজেকে 'চোর' রূপে প্রতিপন্ন করল সকলের কাছে তা অব্যক্ত রয়ে গেল।

এমনকি, তার প্রাণের মানুষটির বোধেও তা ধরা পড়েনি। সেই নীরব যন্ত্রণা শুধুমাত্র গোপালেরই। এখানেই এই গল্পের বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে। এক অপরিস্ফুট সম্পর্কের রূপরেখা এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে।

কখনো কখনো দু'জন মানুষের দ্বারা একটি সম্পর্ক যে মুহূর্তে স্বীকৃতি লাভ করে, বা বলা যায়, যখন সম্পর্কের অস্তিত্ব দুটি হৃদয়-ই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, ঠিক তখনই ঘটনাক্রমে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের আগমন ঘটে। ফলস্বরূপ সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে দুই হৃদয়তন্ত্রই অনুরণিত হতে থাকে। এমনই একটি দিক উঠে এসেছে **'শ্বেতময়ূর'** নামক গল্পে।

গল্পটি ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাধারণত দেখা যায়, গগনমণ্ডলে মেঘের ঘনঘটায় উল্লসিত হয়ে ময়ূরপাখিরা তাদের পেখম মেলে ধরে। সেই দৃশ্যের সৌন্দর্য সৌন্দর্যপিয়াসী মানব মনকেও আপ্লুত করে, বিস্ময় জাগায়। শুধু তাই নয়,

সেই আনন্দধারায় তার অন্তর্জগৎ নেচে ওঠে। ঠিক তেমনিই আলোচ্য কাহিনীর সূত্র ধরে উঠে আসে, ম্যাক্স নামের এক জার্মাণ যুবক ভারত-দর্শন উপলক্ষে গল্পের নায়িকা শীলাদের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করে। স্বাভাবিক ভাবেই শীলা তার রূপ-গুণে আকৃষ্ট হয়। শীলার মনে এই শুভ্রবর্ণের অধিকারী বিদেশী পুরুষটির সৌন্দর্যের ছটা শ্বেতময়ূরের অপরূপ সৌন্দর্যকে স্মরণ করায়। অর্থাৎ যুবকটির হৃদয়ের প্রফুল্লতা শীলার মনোলোকেও সঞ্চারিত হয়। লক্ষ করা যায়, ম্যাক্সের উপস্থিতি তার গতানুগতিক জীবনধারায় ভিন্ন স্বাদের জোয়ার বয়ে আনে। কাজেই সে নিজেকে নতুন রূপে খুঁজে পায়। আমরা দেখি, শীলা তার কল্পনার রাজ্যে আপন সত্তাকে ম্যাক্সের সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ভবিষ্যৎ জীবনকে পেতে চায়। আর সেই সূত্র ধরেই ম্যাক্স -এর যোগ্য সঙ্গিনী হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলবার নব অনুপ্রেরণা সে লাভ করে। বলা যায়, শীলার মনের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবেগ-অনুভূতির তরঙ্গগুলি ক্রমশ উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছিল তার বাড়ির অনুকূল পরিবেশ ও পরিবারের সদস্যদের পরোক্ষ প্রশ্রয়ের মাধ্যমে।

তবে বিশেষ ঋতুতে পরিযায়ী পাখিরা যেমন বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করে এবং বিশেষ বিশেষ স্থানের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণকে, আপন পালকে বয়ে নিয়ে পুনরায় নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ঠিক তেমন ম্যাক্সের দেশ থেকেও তার বাবার পাঠানো টেলিগ্রাম পেয়ে তাকেও ফিরে যেতে হয়। ঘটনাক্রমে লক্ষ করা যায়, যাওয়ার আগে এই দেশ সম্পর্কে, বিশেষত, শীলাকে কেন্দ্র করে তার হৃদয়ের বিশেষ আবেগানুভূতিকে আপন মাতৃভাষায় সে ব্যক্ত করে। অর্থাৎ এই দুটি মানুষের দেশ, ভাষা, সংস্কার পৃথক হলেও তাকে অতিক্রম করে দুটি মনই পরস্পরকে যে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে তা তারা উপলব্ধি করেছে। এই উপলব্ধি টুকুই তাদের জীবনের পরম পাওয়া, যা একটি সম্পর্ক গঠনের মূল উপকরণ স্বরূপ। কাজেই বলা যায়, কাহিনীতে শেষ মুহূর্তে, এই দু'জন নরনারীকে কেন্দ্র করে একটি সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটল ঠিকই কিন্তু তা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেল না। আর তারই বিরহ-বেদনায় নারীটির অন্তরাত্মা ক্রমশ অনুরণিত হতে থাকে। এই বিশেষ দিকটি-ই আলোচ্য গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

নর-নারীর সম্পর্কে নানা রূপ বর্তমান। সেই বৈচিত্র্যময় সম্পর্কেরই আর একটি উদাহরণ হিসাবে **'ফিরে লেখা'** গল্পটিকে এখানে আমরা আলোচনা করব। উদাহরণ হিসাবে বলার কারণ, গল্পটি এই পর্বে পূর্বে আলোচিত 'চোর' গল্পেরই প্রতিরূপ একটি গল্প। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও পুরুষ হৃদয়ভূমে একটি সম্পর্কের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালন সংঘটিত হয়েছে।

১৩৭০ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফিরে লেখা' গল্পে দুই বিত্তের অন্তর্গত দু'জন নর-নারীর জীবন ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যায়, অভিজাত পরিবারের সদস্যা তথা গল্পের নায়িকা নীলা মার্জিত রুচি সম্পন্ন ও বিশেষ প্রতিভার অধিকারী একজন নারী, অপরদিকে মধ্যবিত্তের সংস্কারে লালিত ও অর্থ কষ্টে জর্জরিত একটি জীবনের বাহক হিসাবে নায়ক অজয়ের চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে। তারা কলেজে সহপাঠী। এই সূত্র ধরে এবং একটি পত্রিকা সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে উক্ত দু'জন নর-নারী পরস্পরের মানসিক সাহচর্য লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে ঘটনাক্রমে পুরুষটির মনে নারীটিকে ঘিরে ভালোলাগা তৈরী হয়। যার মধ্য দিয়ে অলিখিতভাবে একতরফের একটি সম্পর্ক সূচিত হয়। বলা যায়, এই সম্পর্কের ভিত্তিমূলে ছিল পুরুষ-হৃদয়জাত প্রেমানুভূতি। তবে এই বিশেষ অনুভূতি বিপরীত অন্তর্জগতে প্রবাহমানতার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল তাদের সামাজিক অবস্থানগত ও প্রতিভার পার্থক্য। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নায়ক অজয় স্বয়ংসৃষ্ট সম্পর্ককে গোপনে সযত্নে লালিত করে চলছিল। তবে আলোচ্য গল্পে এ পক্ষের সেই গোপন বার্তা বিপরীত পক্ষ অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। কিন্তু লক্ষ করা যায়, বিষয়টিকে সে এড়িয়ে গিয়ে অজয়ের প্রতি সৌজন্য, সহানুভূতি ও তার শুভকামনা জানায়। অর্থাৎ শুধুমাত্র বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি এখানে প্রদর্শিত হয়। তবে নারীর মনের এই ছলনাটুকু পুরুষটি কিন্তু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এখানেই তার পরম পাওয়া। কেননা এই মিথ্যার আড়ালেই আছে সত্যের আভাস। কাজেই নীলার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার যখন অজয়ের প্রতি আরোপিত হয় তখন তা তার কাছে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে, পৃথক ব্যাখ্যায় গৃহীত হয়। এটাই তার জীবনের মূল অনুপ্রেরণা ও তার সম্পর্ককে বাহিত করবার প্রধান চালিকা শক্তি।

জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ভাবাবেগের অনুপ্রেরণায় দু'জন নর-নারী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সময়ের তালে তালে উক্ত ভাবাবেগকে আপাত দৃষ্টিতে ক্ষীণস্রোতা বলে মনে হলেও তাঁর অস্তিত্ব কিন্তু বর্তমান থাকে। জীবনের এই পর্বে কখনো কখনো বাহ্যিক আনুষঙ্গিক বিষয় অর্থাৎ বস্তুবাদীতা চরিত্রগুলির মনের কোণে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবার এর চূড়ান্ত পর্যায়ে মনের সেই অনুভূতি যা একটি সম্পর্কের অস্তিত্বের প্রধান উপাদান স্বরূপ, তার পুনর্জাগরণও ঘটে। তার প্রভাবে সমস্ত বাহ্যিক বিষয় তুচ্ছ বলে মনে হয়। কাজেই বলা যায়, এই দুই বিপরীত সত্তার টানাপোড়েনে চরিত্রগুলি হয় দ্বিধান্বিত। আর তার প্রভাব সম্পর্কগুলিতে প্রতিফলিত হয়। জীবনের এমনই সূক্ষ্ম অথচ চরম বাস্তব রূপটি প্রকাশিত হয়েছে লেখকের **'একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান'** নামক গল্পে। এটি ১৩৭১ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার দোল সংখ্যায় প্রকাশিত।

আলোচ্য গল্পের প্রধান নর-নারী হিসাবে সুরজিৎ ও বিপাশাকে পাওয়া যায়। জানা যায়, কলেজে তারা সহপাঠী ছিল এবং সেই সূত্র ধরে তাদের মধ্যে একটি সম্পর্কের সূচনা ঘটে। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সে সময়ে উভয়েরই বয়স ও অভিজ্ঞতার পরিমাণ স্বল্প ছিল। ঐ সময়পর্বে দায়িত্ববান যুবক সুরজিৎ -এর সততা, আদর্শবাদ ও স্বপ্ন দেখবার কৌশলের প্রতি বিপাশা আকৃষ্ট হয়েছিল। অর্থাৎ সুরজিৎ -এর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বিপাশার মনে বিশেষ ভাবাবেগ স্ফূরণে সাহায্য করেছিল। সে সময় এই অনুভূতি-ই ছিল একমাত্র প্রধান পাথেয়। যার প্লাবনে আলোচ্য গল্পের নারী চরিত্রটি-ই মূলত ভেসে গিয়েছিল। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ধনী ও অভিজাত পরিবারের মেয়ে বিপাশা তার বিষম বিত্ত ও সংস্কারে লালিত সুরজিৎ -এর সঙ্গেই নিজের জীবনকে বেঁধে দিতে চেয়েছিল। তাই দেখা যায়, তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় পরিজনরা যখন বিপাশার এই সামঞ্জস্যহীন দাবীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তখন তার প্রতিবাদে সে সুরজিৎ -এর বিদ্যাবত্তা, সততা আর চরিত্রমাধুর্যের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে। আসলে এ সময়ে এই বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুরজিৎকে জীবনসঙ্গী হিসাবে পাওয়াই ছিল বিপাশার মূল লক্ষ। আর এই লক্ষ পূরণের জেদ তাকে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঘটনাক্রমে সে তার উদ্দেশ্যে সফলও হয়। কিন্তু দেখা যায়, বাইরের বাধা যখন বিপাশা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তখন তার অন্তরের বাধা বড় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, প্রত্যেকটি মানুষই তার অবস্থান থেকে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। বিপাশাও তার ব্যতিক্রম নয়। সুরজিৎ বিপাশার পরিবারের তুলনায় অর্থ-যশ-প্রতিপত্তিতে বহু নীচু স্তরে অবস্থান করলেও তার আদর্শবাদ ও বিপ্লবীসত্তার প্রতি বিপাশা আস্থা রেখেছিল। সে আশা করেছিল ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই সুরজিৎকে তার (বিপাশার) কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে একদিন পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই বিপাশার মনে উচ্চাশার বীজ প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

কিন্তু দেখা যায়, সুরজিৎকে ঘিরে যে ধারণাগুলি বিপাশার মনে গড়ে উঠেছিল তা সময়ের তালে তালে ভাঙতে থাকে। পরিবারের সঙ্গে মানসিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় যে বিষয়গুলিকে সে গুরুত্ব দেয়নি যুদ্ধ জয়ের পর তা বিশেষভাবে তার কাছে ধরা পড়ে। বিপাশা উপলব্ধি করে যে আদর্শের মিল তাদের মধ্যে ছিল, সেই মিল আজ তিল প্রমাণ। সুরজিৎ -এর যে বিদ্রোহী সত্তা তথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে বিপাশা একদিন মুগ্ধ হয়েছিল তা স্ফুলিঙ্গ মাত্রই, কখনো আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে না, প্রলয়কাণ্ড ঘটাবে না। এখন সুরজিৎ -এর বিশ্ব-বিপ্লব শুধুমাত্র পরিজন-পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই বলা যায়, আলোচ্য গল্পের নায়ককে কেন্দ্র করে নায়িকার মনে যে

অনুভূতির জাগরণ ঘটেছিল তা সময় ও পরিস্থিতির ব্যবধানে ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ে। আর সেই সুযোগে নারীটির মনে বস্তুবাদ মাথাচাড়া দেয়। সেই সঙ্গে সুরজিৎ -এর দোষ-ত্রুটিগুলি বড় হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ লক্ষ করা যায়, বিপাশার মনে ভেসে ওঠে –"মোটেই স্মার্ট নয় সুরজিৎ। কর্মপটু নয়। শুধু পড়াশুনায় ভাল। আগে ভাল পড়ুয়া ছিল, এখন ভাল পড়ায়।"[৩৩৯] তার আরও মনে হয় – "ও যে যজমানী বামুনের ছেলে, সেই স্মৃতি, সে সাধারণ সংস্কৃতি কিছুতেই যেন সুরজিৎ ভুলতে পারে না, কি ভুলতে চায় না। ওর আর্থিক দীনতা, রুচির দীনতা বার বার ধরা পড়ে। নিজেকে মার্জিত করার ইচ্ছা ওর নেই। বরং ভিতরে ভিতরে ওর জেদ খুব প্রবল। দারিদ্র্যের অহংকার ষোল আনা। সেই জন্যই দারিদ্র্য ঘোচে না।..... ভাবনা হয়, এই পর্বতপ্রমাণ অমিল কি শুধু বিয়ের চুক্তিনামায় সই করলেই ঘুচে যাবে ? সংশয় ঘোচে না বিপাশার।"[৩৪০] আবার কখনো কখনো বিপাশা অনুভব করেছে –"যে উদ্যম নিয়ে সে বাবা-মা, দাদা-বৌদির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ শেষের পর জয়ের ফল ভোগ করবার দিকে তার আর সেই উৎসাহ নেই। ক্লান্ত, বিপাশা ভারি ক্লান্ত। বিবাহ তো একটা উৎসব। মিলন উৎসব। ক্লান্ত মন নিয়ে কি সেই উৎসব পালন করা যায় ? শরীর একটু খারাপ থাকলে, কিংবা কোন অনির্দেশ্য কারণে মন বিমর্ষ বিষন্ন হয়ে থাকলে, বিপাশা পরম বন্ধুর নিমন্ত্রণও রাখে না। .....এ উৎসব তো দুদিন একদিনের নয়, জীবনব্যাপী যে মহোৎসব – তারই সূচনা।"[৩৪১] অর্থাৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিপাশার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করেছে।

আসলে এই যুদ্ধ বিপাশার অন্তরের, এ তার নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ। এই দ্বন্দ্ব থেকেই সে যেমন নিজেকে মুক্ত করতে চায় তেমন এতদিনের আবেগ ও অভ্যাসে সম্পৃক্ত সম্পর্ককে অস্বীকার করাও তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অথচ অনুভূতির সেই তীব্রতাকেও সে খুঁজে পায় না, যার মাধ্যমে সমস্ত সংশয় ও সংকোচ দূর করতে সক্ষম হবে। কাজেই মনের এই অস্থিরতা তাদের সম্পর্ককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে থাকে। অপরদিকে সুরজিৎ -এর কাছেও বিপাশার মনের এই দোলাচল রূপ ধরা পড়ে। তাই এই সম্পর্কের পরিণতিতে বিপাশা যখন তার 'মনের সাড়া'র প্রতীক্ষার কথা সুরজিৎকে জানায় তখন প্রত্যুত্তরে সুরজিৎ তার কাছে কাতর মিনতি জানায় – "যা কিছু দিয়েছিলে ফিরিয়ে নাও তুমি, শুধু সে স্মৃতিটুকু নিও না নিও না"[৩৪২] এই গভীর আবেদনের প্রতিক্রিয়ায় আমরা লক্ষ করি, বিপাশা সমস্ত সংকোচ অতিক্রম করে সুরজিৎ -এর কাঁধে তার অশ্রুসিক্ত বদনখানিকে চেপে ধরে। জীবনের এই শাশ্বত চিরন্তন মুহূর্তকে তারা দু'জনেই চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়। কিন্তু যান্ত্রিক জীবনে বস্তুতন্ত্রের তাড়নায় তা প্রতিনিয়ত টলমল করতে থাকে। নাগরিক সভ্যতায় নাগরিক প্রেম যেন এমনভাবেই বহুরূপ ধারণ করে।

সূচনালগ্ন থেকেই জীবন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। আর এই বিস্তৃত সময়পর্বে (জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) নানা লিখিত ও অলিখিত সম্পর্ক জীবনে এসে ভিড় করে। তার এক একটির স্বাদ এক এক রকমের। আবার একই সম্পর্ক ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন স্বাদ বয়ে আনে। এই নতুন নতুন বিভন্ন সম্পর্কের অনুভূতি কখনো প্রকাশ্যে আসে, কখনো বা দুটি হৃদয়ের অন্তরালেই লালিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে বলা যায়, বৈধ সম্পর্কে নানামুখী ধারা থাকলেও তা একটি বলয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে আবর্তিত হয়। সেদিক থেকে অবৈধ সম্পর্কে বিভিন্ন 'শেড' থাকে। তার এক একটি এক একভাবে জীবনকে দীক্ষিত করে চলে, নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করে। এই সম্পর্কগুলি যে শুধুমাত্র স্নিগ্ধ, মধুর, লাবণ্যময় তা নয়, সর্পিল, জটিল, কুটিল বিভিন্ন রূপের সমষ্টি-ই সেখানে পরিলক্ষিত হয়। কখনো তাতে থাকে অতৃপ্ত লালসা, আসক্তি, বিকৃত মানসিকতার ছাপ, কখনো বা হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ। কাজেই বলা যায় – এই বিভিন্ন রূপের অবৈধ সম্পর্কের মোড়কেই প্রত্যেকটি মানুষের জীবন আবৃত থাকে। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু হয়তো জীবনে স্বীকৃতি পায়। তবে বাকী যেগুলি থাকে সেগুলিও বিচিত্র রসের সন্ধান দেয়। যার অস্তিত্বে জীবন ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর **'ভগ্নাংশ'** গল্পে জীবন দর্শনের এই আলোকেই প্রতিফলিত করেছেন। গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক।

আলোচ্য গল্পের মূল চরিত্র অনিমেষকে একটি কামার্ত পুরুষ হিসাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। বহুচারিতা তার মজ্জায় স্থিত। তাই দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও নিত্যনতুন নারীর সাহচর্য, সান্নিধ্য সুখ, স্পর্শ লাভে সে উদ্‌গ্রীব। যা তার জীবনে একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই অভ্যাসের দ্বারা সে তার কর্মব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি দূর করে, নিজেকে আনন্দ দেয়। কাজেই এই উদ্দেশ্য মুখ্য থাকায় কোন নারীর প্রতিই তার বিশেষ অনুভূতি এখনো পর্যন্ত জন্ম নেয়নি। ঘটনাক্রমে এই অনিমেষের সঙ্গে এক রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বীথিকার সাক্ষাৎ ঘটে। আসলে এই আলাপ অনিমেষের-ই তাগিদে অনিবার্য হয়। দেখা যায়, পরিবারের প্রতি দায়-দায়িত্ব পালনের ব্যস্ততায় বীথিকা কখনো নিজের কথা ভাববার সময় বা সুযোগ কিছুই পায়নি। তবে এই প্রথম একজন পুরুষের সাহচর্য ও সান্নিধ্যে সে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়। যান্ত্রিক কর্মব্যস্ত জীবনও যে কত রঙিন তা এতদিনে বীথিকা উপলব্ধি করতে পারে। আর তাতেই সে আপ্লুত হয়। জীবন সংসারকে নতুনভাবে সে ভালোবাসতে শেখে। অর্থাৎ বলতে হয় – অনিমেষ-ই বীথিকার জীবনের এক অজানা জগৎকে উন্মোচিত করে। তার বাঁচার মানে খুঁজে দেয়। সেই জগতের স্বাদ তার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে ভিন্ন মাত্রা দান করে।

অন্যদিকে দেখা যায়, বীথিকাকে বিদায় দেওয়ার পর সারাটা দিন কীভাবে কাটল তা বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনিমেষ তার অভ্যাস মতই অর্থ-অপচয়ের দিকটির কথা ভাবতে থাকে। তবে লক্ষণীয়, এবার অর্থ-অপচয়ের জন্য ততখানি আক্ষেপ তার মধ্যে দেখা যায়নি। এই বিষয়টি-ই তাকে বিস্মিত করে। তার মনে হয় বীথিকাও তার অভ্যস্ত জীবনের শিকার। তা সত্ত্বেও প্রতিদিনের সেই গতানুগতিকতাকে ছাপিয়ে সে অনুভব করে হয়তো সেই অনুভবের রং-ই তাকে বাড়ি ফিরে আসবার সময়ে গোধূলির রক্তরাগকে চিনতে সাহায্য করেছিল। যে গোধূলি প্রতিদিনই নেমে আসে পৃথিবীর বুকে তা অনিমেষের চোখে আজ নতুনভাবে ধরা দেয়। বীথিকার প্রতিও সে সহানুভূতি অনুভব করে। সেই সহানুভূতি গভীর হয়ে অন্য কোন অনুভূতির রূপ নেবে কি না তা সময় বলবে। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে যে ভাবাবেগ অনিমেষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তারই উদ্দীপনায় সে হয়তো এক ডজন ফুল কেনে। এই ফুলই যেন তার হৃদয়ে জাগ্রত অনুভূতির স্মারক চিহ্ন স্বরূপ। তবে সেই হৃদয়ানুভূতিকে স্বীকৃতি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা, সে দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ। বীথিকার সঙ্গে স্থাপিত সম্পর্কটি হয়তো অলিখিত-ই থেকে যাবে। তবে এই সম্পর্কটি যে তার জীবনকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে তা অনস্বীকার্য। আর তা প্রকাশের চিহ্ন হিসাবেই বোধ হয় ফুলগুলি সে স্ত্রীকেই দান করে। জীবন এমন-ই। খণ্ড খণ্ড অনুভূতি ও ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের সমষ্টি লাভ করে। এখানেই বোধহয় গল্পটির নামের ব্যঞ্জনা নিহিত।

গন্তব্যহীন পথে চলতে চলতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে ওঠে। আসলে একঘেয়েমিতা এই ক্লান্তির মূল কারণ। কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার উদ্দেশ্য থাকলে সেই উদ্দেশ্যই পথের ক্লান্তি কে দূর করে। কিন্তু গন্তব্যস্থান নির্দিষ্ট না থাকলে যাত্রাপথের সূচনা লগ্নের সেই উদ্দীপনা একটা সময় মিলিয়ে যায়। এই বিষয়টির সঙ্গে বোধহয় মানব-সম্পর্কেরও গভীর মিল আছে। মানব-মানবীর মূলত প্রেমের সম্পর্ককে ঘিরে দু'জন মানুষের মনেই নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে – মন যেগুলিকে পূরণ করতে চায়। কিন্তু একটি সম্পর্ক যদি দীর্ঘদিন একই জায়গায় রয়ে যায়, প্রকৃতির কোন রূপ পরিবর্তন যদি না হয় তবে যে অনুভূতিকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সেই অনুভূতির তীব্রতাও একসময় ম্লান হয়ে যায়। সম্পর্কের রহস্য নিঃশেষিত হয়ে যায়, কেননা, ততদিনে পরস্পরকে তারা খুব বেশি জেনে ফেলে। এমত পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্কের অস্তিত্ব যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমন তা থেকে নিষ্কৃতি পেতেও মন চায়। সম্পর্কের এই নিগূঢ় তত্ত্বকথাটি কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর **'অভিসার'** গল্পে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এখানে লেখক যেভাবে কাহিনী-জাল বয়ন করেছেন তাতে দেখা যায় – নায়িকা নন্দিতা নায়ক আত্মীয়স্বজনহীন, হীন স্বাস্থ্যের অধিকারী সুবীরের বিদ্যাবত্তায়, সাহিত্যপ্রীতি ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার প্রতি একদিন আকৃষ্ট হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলি স্বভাবিক নিয়মেই ঘটেছিল। সুতরাং এই স্বপ্নপূরণ করবার জন্য যে সমাজ স্বীকৃত 'দাম্পত্য সম্পর্কে' পদার্পণ করবার প্রয়োজন ছিল সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাঠকেরাও অবগত হই। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যায় – টিবি রোগ সুবীরকে একেবারে ধরাশায়ী করে দেয়। তবে সে সময় নন্দিতা তার সর্বস্ব দিয়েই সুবীরের সেবা-পরিচর্যা করে। কোন দিন ফল কোন দিন বাড়ির তৈরী খাবার ক্যারিয়ারে করে নিয়ে আসে নন্দিতা। নতুন নতুন গল্পের বই এবং মাসিক পত্রিকা সে উপহার দেয় সুবীরকে। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন সুবীরের বিছানার পাশে বসে নন্দিতা তাকে সোহাগ আর সান্ত্বনা দান করে। তাকে আশা ভরসায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। এক্ষেত্রে বলা যায় – এই সান্ত্বনা কেবলমাত্র সুবীরকে নয়, হয়তো নন্দিতা নিজেকে নিজেই দিয়েছে। তাই দেখা যায়, একসময় সুবীর সুস্থ হয়ে উঠলেই নন্দিতা নতুন আশায় বুক বেঁধেছে। তার অধরা স্বপ্নগুলিকে হয়তো নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা বিভ্রাট কিংবা সুবীরের রোগ প্রতিরোধ করবার শক্তির অভাব তাকে আবার অসুস্থ করে তোলে। হাসপাতাল থেকে আর তার বেরনো হয় না। ফলে উভয়েরই বিশেষত নন্দিতার স্বপ্ন আবার ভেঙে যায়। এইভাবে দীর্ঘ সাতবছর এক লয়ে চলতে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলতে হয়, একজন অসুস্থ মানুষের সঙ্গে আর একজন সুস্থ মানুষের সবসময় মানসিকতা মিলিয়ে চলা সম্ভব হয় না। তারই সঙ্গে দীর্ঘদিন একটি বৈচিত্র্যহীন সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে যখন কোনও আশাই পূর্ণ হয় না (এক্ষেত্রে শুধু বাহ্যিক বা মনোগত আকাঙ্ক্ষা নয়, মানুষের শারীরিক চাহিদাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে) এবং ভবিষ্যতেও সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই সম্পর্কটি জীবনের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সম্পর্কের সূচনা লগ্নের সেই অনুভূতির তীব্রতাও একসময় হ্রাস পায়। এর অস্তিত্ব থাকলেও তা আর গভীরভাবে অনুভব করা যায় না। ফলে তখন এই একঘেয়েমি সম্পর্ক থেকে মুক্তি পাওয়াটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই বিষয়টি গল্পের নায়িকা নন্দিতার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই দেখা যায় – প্রতিদিন ঐ এক রোগ, এক হাসপাতাল, একই রকমের সান্ত্বনা প্রদান নন্দিতার কাছে বড় একঘেয়ে হয়ে ওঠে। আর এর থেকে মুক্তি লাভের জন্যই একসময় সে কলকাতার বাইরে একটি স্কুলে চাকরি নেয়। লক্ষণীয়, সেখানে গিয়ে নন্দিতার

ভীষণ ভালো লাগে। সে যেন এতদিন বাদে এক নতুন জগতের সন্ধান পায়। সে জগতের রূপ-রস স্বাভাবিকভাবেই নন্দিতার কাছে ভালো লাগতে থাকে। ফলস্বরূপ অতীতের বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনকে সে ভুলে থকেতেই চেয়েছে। এই কারণে সে আগের মত সুবীরের চিঠির জবাব দেয়নি, ঘন ঘন দেখতে যাওয়াও তার আর হয়ে ওঠেনি, সুবীরের দীর্ঘ চিঠির উত্তরে ছোট করে উত্তর লিখেছে নন্দিতা। অর্থাৎ এই পর্বে এসে তার মনান্তর ঘটে। অপরদিকে এই নিয়ে সুবীর যখন তীব্র অভিমানে জানায় যে নন্দিতা আর আগের মত তাকে ভালোবাসে না তখন নন্দিতার মন বলে ওঠে – "এই অবুঝ চিররুগ্ন মানুষটিকে কী করে বোঝানো যায় ভালোবাসা প্রতি মুহূর্তে একরকম থাকে না। রোজ একরকম থাকে না। সেই স্রোতেরও জোয়ার-ভাঁটা আছে।"[৩৪৩] এক্ষেত্রে বলা যায় মনে যখন একজনের প্রতি ভাঁটার শোষণ শুরু হয় তখন সেখানে অবিরাম ভাঁটার টানই চলতে থাকে। তাই দেখা যায়, সুবীর নন্দিতার কাছে শুধুমাত্র তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কাতর হয়ে উঠলে এক্ষেত্রে নন্দিতার ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এইভাবে –"সুবীর নাম যশের কাঙাল নয়, শুধু ভালোবাসার কাঙাল। ও কি জানে না কাঙালকে বেশিদিন ভালোবাসা যায় না। শুধু অনুকম্পা করা যায়, করুণা করা যায়।"[৩৪৪]

তবে দেখা যায়, সুবীর-এর প্রতি নন্দিতার এই উদাসীনতাকে সুবীর মেনে নিতে পারেনি। তাই সে নন্দিতার কাছে ছুটে চলে গেলে নন্দিতাও বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, তাদের সম্পর্কের কথা কারও কাছে সে স্বীকার করেনি এবং পরের ট্রেনে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় সুবীর আহত হলেও আবার একটা সময় থেকে নন্দিতার কাছে চিঠির পর চিঠি পাঠিয়ে সে তার মনের সমস্ত অভিমানকে মেলে ধরে, যা নন্দিতার কাছে দুঃষহ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে নন্দিতার অভিব্যক্তি –"সে ভাবতে লাগল এ কোন্ ধরণের পুরুষ বিন্দুমাত্র যার আত্মসম্মান নেই। সব শেষ হয়ে গেছে শুনেও যে ছেড়ে দিতে চায় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে তাকে বেঁধে রাখতে চায় তাকে সহ্য করা কি সহজ? কী করে এই কারাগার থেকে রক্ষা পাবে নন্দিতা ভেবে পায় না। একজন যেন অবাঞ্ছিত বাসনার দুই বাহু মেলে তাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে পিছনে পিছনে ছুটে আসছে। আর নন্দিতা প্রাণপণে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ছুটে পালাচ্ছে। পথের আর শেষ নেই।"[৩৪৫] সুতরাং এমন একটি মানসিকতায় দাঁড়িয়ে সুবীরের কাছ থেকে তথা সম্পর্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার দিকটিই নন্দিতার কাছে প্রধান লক্ষ হয়ে ওঠে। ফলে মুক্তি কামনার অন্তরালে হৃদয়ের গভীর স্তরে প্রেমানুভূতি চাপা পড়ে থাকে।

লক্ষ করা যায় – সুবীরের জীবন বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নন্দিতা একরকম ভাবে

জীবনকে উপভোগ করছিল। তবে সে জীবনও বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে পারেনি। আসলে তার জীবনের দাবী ছিল অন্য। আর সেই দাবীর তাগিদেই হয়তো নন্দিতা বাবা-মায়ের পছন্দ করা পাত্রকে গোপনে বিয়ে করে। তবে দেখা যায়, বিয়ের পিঁড়িতে বসে নন্দিতার মনে পড়ে যায় – একটি টিবি হাসপাতাল, একটি বেড, একজন রোগী এবং সেই রোগীর কাছে করা বহুদিনের প্রতিশ্রুতির কথা। এক্ষেত্রে বলা যায়, বাস্তবের আঘাতে একটা সময় সুবীরের প্রতি তিক্ততা ও বিরক্তি নন্দিতার মনে জেগে উঠেছিল এবং তা থেকে মুক্তি লাভেই সে ব্যস্ত ছিল ঠিকই কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতার উদ্দেশ্য যখন সফল হয়, বিদ্বেষ-তিক্ততার অবসান ঘটে তখন অন্তরের গভীরস্তরে থাকা আবেগানুভূতি মাঝে মাঝেই তার অস্তিত্ব জানান দেয়। তারই বশবর্তীতে জীবনের আর একটি পর্বে পদার্পণ করতে গিয়ে সুবীরের কথাই নন্দিতার মনে পড়েছে। কেননা, এই জীবনের স্বপ্ন তো সে তাকে নিয়েই দেখেছিল। লক্ষণীয়, সেই মনেই ধরা পড়েছে – নন্দিতা বিয়ের পর প্রয়োজনীয় জিনিস সবই পেয়েছে, তবুও যেন অভাব তার রয়ে গিয়েছে, তা হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের অভাব। আর তখনই স্বামীর সঙ্গে সুবীরের তুলনাটা মনের কোণে বার বার স্বভাবিকভাবেই দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তাই এক স্মৃতির প্রসঙ্গে নন্দিতার মনে জেগে ওঠে –"সেই প্রতিশ্রুতি অবশ্য রাখতে পারেনি নন্দিতা। কিন্তু ওর সেদিনের সেই কথার মধ্যে কোন অসত্য ছিল না। একদিন যা সত্য ছিল তা যে চিরদিন সত্য থাকবে না তা কে জানত। তাই বলে সেই আগের দিনগুলি কি মিথ্যা ?"[৩৪৬] অর্থাৎ জীবনের এই পর্বে এসে নন্দিতার মধ্যে একটি বিশেষ দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। একদিকে স্বামীর প্রতি রয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতা অপরদিকে প্রেমিক সুবীরের প্রতি আছে করুণা ও সহানুভূতি। এই বিষয়ে উল্লেখ্য, নন্দিতা যাকে করুণা ও সহানুভূতি বলেছে তার সঙ্গে প্রেমানুভূতি গভীরভাবে সম্পৃক্ত আছে কিনা তা বুঝে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে যাই হোক না কেন, দেখা যায় – নন্দিতা তার সধবার চিহ্নগুলিকে পরিত্যাগ করে কুমারী বেশেই সুবীরের কাছে প্রায় দিনই যেতে থাকে। একসময় তার মনে হয় – সুবীর হয়তো নন্দিতার বিয়ের কথা কোন বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পেরেছে। তার ছদ্মবেশ সুবীরের কাছে অজানা নয়। এই কারণেই হয়তো সুবীর এতখানি নির্লিপ্তভাবে বলতে পারে – "আমি আর এখন বেশি কিছু চাইনে নন্দিতা। আমার সাধনা এখন সবচেয়ে কম চাওয়ার, প্রায় না চাওয়ার সাধনা। আমার পরীক্ষা এখন সব চেয়ে কম পেয়ে এমন কি কিছু না পেয়েও কী করে বেঁচে থাকতে পারি তাই নিয়ে।"[৩৪৭] সুবীরের কাছে যে কিছুই আর অজানা ছিল না এই উক্তিই তার প্রমাণ। তবুও সে নন্দিতার এই ছলনাটুকু ভাঙ্গতে পারেনি,

কেননা, এই ছলনার আশ্রয়ে জীবনের শেষ পর্বে যেটুকু সে পাচ্ছে তা-ই তার কাছে পরম পাওয়া বলে মনে হয়েছে। এভাবেই আলোচ্য গল্পে একটি সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

কাহিনীর শেষ পর্যায়ে নন্দিতার ভাবনার মধ্য দিয়ে উঠে আসে তার অন্তঃসত্তা হওয়ার দিকটি। অর্থাৎ জীবন থেমে থাকে না। তা নিত্য নতুন সম্পর্ককে সঙ্গী করে এগিয়ে চলে। আগামী দিনে নন্দিতার জীবনও যে নানা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে তারই ইঙ্গিত দিয়ে গল্পকার কাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

একটি চাকরিকে কেন্দ্র করে একই সম্পর্কের নানামুখী গতিধারার দিকটি কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'চাকরি'** গল্পে উঠে এসেছে। অর্থাৎ চাকরি এখানে একটি সম্পর্কের প্রধান নিয়ামক। বিষয়টি কীরূপ তা বুঝে নেওয়া যাক।

নাগরিক সভ্যতায় অবস্থানরত মধ্যবিত্ত জীবন কাঠামোর পটভূমিকায় অর্থসংকট বনাম হৃদয়বৃত্তির টানাপোড়েন আলোচ্য গল্পের মুখ্য বিষয়। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এইগুলি মানুষের প্রাথমিক চাহিদা। সামগ্রিকভাবে এই চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। আর এই অর্থের অসঙ্গতি মানব-সম্পর্কের ধারাবাহিকতায়ও অসঙ্গতি আনে। 'চাকরি' গল্পের প্রধান নর-নারী নীলাম্বর ও মাধবী দু'জনেই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছে। মেধাবী ছাত্র নীলাম্বর এম.এ. পাশ করে 'উদয়ন' নামক একটি প্রেসে চাকরি নেয় অপরদিকে মাধবীও এম.এ. পাশ করে একটি হাইস্কুলে পড়ায়। সাহিত্যপ্রীতি এই দু'জন মানুষকে কাছাকাছি এনেছিল। নীলাম্বর কবিতা ও প্রবন্ধ এই দুটি ধারার রচনাতেই সুখ্যতি অর্জন করে। মাধবীর দাদার মধ্যস্থতায় তাদের সম্পর্ক স্থাপনের ছয় বৎসর পর একটি জটিল পরিস্থিতি অর্থাৎ নীলাম্বরের চাকরিটি চলে যাওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে। সেখানে দেখা যায়, প্রেসের মালিকের সঙ্গে বহুদিন ধরেই নীলাম্বরের একটা মনোমালিন্য চলে। তা থেকে নিজেকে খানিকটা মুক্তি দিতেই সে মাধবীর অনুরোধে জব্বলপুরে বেড়াতে যায়। মাধবীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে নীলাম্বর সেখানে বেশ কিছুদিন সময় কাটিয়ে আসে। যথাসময়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ না দেওয়ায় অফিসের মালিকের সঙ্গে মনোমালিন্য চরমে পৌঁছোলে নীলাম্বর চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। তা তার মনেও বিশেষ ছাপ ফেলে এবং লক্ষ করা যায়, এই মনেরই একটা অংশ উক্ত ঘটনার জন্য মাধবীকেই দায়ী করতে থাকে। অর্থাৎ এখান থেকেই তার মনে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন

ঘোষিত হয়। তাই কাহিনীর সূচনাতে দেখা যায়, অভ্যাসমত মাধবী যখন নীলাম্বরের বাড়িতে গিয়েছে তখন তাকে দেখার পর অন্যান্য দিনের মত নীলাম্বরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, আহ্বানের মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। শুধু নীলাম্বর নয়, পরিবারের সকলেই তার প্রতি উদাসীন থেকেছে। বিষয়টিতে মাধবীকে প্রথমটায় আশ্চর্য হলেও নীলাম্বরের কাছে সবটা জানার পর যখন এর কারণ সে জানতে চেয়েছে তখন নীলাম্বর জানিয়েছে – "কারণ অবশ্য অনেক। কিন্তু সমূহ কারণ আমাদের প্রমোদভ্রমণ।"[৩৪৮] নীলাম্বরের এই বিশ্লেষণ যে মাধবীকে আহত করবে তা খুব স্বভাবিক। তাই লক্ষ করা যায় মাধবী এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে গভীর অভিমানে আত্মসমালোচনা করে – "তা হলে তোমার চাকরি যাওয়ার জন্য এক হিসাবে আমিই দায়ী। আমিই তোমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছি। অফিসে সময়মতো জয়েন করতে দিইনি।"[৩৪৯] মাধবী আশা করেছিল নীলাম্বর এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করবে। কেননা, তারা দু'জনেই আনন্দ উপভোগ করেছে, দু'জনে মিলে একটা ভালো সময় কাটিয়েছে। সেই সুখস্মৃতি উভয়ের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উত্তরে নীলাম্বরের গলাটা তেমন জোরালো শোনায়নি। এই বিষয়টি যে মাধবীকে আরও বেশি আঘাত করবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শুধু তাই নয়, নীলাম্বর কথা প্রসঙ্গে তার বাবার উক্তিকে মাধবীর সামনে জোরালো ভাবেই তুলে ধরে – "তিনি বলেছিলেন গরীবের সংসারে বিয়ে করাটাই ভালো। তাতে ঘর-গৃহস্থালী থাকে, চাকরি-বাকরি থাকে। কিন্তু প্রেমটা বড় সাংঘাতিক।তাতে হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, সব নষ্ট হয়।"[৩৫০] এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মাধবীর মনে হয়েছে – নীলাম্বরের বাবা এখানে উপলক্ষ মাত্র, এ আসলে নীলাম্বরেরই মনের কথা। অপরদিকে নীলাম্বর ও মাধবী একসঙ্গে বের হলে মাধবী তার খানিকটা পথের সঙ্গী হতে চায়। কেননা, আর.জি.কর রোডে তার এক পিসতুতো ভাই আছে, তার সঙ্গে দেখা করে চাকরির ব্যাপারে মাধবী কিছু আলোচনা করবে। কিন্তু দেখা যায়, নীলাম্বর তাতে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে চলন্ত-ট্রামে উঠে যায়। এতে মাধবীর ধারণা হয় – নীলাম্বর তাকে বিশ্বাস করেনি, নীলাম্বরের সমস্ত পথের সঙ্গী হবে বলেই মাধবী একটা অজুহাত দিয়েছে। এই বিষয়টি অনুধাবনের মধ্য দিয়ে মাধবীর আত্মসম্মানবোধ আহত হয়। কাজেই বলা যায়, শুধুমাত্র নীলাম্বরের মন নয়, মাধবীর মনের পূর্বস্থিত অনুভূতিগুলি রূপান্তরিত হতে থাকে। এ যেন প্রকৃতির ঋতু-বৈচিত্র্যের মত। প্রচণ্ড দাবদাহে মাটি যেমন ফেটে চৌচির হয়, রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যায় তেমন আবার প্রবল বর্ষার আগমনে ঐ মাটি-ই সিক্ত হয়ে সৃজনক্ষমতা লাভ করে। অর্থাৎ পরিস্থিতির সাপেক্ষে মানব-মনের

অনুভূতিতে জোয়ার-ভাঁটা সংগঠিত হয়। আর তারই প্রভাব চলমান সম্পর্কে প্রতিফলিত হতে থাকে।

কেন্দ্রিয় চরিত্র দুটির স্মৃতিচারণ কিংবা কথা প্রসঙ্গে যে তথ্য উঠে আসে তাতে দেখা যায় – বর্তমানে নীলাম্বর ও মাধবীর সম্পর্ক সহজ স্বাভাবিক হলেও সূচনাপর্বে তা এমন ছিল না। দুই পক্ষের পরিবার থেকেই আপত্তি উঠেছিল। নীলাম্বরের পরিবার অসবর্ণের বিয়েকে সমর্থন করেনি, অপরদিকে নীলাম্বরের একটি ভালো চাকরির অভাব ছিল মাধবীর পরিবারের আপত্তির কারণ। তবে সময়ের সঙ্গে তারা দু'জনেই সেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিল। এরপর লক্ষ করা যায় – মাধবী কিংবা পরিবার নীলাম্বরের কাছে বিয়ের প্রসঙ্গ তুললে সে বার বার আর্থিক অসঙ্গতির দোহাই দিয়েই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে। আসলে নীলাম্বর অর্থ নিয়ে চিন্তা করেছে ঠিকই কিন্তু তার কোন চেষ্টা করেনি। ফলে দিনের পর দিন সময় গড়িয়ে গিয়েছে কোন অবস্থারই পরিবর্তন ঘটেনি। তবে এই সংকটকালীন মুহূর্তে প্রথমত, পরিবারকে বাঁচানো ও দ্বিতীয়ত, তাদের বিয়ে করবার জন্য যে কোন একটা চাকরি অত্যন্ত জরুরী ছিল। আর তার জন্য মাধবীর নিজের উদ্যোগ গ্রহণ করাটা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। তাই দেখা যায় – মাধবী তার সাধ্য মত সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে, বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি করেছে। শুধু তাই নয়, নিজের মাইনের সমস্ত টাকাটাই সে নীলাম্বরের পরিবারকে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নীলাম্বর ও মাধবীর সম্পর্ক নিয়ে নীলাম্বরের মা'র আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। নীলাম্বরের চাকরিটি চলে যাওয়ায় সেই মনের তিক্ততা যেন নতুন করে জেগে ওঠে। তবে মাধবী যেদিন নিজের মাইনের টাকা তার হাতে তুলে দেয় তখন নীলাম্বরের মা যেন সব ভুলে প্রয়োজনকেই বড় করে দেখেন। এখানে নারী মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ দিক নিহিত আছে। যা এক ভিন্ন আলোচনার প্রসঙ্গ। দেখা যায়, নীলাম্বরও বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। ফলে জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে তাদের সম্পর্কও যে প্রাণহীন হয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। তবে মাধবী যখন সব জায়গায় আপ্রাণ চেষ্টা চরিত্র করতে থাকে তখন নীলাম্বরেরও তার প্রতি সহানুভূতি জাগে। তার মনে হয় যে কোন রকম একটা চাকরি পেলেই সে এবার মাধবীকে বিয়ে করবে।

এমত পরিস্থিতিতেই এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সঙ্গে মাধবীর দেখা-সাক্ষাৎ হয়। মাধবী আত্মসম্মান প্রায় ত্যাগ করেই সেই বান্ধবীর স্বামীর কাছ থেকে নীলাম্বরের জন্য একটি চাকরির পাকা কথা আদায় করে নেয়। তবে ঐ চাকরিটি আসলে যার হওয়ার কথা ছিল, ঘটনাক্রমে সে মাধবীর একজন সহপাঠী বন্ধু ছিল। মাধবীকে সে অনুরোধ জানায় যে – সে যেন তার বান্ধবীর

কাছে ওর হয়ে চাকরির ব্যাপারে একটু বলে। জানা যায়, এই বন্ধু অসিত একদিন মাধবীর প্রণয়প্রার্থী ছিল। তবে আজ সে প্রেম নয়, মাধবীর কাছে শুধু বন্ধুত্বটুকু চেয়েছে। তবে সেটুকুও দিতে না পারার অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাধবী ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সে এতদিন ধরে যা চেয়েছিল তা-ই পেয়েছে। কাজেই বন্ধুর জন্য তার না ভাবলেও চলত। কিন্তু মাধবীর মত মেয়ে না ভেবে পারেনি। তার মানবিকতা বোধ আহত হয়েছে। শুধুমাত্র নিজে সুখে থাকবে বলে সে বন্ধুর সঙ্গে একরকম প্রতারণা-ই করেছে – বিবেকের এই দংশন তার হৃদয়-জগৎকে বার বার আলোড়িত করে। কাজেই মাধবীর মনে জেগে ওঠে – সে যখন সুখে ঘর-সংসার করবে তখন ঐ আত্মগ্লানি বারবার তাকে পীড়িত করতে থাকবে, যা থেকে বেরিয়ে আসবার কোন উপায় তার থাকবে না। কাজেই তার পক্ষে এমত পরিস্থিতিতে কোনভাবেই বিয়ে করা সম্ভব হবে না। অপরদিকে চাকরিতে যোগদান করবার পর স্বাভাবিক নিয়মেই নীলাম্বরের মানসিকতা পরিবর্তিত হয়। দেখা যায়, এই প্রথম তার সরস মন নিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে মাধবীকে বিয়ে করবার জন্য যখন বার বার তাগিদ দিতে থাকে তখন মাধবী জানিয়ে দেয় অসিতের একটা চাকরির ব্যবস্থা হলেই সে বিয়ে করবে। মাধবীর কাছ থেকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নীলাম্বরের এই প্রথম মনে হল –"চাকরিটা তার না হওয়াটাই ভালো ছিল।"[৩৫১] সুতরাং আমরা পাঠকেরা অনুমান করতে পারি মাধবীর সুপারিশে এই চাকরি পাওয়ার বিষয়টি আর এক ভাবে নীলাম্বরের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের সম্পর্ক কতখানি স্বাভাবিক থাকবে তাতে সংশয় থেকে যায়। বলা যায়, আর এক ভিন্ন স্রোত এসে ঐ সম্পর্ককে আর এক ভাবে প্রভাবিত করবে। পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির এমনই ওঠা-পড়া চলতে থাকে, আর তার প্রভাব প্রবাহমান সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়। মানব-মন আর সম্পর্কের এই রহস্য একটি 'চাকরি'কে কেন্দ্র করে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র আলোচ্য গল্পে যেভাবে উন্মোচিত করেছেন তা এক কথায় অনন্য সাধারণ।

গ) বৈধব্য জীবনে সম্পর্কের আবর্তমানতা

জীবনের আর একটি পর্ব হল বৈধব্য জীবন। প্রবাহমান দাম্পত্য জীবনের আকস্মিক ছেদের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় এই জীবনের চলমানতা। অর্থাৎ 'জীবন ধারার' আর এক গোত্রান্তর ঘটে। আর এই নবলব্ধ ধারার অন্তর্গত মানব-মনবী যখন 'জীবনের ধর্ম' পালনে বাধ্য থাকে তখন তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই বৈচিত্র্যের আগমন ঘটে, সেই

বৈচিত্র্যময় সম্পর্কেরই রূপ-প্রকৃতি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে কীভাবে ধরা পড়েছে তার আলোচনা ও বিশ্লেষণে আসা যাক।

আলোচনার পরিপেক্ষিতে বলতে হয়, হিন্দু ও মুসলমান -এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-নিষ্ঠা তথা সংস্কারগত দিক দিয়ে বিস্তর পার্থক্য বর্তমান। আমরা দেখি, মুসলমান সমাজে পুরুষ ও নারী উভয়েরই বহুবিবাহকে সমাজ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। অথচ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন হিন্দু বিধবা রমণীর জীবন নানা সংস্কারের জালে বাঁধা পড়ে। উনিশ শতকে (১৮৫৬ সাল) বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন হলেও আজও হিন্দু সমাজ তা মেনে নিতে পারেনি। এক্ষেত্রে বাহ্যিক, সামাজিক বিধি-নিষেধের কঠোরতার সঙ্গে ব্যক্তিমানুষটির অন্ত রাত্মার চাওয়া-পাওয়ার একটি দ্বন্দ্ব সংঘটিত হতে থাকে। ফলে জীবন ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। আলোচ্য অধ্যায়ে এই দ্বন্দ্ব-জটিলতাপূর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বিধবা রমণীর জীবনের প্রতিই মূলত আমরা আলোকপাত করব।

প্রকাশকালের ক্রমানুসারে এই পর্বের প্রথম গল্প হিসাবে **'মহাশ্বেতা'** গল্পটিকে বেছে নেওয়া হল। এটি 'অলকা' পত্রিকার ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ গল্পটির রচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল। গল্পে সেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ চিত্র না থাকলেও বিশ শতকের চল্লিশের দশকের সূচনা পর্বের সামাজিক পরিকাঠামোয় অবস্থানকারী শিক্ষিত বিধবা যুবতীর সামাজিক-মানসিক সংকটের রূপ-প্রকৃতি এখানে উঠে এসেছে।

এ গল্পের নায়িকা অমিতাই। কারণ তার-ই মনোলোকের গতি-প্রকৃতি 'চরমক্ষণে' এসে অবস্থান করবার মধ্য দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতি ঘটেছে। গল্প শুরু হয়েছে বৈধব্যের শুভ্রবাস পরিহিতা বিধবা অমিতার নিরাভরণ রূপ বর্ণনার মাধ্যমে। তার এই বিশেষ রিক্ত রূপ প্রেমিক-নায়ক চিন্মোহনের মনকে মুগ্ধ করে, জীবনে আনে নতুন মধুর প্রশান্তির স্বাদ। অর্থাৎ চিন্মোহনের প্রেমিক সত্তা অমিতার এই রূপকেই ভালোবাসে ও এই স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির উপাসনা করে মনে মনে। আর মনের এই বিশেষ অনুভূতি থেকেই সে তার প্রেমিকাকে নতুন নাম উপহার দেয়, তা হল – 'মহাশ্বেতা'। আলোচ্য গল্পে এই মহাশ্বেতা সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বকেই লেখক মুখ্য বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে আমরা দেখি প্রেমিকা মহাশ্বেতা ও স্ত্রী মহাশ্বেতার মানসিক টানাপোড়েনের জটিল রূপ।

শুভ্র বসন পরিধান করলেও প্রেমিকা অমিতাকে তথা মহাশ্বেতার মনোলোক প্রেমিক চিন্মোহনের মনের সংস্পর্শে রঙিন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বাহ্যিক আভরণের সঙ্গে তার অন্তরের রং

-এর একটি বিপরীত ধারা বর্তমান ছিল –"এই শুভ্র বেশবাসের সঙ্গে মনের মিল কই ? কত রাত্রে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে অমিতা, তবু অমূল্যের মুখ স্পষ্ট ক'রে মনে পড়েনি; সেখানে ভেসে উঠেছে চিন্মোহনের প্রতিমূর্তি।"[৩৫২] মনের এই ভাবাবেগ থেকেই মহাশ্বেতা চায় চিন্মোহন আরও বেশী অসহিষ্ণু, রূঢ় হয়ে উঠুক এবং তাকে এই বর্তমান জীবন থেকে উদ্ধার করুক। এক্ষেত্রে বলা যায় প্রেমিকা মহাশ্বেতা তার প্রেমিকের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে চায়। অপরদিকে চিন্মোহনও চায় অমিতা বেশবাস পরিবর্তন করুক। কিন্তু এই পরিবর্তনের মূলে অমিতাকে বিয়ে করবার ইঙ্গিতই নিহিত ছিল।

গল্পের দ্বিতীয় স্তরে অমিতা ও চিন্মোহনের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতার প্রেমিকা সত্তার রূপান্তর ঘটে। এই নবজীবনে নিজেকে সে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই স্বামীর নববধূরূপে নিজেকে সজ্জিত করবার উদ্দেশ্যে ননদের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে সে –"অমিতা ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। তাকে নিয়ে যা খুশি করুক ওরা। অস্বস্তি প্রথমটায় লাগলেও এ ধরণের আত্মসমর্পণে অদ্ভুত তৃপ্তিও যে একরকম পাওয়া যায় তা যেন বহুকাল পরে আবার নতুন করে অনুভব করল অমিতা।"[৩৫৩] অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচবছর সে একরকম বাহ্যিক নিয়ম-নিষ্ঠা ও ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত ছিল ঠিকই কিন্তু তাতে অন্তরের মিল ছিল না। তবে এই মিলনের বাসনা ছিল প্রবল। তা এই ক্ষণে পূর্ণ করবার তাগিদে সে নিজেকে সমর্পিত করেছে। এই শুভ ক্ষণে অন্তর ও বাহিরের রঙে মিলে-মিশে একাকার হয়ে ওঠা অস্তিত্বকে সে অনুভব করতে চেয়েছে এবং তা ভাবনার মধ্য দিয়েও আপ্লুত হয়েছে। তবে এই সামাজিক বন্ধনে চিন্মোহনের সত্তার কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। সে অমিতার মহাশ্বেতা রূপেই মুগ্ধ ও স্তব্ধ। এই রূপকেই সে মনের মণিকোঠায় স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কারণেই হয়তো তার নিজের ঘরে সে অমিতার 'মহাশ্বেতা' রূপকেই ফ্রেমবন্দী করে রেখেছে, যা তার মনের ফ্রেমেরই প্রতিরূপ। অর্থাৎ চিন্মোহন তার প্রেমিক সত্তাকে স্বামী সত্তায় রূপান্তর করতে অক্ষম হয়েছে। কাজেই প্রেমিকা 'মহাশ্বেতার' হঠাৎ এমন বর্ণময়ী হয়ে ওঠাকে সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে চমকে উঠে প্রতিক্রিয়া জানায় –"তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজালো কে ?.... না না না, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার! দশ বছর বয়স ক'মে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা বধূ।"[৩৫৪] এখানেই দুটি মানুষের মনের বিপরীত ধারা স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। তাই স্বামীর কাছ থেকে এমন অপ্রত্যাশিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে এই বিচিত্র বেশবাসের অন্তরালে অমিতার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধূ ধূ করে। লক্ষণীয়,

জীবনের পূর্বস্তরে শ্বেতবস্ত্রেরও অন্তরালে চিন্মোহনের উপস্থিতিতে অমিতার মন অনুরাগে রঞ্জিত ছিল। কিন্তু বিবাহের পর নানা অবস্থায় দাঁড়িয়ে সেই চিন্মোহনেরই উপস্থিতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ রঙিন বেশবাসের আড়ালে অমিতার মন মরুভূমির শূন্যতায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আসলে তার হৃদয়-ক্যানভাসের এমন বর্ণগত রূপান্তরই এখানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আর তা যে তাদের দ্বারা গড়ে তোলা সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে সে বিষয়ে আমরা পাঠকবর্গ নিশ্চিত।

'পুনর্ভবা' গল্পটি ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল অনুযায়ী গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্বের সামাজিক পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের একজন পুরুষচরিত্রকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বীকার হতে দেখা যায়। 'পুনর্ভব' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল পুনর্বার জাত বা পুনর্জন্ম গ্রহণ। আলোচ্য গল্পের নাম 'পুনর্ভবা' আসলে যে এক বিধবা নারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে লেখক এমন নামকরণ করেছেন তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। একজন নারীর অতীত ও বর্তমান জীবনে অবস্থানকারী দু 'জন পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিভিন্ন টানাপোড়েনের দিকটিই এখানে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

কাহিনীর একেবারে শেষে পাত্র-পাত্রীর যে কথোপকথন তাতেই নিহিত আছে এই গল্পের Climax। যেখানে দেখা যায় স্ত্রী তার বর্তমান স্বামীর কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে, আর তাতেই বর্তমান স্বামী অর্থাৎ শেখর স্ত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে –"তুমি কি ঠাট্টা করছ সুকৃতি?" প্রত্যুত্তরে সুকৃতি মাথা নেড়ে বলে –"না এতদিন সংস্কৃতি কেন্দ্র নিয়ে ভিতরে ভিতরে তুমিই ঠাট্টা করছিলে। কিন্তু এখন তো সেই ছদ্মবেশের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন তোমাকে তোমার নিজের বেশে দেখব, সত্যিকারের কাজের ভিতর দিয়ে পাব।"[৩৫৫] আসলে দু 'জন মানব-মানবী বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই স্তরে চরম সত্যের সম্মুখীন হয়। যার ফলস্বরূপ তাদের মধ্যেকার বহমান সম্পর্ক তার গোত্র পরিবর্তন করে নতুন ভাবে এখান থেকেই ভবিষ্যৎ পথযাত্রার সূচনা করে। কেন এবং কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবাহমান সম্পর্কের গতি পরিবর্তন হয় তা জানতে হলে আমাদের গল্পের কাহিনীতে প্রবেশ করতে হবে।

এই গল্পে কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র হিসাবে আমরা সুকৃতিকে পাই। তার জীবনের তিনটি স্তর আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে; যথা – প্রথম স্তরে দাম্পত্য জীবন, দ্বিতীয় স্তরে বৈধব্য জীবন এবং তৃতীয় স্তরে পুনরায় দাম্পত্য জীবন। মধ্যবর্তিনী সুকৃতির প্রথম জীবনে আছে স্বামী বিমলের সঙ্গে সম্পর্কের একটি রূপ। আর এই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের বিভিন্ন সম্পর্কের প্রভাব

তৃতীয় স্তরের জীবনকে আর এক ভাবে ত্বরান্বিত করেছে। এই তিনটি পর্ব একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে সুকৃতির সমগ্র জীবন পরিক্রমার কিছু অংশ পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তার জীবন সম্পৃক্ত নানা বৈচিত্র্যময় সম্পর্কের রূপরেখাও উদ্ভাসিত হয়েছে। এই রূপ বৈচিত্র্য অন্বেষণই আমাদের মূল লক্ষ।

প্রথমে আমরা সুকৃতির প্রথম 'দাম্পত্য জীবন' বলয়ে প্রবেশ করব। গল্পসূত্রে পাওয়া যায় বিমল ও সুকৃতি দু'জন দম্পতি। তাদের দাম্পত্য জীবনের সময়সীমা দু'বছর। এই সময়পর্বে দু'জন দম্পতির যে পরিচয় উঠে আসে তাতে দেখা যায়, বিমল ও সুকৃতি এই দুটি মানুষের মানসিক কাঠামো পরস্পরের বিপরীত আদলে গড়া। বিমল লঘু স্বভাবের পুরুষ। হাসি-ঠাট্টা, মিটিং-মিছিল, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় ও বিভিন্ন রকমের অ্যাডভেঞ্চার করা ছিল তার জীবনের প্রধান অঙ্গ। অপরদিকে সুকৃতি গম্ভীর প্রকৃতির – শিক্ষিত মার্জিত রুচি সমন্বিত একজন নারী। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র রুচিগত ও প্রকৃতিগত অমিলই ছিল না, চেহারার দিক থেকেও বিশেষ পার্থক্য ছিল। সুকৃতি অত্যন্ত সুন্দরী একজন রমণী। যদিও এই অমিল তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে কোনরকম প্রভাব ফেলে নি। বরং সুকৃতি যখন সারাদিন সম-মানসিকতা সম্পন্ন অধ্যাপক শ্বশুর মহাশয়ের সাহচর্যে থেকে রাতে স্বামীর সান্নিধ্যে আসত তখন সেই মুহূর্তে স্বাদ বৈচিত্র্যে ভিন্ন মাত্রা লাভ করত। বিমলের ক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে বৈচিত্র্যের রং মিশ্রিত ছিল। এছাড়া কাহিনী বিস্তারের মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্কের যে ঝলক আমরা পাই তাতেও একটা সহজ স্বাভাবিক ও মিষ্টি দাম্পত্য সম্পর্কের রেখা উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু বিমলের আকস্মিক মৃত্যুতে সমাজ স্বীকৃত এই দাম্পত্য জীবনের তথা সম্পর্কের ছেদ ঘটে। ফলে স্বামীকে ভালোভাবে জানা এবং আরও গভীরভাবে আপন করে পাওয়া সেই সঙ্গে জীবনের আরও অন্যান্য স্বাদ থেকে সুকৃতি বঞ্চিত থেকে যায়। অপূর্ণ থাকে তার 'মন'। স্বামীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার বৈধব্য জীবন ঘোষিত হয়। এক্ষেত্রে সুকৃতির জীবনের ধারা শুধুমাত্র বদলায় না, তার জীবন সম্পৃক্ত সম্পর্কের রূপও পরিবর্তন করে।

এই স্তরে এসে সামাজিক বিধি-নিষেধ, নানারকম নিয়ম-নিষ্ঠা সুকৃতির জীবনের সঙ্গে যত যুক্ত হল এর সমান্তরালে তার মনের শূন্যতা তত বৃদ্ধি পেতে থাকল। এবং সুকৃতি আরও একটি বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হল; এতদিন বিমল ছিল বলেই শ্বশুর হৃষীকেশের অস্তিত্বের পক্ষভূমি তথা তার সাহচর্যের প্রয়োজন ছিল কিন্তু স্বামীকে হারানোর পর হৃষীকেশের থাকাও সুকৃতির কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে ওঠে। এমত অবস্থায় সুকৃতির জীবনে দ্বিতীয় পুরুষ তথা

বিমলের বন্ধু শেখরের অনুপ্রবেশ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। মৃত বন্ধুর প্রতি শেখরের আনুগত্য, সহৃদয়তা ও বিশেষ সহানুভূতির দিকটিই প্রাথমিক পর্যায়ে সুকৃতিকে শেখরের কাছে আনে। আমরা এর আগেও উল্লেখ করেছি, দাম্পত্য জীবনের এই স্বল্প সময়ে স্ত্রী সুকৃতির বহু স্বাদ অতৃপ্ত থেকে যায়। কাজেই 'বিমল সংস্কৃতি কেন্দ্রের' কর্মশালায় নানা কর্ম উদ্যোগের ফাঁকে ফাঁকে শেখরের কাছ থেকে বিমল সম্পর্কে আরও নানা তথ্য সুকৃতি লাভ করতে থাকে। ফলে সে স্বামীকে আরও নতুনভাবে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তার মনে হয় বিমলের মা-বাবাও বিমলকে এমনভাবে তার কাছে জীবন্ত করে তুলতে পারেনি, যা বন্ধু শেখর পেরেছে। শেখরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিমল যখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রাণসত্তাকে স্পর্শ করবার স্বাদ জাগে সুকৃতির মনে। অর্থাৎ সেই সত্তার শারীরিক উপস্থিতি স্ত্রী সুকৃতি কামনা করে মনে মনে। স্ব-শরীরে পুনরায় স্বামীকে পেতে চায় স্ত্রী। কিন্তু তা যখন সম্ভব হয়ে ওঠে না তখন সেই প্রাণসত্তার প্রতিরূপ জীবন্ত মানুষটি অর্থাৎ শেখরের মধ্যে সঞ্চারিত করে সুকৃতি মনে মনে দেখতে চায়। স্বামীর স্মৃতিকে সম্বল করে নতুন করে বেঁচে থাকবার পথ সে খুঁজে পায়। তাই শেখরের সান্নিধ্য লাভ তার জীবনের একান্ত কাম্য বলে মনে হয় এবং সময়ের বয়ে চলার সঙ্গে ধীরে ধীরে একটা পর্যায়ে এসে স্বামীর সত্তা ও শেখরের সত্তা সুকৃতির কাছে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। তখন শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ ও সত্তার রূপ দর্শন নয়, তাকে আরও একান্তভাবে সংসারের চার দেওয়ালে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে। কিন্তু তাতে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সমাজ। বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়ন অনেক আগে হলেও তখনও সংস্কারাচ্ছন্ন এই হিন্দু সমাজ তা মুক্ত মনে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়। তাই আমরা দেখি যে, শেখর সুকৃতিকে বিবাহ করবার প্রস্তাব যখন পেশ করে তখন শুধুমাত্র বিমলের মা নয়, তার অধ্যাপক শ্বশুর পিতাও 'চমকে' ওঠে। কেবলমাত্র তাই নয়, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা বিষয়টিকে বিশেষ চর্চার বস্তু হিসাবে বেছে নেয়। সুকৃতির বাবা এসে বিমলের বাবাকে জানায় –"...আমার বিধবা মেয়ের ফের বিয়ে না দিয়ে যদি ওর আইবুড়ো বোনগুলির একটা ব্যবস্থা করতেন আমার অনেক উপকার হত।"[৩৫৬] অপরদিকে শেখরের মা ঘোর আপত্তি জানায়। অর্থাৎ মানবিক চাওয়া-পাওয়া বনাম সামাজিক ন্যায়বোধের একটা দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। যাই হোক, আমরা শেষপর্যন্ত দেখি যে, নানা বাধা বিপত্তিকে জয় করে সুকৃতি ও শেখর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল সুকৃতির এই অতীত জীবন ও সম্পর্ক কী তাদের নবদাম্পত্য জীবনকে প্রভাবিত করবে ?

এবার আমরা এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করব। এখানে এসে

আমরা লক্ষ করি, শেখরকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার জন্য সুকৃতির মনে যে বাসনা জন্মেছিল বা বলা যায় যে আবেগ ও উদ্দীপনা কাজ করছিল তা এই নতুন সম্পর্ক অর্থাৎ নতুন বিবাহ সম্পর্ক গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে তা যেন পরে আর সে খুঁজে পেল না। অর্থাৎ প্রথম স্বামী বিমলের সংসারে এসে যে অনুভূতি সুকৃতির মনে জাগ্রত হয়েছিল ঠিক সেই রূপ-রং-সুর যেন এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অপরদিকে শেখরের এটি প্রথম বিবাহ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেক নারী পুরুষের মনে বিবাহ ও বিবাহ পরবর্তী ফুলশয্যার রাত সম্পর্কে একটা পৃথক উত্তেজনা কাজ করে। শেখরের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সে যখন উপলব্ধি করে তার নববিবাহিত স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর স্মৃতিচারণায় মগ্ন তখন স্বাভাবিকভাবেই স্বামী হিসাবে শেখরের আত্মসম্মান আহত হয়। যার প্রভাব পড়ে তাদের নবগঠিত সম্পর্কে। শেখর চায় সুকৃতি তার সমস্ত স্মৃতিরেখা নিশ্চিহ্ন করে তাদের সম্পর্ককে উজ্জীবিত করুক। তার জন্য নানারকম ব্যবস্থাও করে। তবে সুকৃতিও স্বামীর মনোভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, সে শেখরের কাছ থেকেই জানতে পারে বিমলের প্রতি ভালোবাসা, সহৃদয়তা, আনুগত্য এগুলি আসলে সুকৃতির কাছে পৌঁছোনোর মাধ্যম মাত্র। এগুলিতে মনের কোন আন্তরিকতা ছিল না। প্রধান লক্ষ ছিল সুকৃতিকে লাভ করা। তাই শেখর খুব সহজেই বিয়ের পর বিমলকে 'প্রেত' বলে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। এই চরম সত্য যে সুকৃতিকে স্তব্ধ করে দেবে তা খুব স্বাভাবিক। অর্থাৎ শেখরের সম্বন্ধে সুকৃতির মনে যে ধারণা জন্মেছিল এবং তার উপর ভিত্তি করেই তাদের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা এই পর্যায়ে এসে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়। এই মনোভাব থেকেই গল্পের শেষে সুকৃতি ও শেখরের কথোপকথন উঠে আসে। আর এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, তাদের বহমান সম্পর্ক এই স্তরে এসে গোত্রান্তরিত হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের পথে এগিয়ে যাবে। আর তার সম্ভাব্য ফলাফল পাঠকবর্গের মনে সংশয় জাগাবে।

নারীর বৈধব্য জীবনেও যে নানা সম্পর্ক তৈরী হয় এবং জীবন জটিলতায় পর্যবসিত হয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় **'যবনিকা'** নামক গল্পে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'দোল' সংখ্যায় 'সংশয়' নামে এ গল্পের প্রথম প্রকাশ। পূর্বে আলোচিত গল্পে আমরা দেখেছি মহাশ্বেতা অর্থাৎ অমিতার মানসিক ক্রমবিবর্তনের দিকটিই গল্পের কাহিনীর গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আলোচ্য গল্পে বিভিন্ন ঘটনা মূলত তিনটি চরিত্রের মননকে পরিচালনা করেছে, আর তার মধ্য দিয়েই কাহিনী অগ্রগতি লাভ করেছে।

'যবনিকা' গল্পটি গল্প বলার ঢঙে পরিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে একজন কথক চরিত্র বর্তমান। তারই মাধ্যমে আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রিয় বিধবা নারীর জীবন নাটকের পর্দা উন্মোচিত হয়েছে। বিংশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের সমাজ ব্যবস্থায় অবস্থানকারী বিধবা রমণীগণের বিবিধ জীবনের সংকটকে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর কয়েকটি গল্পে তুলে ধরেছেন। সেখানে দেখা যায়, বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহ কিংবা বৈধব্য পরবর্তী পর্বে স্থাপিত সম্পর্কে এসেছে নানান জটিলতা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সেই সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা-বিবাহ যুবক সম্প্রদায়ের কাছে একটি প্যাশন ছিল। তবে এই বিবাহের ফলাফল যে শুভ নয় বা বলতে হয় এই নব স্থাপিত সম্পর্ক যে প্রবলভাবে সংক্রমিত হয়ে ওঠে – তারই প্রসঙ্গে লেখকের জীবনবোধ সম্পৃক্ত হয়ে গল্পগুলি পরিবেশিত হয়েছে। 'যবনিকা' গল্প তারই একটি উদাহরণ।

এ গল্পের কাহিনী বিস্তৃতি লাভ করেছে একটি নারীর প্রথম বৈধব্য জীবন অতিক্রম করে দ্বিতীয় বৈধব্য জীবনে পদার্পণের মধ্য দিয়ে। এখানে মূলত তিনটি চরিত্র গল্পের প্রধান স্তম্ভ। যথা বিধবা রমণী অনীতা সেন, তার পুত্র সন্তান খোকন ও যুবক ডাক্তার। অনীতার শাশুড়ি হিসাবে একটি চরিত্রের অবতারণা করা হলেও আসলে এ চরিত্রটি সমাজের বিবেক চরিত্র। কাহিনীসূত্রে পাওয়া যায় – অনীতার যখন সতেরো বছর বয়স তখন বছর খানেকের পুত্র সন্তান রেখে তার স্বামী মারা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাদা থান পরিধান করে পতিব্রতা স্ত্রী হিসাবে মৃত স্বামীর স্মরণে নানারকম নিয়ম নিষ্ঠা পালন করলেও এই বয়সে অনীতার কাছে জীবনের দাবী সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। যাকে অস্বীকার করবার শক্তি ও ইচ্ছা কোনটাই তার থাকে না। এক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় অভ্যস্ত শরীর মনস্তত্ত্বের একটি সূক্ষ্ম দিককে তুলে ধরা যেতে পারে – পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলতা যুগ যুগ ধরে নারীর রক্তে মিশ্রিত। শারীরিক সম্ভোগ, মানসিক আশ্রয় ও অর্থনৈতিক সাহায্য – পুরুষের কাছে নারীর এই তিনটি হল প্রধান চাহিদা। যার বশবর্তী হয়ে নারী পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সাহচর্য চায়। আলোচ্য গল্পে বিধবা অনীতার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে সে শরীরের আকাঙ্ক্ষা পূরণে যুবক ডাক্তারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরবর্তী সময়ে তার শাশুড়ির মৃত্যু তাকে আর্থিক ও মানসিকভাবে অসহায় করে তোলে। আর এই সমস্যার সমাধান করলেও পরবর্তী পর্বে অনীতার মনে আর একটি নতুন দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় তা হল – স্ত্রীসত্তা বনাম মাতৃসত্তার সংঘাত। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে তার হৃদয় আহত। দুটি সম্পর্কই তার জীবনে সমান গুরুত্ব রাখে, অথচ দুটি সত্তার সংযোগ স্থাপনে সে ব্যর্থ। এই অক্ষমতাই তার জীবনকে জটিল থেকে জটিলতর পাঁকে নিমজ্জিত করে।

অপরদিকে পিতৃহীন খোকন ছেলেবেলা থেকে শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা মায়ের নিরাভরণ রূপ দেখতেই অভ্যস্ত। এই রিক্ত রূপেই সে 'মা' নামক সত্তাকে চিনেছে। এবং সে আরও দেখে আসছে তার মা প্রতিদিন ধূপ জ্বালিয়ে বাবার ফটোতে পূজা করে। কিন্তু মায়ের জীবনে ডাক্তারের আগমন তার এই গতানুগতিক ধারণা ভাঙন ঘটায়। তা খুব সহজে গ্রহণ করা এই ছোট্ট খোকনের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাছাড়া মায়ের প্রতি তার একক অধিকারও ক্রমশ ক্ষুন্ন হতে থাকে। এই উপলব্ধি তার আচার-আচরণকে পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। কাহিনী সূত্রে আমরা দেখতে পাই, ধীরে ধীরে ডাক্তার খোকনের জীবনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বাবা ও ঠাকুমাকে হারানোর পর মাকে একান্তভাবে পাওয়ার করুণ আর্তি এই শিশু চরিত্রটির মধ্যে লক্ষ করা যায়। এই মানসিকতাই উক্ত চরিত্রের মননকে পরিচালিত করেছে। অধিকার বোধ ও অস্তিত্বের সংকটেই সে উদ্‌ভ্রান্ত।

যুবক ডাক্তার অনীতার প্রতি কামনা-বাসনা ও খানিকটা সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। সে স্ত্রী অনীতাকে গ্রহণ করলেও মা অনীতাকে গ্রহণ করতে পারেনি বা বলা যায় চায়ও নি। কাজেই খোকনের সঙ্গে তার প্রথম থেকেই একটা সংঘাতের সম্পর্ক বর্তমান ছিল। স্ত্রীকে একান্তভাবে লাভ করবার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল খোকন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, অনীতার জীবনে এটি দ্বিতীয় বিবাহ হলেও যুবক ডাক্তারের এ প্রথম বিবাহ। আর এই প্রথম দাম্পত্য জীবন ও নববধূ সম্পর্কে স্বামীর মনে এক বিশেষ উত্তেজনা থাকাটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অনুভূতির স্ফূরণ বার বার ব্যাহত হয়েছে অনীতার প্রথম পক্ষের সন্তানের জন্য। ফলে তার অস্তিত্ব ডাক্তারের কাছে ক্রমশ অসহণীয় হয়ে ওঠে। এই জায়গা থেকেই উভয়ের মধ্যে অসম লড়াই -এর অধ্যায় রচিত হয়। এর ক্রম-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও তার স্বাভাবিক মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলতে থাকে। তারই চরম প্রতিক্রিয়ায় সে ভুল চিকিৎসার মাধ্যমে খোকনের মৃত্যু ঘটায়। আর এই মৃত্যুই তার সম্বিৎ ফেরাতে সাহায্য করে। সে উপলব্ধি করে – এই ঘটনায় তার আপাত জয় ঘোষিত হলেও এ আসলে তারই করুণ পরাজয়। কেননা, সে, স্ত্রী অনীতাকে কোনদিন সম্পূর্ণরূপে পায় নি, আর বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ কখনোই সম্ভব নয় – এই আত্মগ্লানি-ই তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। আর এরই মাধ্যমে অনীতার দ্বিতীয় বৈধব্য জীবন সূচিত হয়। লক্ষণীয়, একসময় খোকনের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে অনীতার সম্পর্কের শুভারম্ভ হয়েছিল। আবার সেই চিকিৎসাই তাদের মানসিক দূরত্বকে ত্বরান্বিত করে, সম্পর্ককে তিক্ততায় পর্যবসিত করে। জীবনের এই বার বার ছন্দপতনে অনীতা স্তব্ধ। মনের অনুভূতির উত্তোলনে সে আজ যবনিকা টেনেছে। তার মনের

ক্যানভাসে মরুভূমির রিক্ততায় পরিপূর্ণ।

অনীতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মূলে ছিল ডাক্তারের শুধুমাত্র শারীরিক চাহিদা পূরণ। কিন্তু আলোচ্য গল্পের কথক ঠিক কোন্ মানসিকতা নিয়ে অনীতার প্রতি অগ্রসর হয়েছিল তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে আমরা যদি ধরে নিই সে মানবিক অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিয়েছিল তাহলে এই প্রথম পুরুষ যে বিধবা অনীতার মনকে উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু এই বিধবা নারীর জীবনে চিরপতিত যবনিকাকে পক্ষান্তরে তাকেই সম্মান জানিয়ে তার জীবন থেকে কথক নীরবে প্রস্থান করেছে। তথাপি আমরা জানি গতিশীল জীবন-নাটকের যবনিকা পতন একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

'পুনর্ভবা' গল্পের পাঁচবছর পর রচিত হয় **'ক্ষতিপূরণ'** গল্পটি। ১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'বসুমতী' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। গল্পের পটভূমিতে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা উত্তর কলকাতা শহরের সামাজিক পরিস্থিতি। যেখানে দেখা যায়, নারী তার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বহু পূর্ব হতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। অর্থাৎ নারী অন্দরমহলের গণ্ডি অতিক্রম করে বহির্জগতে অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছে বা বলা যায় তাকে আদায় করে নিতে হয়েছে। এরকমই পরিবেশে অবস্থানকারী একজন বিধবা রমণীর জীবন পরিক্রমা আলোচ্য গল্পে স্থান পেয়েছে।

'ক্ষতিপূরণ' গল্পে 'গল্পের ভিতর গল্প বলবার' বিশেষ রীতিকে আমরা পেয়ে থাকি। এ গল্পের নায়িকা বিধবা নারী মীনাক্ষী। নায়িকার বর্তমান ও অতীত জীবন সেইসঙ্গে তার চরিত্র-প্রকৃতিকে পরিস্ফুটিত করতে লেখক আর একটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সে মীনাক্ষীর বান্ধবী শ্রীলতা। লক্ষণীয় বিষয়, তাকে এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্গত সংস্কারাচ্ছন্ন কুলবধূ হিসাবে অঙ্কন করা হয়েছে। আসলে সে একজন তৎকালীন সমাজ-ভাবনারই উপস্থাপক চরিত্র। তার-ই বর্ণনা সূত্রে পাওয়া যায় মাত্র পনের বছর বয়সে মীনাক্ষীর বিয়ে হয়েছিল। এবং সেই বৈবাহিক জীবনের মেয়াদ ছিল কেবলমাত্র তিন বছর। পরপর দুবছরে দুটি সন্তানকে মীনাক্ষী উপহার পেলেও পূর্ণ যৌবনবতী এই নারীটি দাম্পত্য জীবনের ঐ স্বল্প সময়ে জীবনের নানাবিধ স্বাদ থেকে যে বঞ্চিত থেকেছে তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই এই অতৃপ্তির জায়গা থেকেই সে হয়তো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার তাগিদ অনুভব করে। তাই আমরা জানতে পারি মীনাক্ষী এরপর নিজ চেষ্টায় ম্যাট্রিক ও আই.এ. পাশ করে। উপরন্তু পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দানের

লক্ষে সে টাইপ ও সর্টহ্যান্ড শিখে চাকরি নেয় কোম্পানীর অফিসে। এক্ষেত্রে বলা যায়, সে হয়তো এরই মধ্য দিয়ে বহির্জগতে পদার্পণ করে নিজের অস্তিত্বকে সকলের কাছে উপস্থাপিত করতে চেয়েছে। যার পিছনে হয়তো ছিল তার মনের ইচ্ছাপূরণের সুপ্ত বাসনা। এই জীবনে তার যা ক্ষতি হয়েছে তার কিছুটা পূর্ণ করবার আশা। তাতে যে কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে তাকে অসম্মানিত হতে হয়েছে তা কাহিনী সূত্রে আমরা জ্ঞাত হই। তথাপি সে কিন্তু চাকরি ছাড়েনি। এক্ষেত্রে বলা যায়, গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কলমে সৃষ্ট বিধবা রমণীদের মধ্যে মীনাক্ষী ব্যতিক্রম। সে অনেক বেশী স্বাধীনচেতা। সমাজভাবনার সঙ্গে নিজ সত্তার চাহিদাকে সে আপোশ করেনি। কাজেই মনের বাসনাকে প্রশ্রয় দিয়েই সে শ্রীলতার পেয়িং-গেষ্ট প্রদোষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তাতে শুধুমাত্র 'মন' নয়, এর আড়ালে ছিল শারীরিক চাহিদার তীব্র আকর্ষণ। তাই মীনাক্ষী নিঃসংকোচে শ্রীলতার বাড়িতে রাতে থাকতে পেরেছিল এবং গভীর রাতে শ্রীলতার পাশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। অপরদিকে প্রদোষ রূপে যে চরিত্রটিকে পাওয়া যায়, সে আসলে একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিলাসিতাপূর্ণ, অসামাজিক পুরুষ। সেও কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে মীনাক্ষীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং হঠাৎ করে খুব বেশী সামাজিক হয়ে ওঠে। তার এই চারিত্রিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় এইভাবে – ঘটনাস্রোতে যখন শ্রীলতার সহায়তায় প্রদোষ ও মীনাক্ষীর সম্পর্কে প্রদোষের বাবা-মা মধ্যস্থতা করে তখন দেখা যায় প্রদোষ খুব সহজেই সে সম্পর্ক পরিত্যাগ করে চলে যায়। এবং পরবর্তী সময়ে একজন বিত্তশালী ডাক্তারের কন্যাকে সে বিবাহ করে। অর্থাৎ প্রদোষ ও মীনাক্ষীর সম্পর্কে অন্ততপক্ষে প্রদোষের দিক থেকে হৃদয়ানুভূতির কোন জায়গা ছিল না।

আলোচ্য গল্পে সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বোধে পুষ্ট তথা সামাজিক বিবেক চরিত্র হিসাবে শ্রীলতা অঙ্কিত হলেও তারও মানবিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সে উপলব্ধি করে তারই কারণে মীনাক্ষীর জীবনের আর একটি করুণ অধ্যায় রচিত হয়েছে। বন্ধুর প্রতি এই সহানুভূতি মানবতারই প্রতিচ্ছবি। এ মানুষ শ্রীলতারই আত্মানুশোচনা। আর এই বোধ থেকেই সে মীনাক্ষীর জীবনের ক্ষতিপূরণ করবার সংকল্প নেয়। এই উদ্দেশ্যেই সে তার পরবর্তী পেয়িং-গেষ্ট অমলেন্দুর সম্মুখে মীনাক্ষীর জীবনরূপ উপস্থাপিত করে। শুধুমাত্র শারীরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে জীবনপথ পাড়ি দেওয়া যায় না, তাতে জীবন প্রাণহীন ও যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। মানব রস তথা হৃদয়ানুভূতিই জীবনের প্রধান চালিকা শক্তি। আত্মার সঙ্গে আত্মার প্রেমানুভূতির বন্ধনই প্রধান। যা অটুট ও স্থায়ী। জীবনের এই মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিতেই লেখক দ্বিতীয় পুরুষ

চরিত্র হিসাবে ভিন্ন আদলে গড়া অমলেন্দুর অবতারণা করেন। তাই আমরা দেখতে পাই মীনাক্ষী সম্পর্কে সমস্ত সত্য উপলব্ধি করেও অমলেন্দু তার প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। যা মীনাক্ষীর জীবনের এক শুভারম্ভেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ) অন্যান্য সম্পর্কের রূপরেখা

জন্মের পর থেকেই মানব-জীবন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। এই বিস্তৃত সময়পর্বে বিভিন্ন সম্পর্ক মানব-জীবনকে আবিষ্ট করে বয়ে চলে। এর মধ্যে কিছু সম্পর্ক মানুষ জন্মসূত্রেই লাভ করে, যা আত্মীয়-পরিজন ও পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এগুলি সামাজিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত সম্পর্ক। এগুলির সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও বিবর্তন সীমিত, এর বাইরে যে সম্পর্কগুলি জীবনের নানা পর্বে এসে ভিড় করে তার রূপ-বৈচিত্র্য ব্যাপক। তার এক একটির স্বাদ এক এক রকমের। আবার একই সম্পর্ক ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন স্বাদ বয়ে আনে। জীবন নিঃসৃত এই সম্পর্ক গুলিতেও নানা তরঙ্গ উত্থিত হয়। এবং এই তরঙ্গগুলি একটা সময় একটি স্তরে এসে বিলীনও হয়ে যায়। আবার হয়তো যেখানে এসে বিলীন হয় সেখান থেকে ভিন্ন আর এক তরঙ্গ সৃষ্টি হতে থাকে। অর্থাৎ একই সম্পর্কের নানা স্তর বর্তমান থাকে। নতুন নতুন বিভিন্ন সম্পর্কের অনুভূতি কখনো প্রকাশ্যে আসে, কখনো বা দুটি হৃদয়ের অন্তরালেই লালিত হতে থাকে। এগুলি এক একভাবে জীবনকে দীক্ষিত করে চলে, নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করে। এই সম্পর্কগুলি যে শুধুমাত্র স্নিগ্ধ, মধুর, লাবণ্যময় তা নয়, সর্পিল, জটিল, কুটিল বিভিন্ন রূপের সমষ্টি-ই সেখানে পরিলক্ষিত হয়। কখনো তাতে থাকে অতৃপ্ত লালসা, আসক্তি, বিকৃত মানসিকতার ছাপ কখনো বা হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ। কাজেই বলা যায় – এই বিভিন্ন রূপের অবৈধ সম্পর্কের মোড়কেই প্রত্যেকটি মানুষের জীবন আবৃত থাকে। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু হয়তো জীবনে স্বীকৃতি পায়। তবে বাকী যেগুলি থাকে সেগুলিও বিচিত্র রসের সন্ধান দেয়, যার অস্তিত্বে জীবন ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। এই সম্পর্কগুলিকে সেভাবে দাম্পত্য কিংবা বিবাহপূর্ববর্তী সম্পর্ক ধারার মত শ্রেণীকরণ করা না গেলেও সমাজ সংসারে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে এগুলি, যা আমাদের বিস্মিত করে, ভাবায়। এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার কোন উপায় থাকে না। সেরকম সম্পর্ক লেখকের যে গল্পগুলিতে উঠে এসেছে তার কয়েকটিকে বেছে নিয়ে আলোচনা করা হল – 'অপরাহ্ন' ও 'আগামীকাল'-এই দুটি গল্পের রচনাকালের পার্থক্য থাকলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে প্রায় একই রকমের হওয়ায় এই দুটি গল্পকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমে **'অপরাহ্ন'** (১৩৬২) গল্পটিতে আসা যাক। এই গল্পে কাহিনীর তুলনায় চরিত্রগুলির ভাবনা তথা মানসিকতার বিবর্তন-ই প্রাধান্য লাভ করেছে, যার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন একধরণের সম্পর্কের রূপরেখা উন্মোচিত হয়েছে। দেহ ও মন একে অপরের পরিপূরক। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈহিক-মানসিক চাহিদার ধরণগুলিরও রূপান্তর ঘটে থাকে, আর তার উপর যে মানবিক সম্পর্কের বাঁধন নির্ভর করবে তাই স্বাভাবিক। এখানে স্কুলের সেক্রেটারী হিসাবে এক প্রৌঢ় ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার স্কুলে জয়ন্তী বোস নামে এক তরুণী কর্মরত। প্রথম বয়সে এই তরুণী কোন তরুণ বন্ধুর দ্বারা আঘাত পেয়েছিল কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট করে না বলা থাকলেও প্রেম-ভালোবাসার প্রতি জয়ন্তীর বিরূপতার মূলে তা একটি কারণ হতে পারে বলে ঐ প্রৌঢ় সেক্রেটারী শৈলেশ্বর দাশগুপ্তের বন্ধু উমাপদবাবু ধারণা করেছেন। কাহিনীতে দেখা যায়, শৈলেশ্বরবাবুর নির্দেশিত পথে এবং তার সহযোগিতায় জয়ন্তী নিজেকে পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। বেশ কয়েকটি ডিগ্রীর অধিকারী হয়। সেই সূত্র ধরে শৈলেশ্বর বাবুর ও জয়ন্তীর মধ্যে একটি সম্পর্কের বাতাবরণ তৈরী হবে তা সহজেই অনুমেয়। আর সেই সম্পর্ককে বোধ হয় তারা নিজের ভাবনা বা অনুভূতি অনুযায়ী গ্রহণ করেছিল। তবে একটা সময় দেখা যায়, জয়ন্তী অনেকগুলি ডিগ্রী নিয়ে স্কুলে ফিরে এসে শৈলেশ্বরবাবুর মতামতকে আর মানতে পারে না। ফলে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য চরমে পৌঁছোলে জয়ন্তী স্কুল ছেড়ে বিদেশে চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে বিয়ে করে। এবং বেশ কয়েকবছর বাদে তার বিরূপ আচরণের জন্য একপ্রকার ক্ষমা চেয়েই জয়ন্তী শৈলেশ্বর বাবুর কাছে চিঠি লেখে। এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি হয়।

কাহিনীতে শৈলেশ্বরবাবুর বন্ধু উমাপদবাবুর একটি মতাদর্শ এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ –"দেহের টান তো সোজা টান নয়। বয়সে যত ভাঁটা পড়ে ওতে যেন তত উজান বয়। দ্বিগুণ জ্বলে নেববার আগে। ..... এই বয়সে দেহের বিনিময়ে আমরা দেহ পাইনে। তাই অর্থ, যশ, আধিপত্যের বিনিময়ে আমরা তা দখল করি। ভাবি সব পেলাম। কিন্তু যা পাই তাতে নিজেরও মন ভরে না, যা দিই তাতে আর একজনেরও দেহের সুখ অতৃপ্ত থাকে। তবু এই অসম আর বিষম দেনা-পাওনার বিরাম নেই। .....দেহ তো শুধু দেহের মধ্যেই নেই। যে সে মনের মধ্যেও ঢুকেছে। মনও তোমার সূক্ষ্ম শরীর। আমাদের বয়সে মনই একমাত্র শরীর। .....এই মধ্য বয়সে মধ্যস্থ হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার আশা রেখ না শৈলেশ।"[৩৫৭] অর্থাৎ তার মতাদর্শে খানিকটা সত্যতা থাকলেও দেহের ও মনের কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে না পারবার ব্যর্থতাকে নীরবে মেনে নেওয়ার একটা দিক উমাপদবাবুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, যা

শৈলেশ্বরবাবু মেনে নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে বলা যায় – দেহের বসন্ত ক্ষণস্থায়ী হলেও মনের গতানুগতিক দাম্পত্য জীবনে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন। এমত পরিস্থিতিতে একজন তরুণী মেয়ের সান্নিধ্য তার মনের কোণে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জয়ন্তীর প্রতি তার এক কামনা-বাসনাপূর্ণ ভালোবাসার জন্ম হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার আকর্ষণ ক্রমশ তীব্র হতে থাকে। আর এই জায়গা থেকেই হয়তো জয়ন্তীর প্রতি তার আধিপত্য তথা অধিকারবোধও প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি মনে করেন তার মত ঐ একই প্রেমানুভূতি জয়ন্তীর মনেও ক্রিয়া করে। তবে তার ধারণা ভুলই ছিল। কেননা, কোন কারণে জয়ন্তীর হয়তো যৌবনের প্রতি, প্রেমের প্রতি বিরাগ থাকায় প্রেমের শূন্যস্থানকে শ্রদ্ধা, সম্মান দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে সে চেয়েছিল। তাই হয়তো কর্মের প্রতি, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি তার এত বেশি মনোযোগ। তবে শেষ পর্যন্ত সেও পরাজিত হয়। জীবনের দাবী, যৌবনের দাবী তাকে মেনে নিতেই হয়। সে বিয়ে করে। অন্যদিকে শৈলেশ্বরবাবু কখনোই মেনে নিতে পারেন না যে তার প্রতি জয়ন্তীর কোন অনুরাগ নেই। এই কারণেই তিনি জয়ন্তীর চিঠির ব্যাখ্যা হয়তো নিজের মনের চাওয়া-পাওয়া অনুযায়ী করে। শুধু তাই নয়, এই সম্পর্কটি শৈলেশ্বরবাবুর মনের কারখানায় এতখানি আলোড়ন তুলেছে যে তা তিনি বন্ধুর কাছেও স্বীকার করেছেন।

এই যে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে একটি যুবতী নারীর যে সম্পর্ক তার নির্দিষ্ট কোন নাম না থাকলেও তা এক এক ভাবে দু'জনের মনে দাগ কাটে। উমাপদবাবুর ব্যাখ্যায় উঠে আসে শৈলেশ্বর স্নেহ-প্রীতি-কামনা-বাসনাপূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে জয়ন্তীর মনকে সংসারের দিকে টেনে এনেছেন। অর্থাৎ জয়ন্তী জীবনের আর একটি পর্বে পদার্পন করেছিল ঠিকই তবে তার ফেলে আসা জীবনের এই নামহীন সম্পর্ক জয়ন্তীর জীবনকে এক বিশেষ মাত্রা দান করেছে, যে সম্পর্ক তাকে জীবনের আর এক চরম সত্যকে (যৌবনের দাবী) উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। তাই এতদিন বাদেও সেই সম্পর্কের টানাপোড়েনে শৈলেশ্বরবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শ্রদ্ধায় ও সম্মানে সে চিঠি লেখে। অপরদিকে শৈলেশ্বরবাবু হয়তো জয়ন্তীকে দেহ দিয়ে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু তার মন দিয়ে তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন, তার সেই মন-ই একটি সম্পর্কের জন্মদাতা ও প্রতিপালক, যা তিনি আজও সমানভাবে করে চলেছেন। কাজেই এই মধ্যবয়স্ক মানুষটির জীবনে এই সম্পর্ক আর এক ভিন্ন স্বাদ ও ভিন্ন রসের সন্ধান দিয়েছে। তা তিনি অস্বীকার করতে চাননি। এরকমই সম্পর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কলমে ধরা পড়েছে।

এবার যদি আমরা **'আগামীকাল'** (১৩৬৬) গল্পটির দিকে ফিরি তবে সেখানেও প্রায়

ঐ একই চিত্র দেখতে পাব – একজন মধ্যবয়স্ক শৌখিন স্বভাবের সুদর্শন পুরুষ প্রিয়রঞ্জনবাবুর তুলনায় তার স্ত্রী শ্রীলতাদেবী মধ্যবিত্ত ছাপোষা সংসারের যাঁতাকলে আবদ্ধ হয়ে জরাকে যেন অনেক আগেই দেহ ও মনে আমন্ত্রণ করে বসেন। পরিস্থিতি, সময়, চারিত্রিক প্রকৃতি এই দুটি মানুষের মধ্যে মিলের তুলনায় অমিল বয়ে আনে অনেক বেশি। তা প্রিয়রঞ্জনবাবুও উপলব্ধি করতে পারেন। তাই তার মনে হয় – তিনি যখন তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসেন তখন তার স্ত্রী সংসারের কাজে 'নাকানি-চোবানি' খান, আবার স্ত্রী যখন ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় সাঁতার কাটেন স্বামী তখন ভাঙা জাহাজেই চড়ে অতলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। ফলে গতানুগতিক দাম্পত্য জীবনে তার কাছে স্ত্রী সন্তানেরা আসবাবের মত হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র দায়িত্ব-কর্তব্যের জায়গা থেকেই তিনি সংসারের জন্য উপার্জন ও ব্যয় করেন। এমত পরিস্থিতিতে একজন যুবতী নারীর সান্নিধ্য তার বৈচিত্র্যহীন জীবনে নতুনত্বের স্বাদ আনে। তাকে কেন্দ্র করেই তার মনের আসক্তি-কামনা-বাসনাগুলি আবর্তিত হতে থাকে। নতুন উদ্দীপনায় তিনি সঞ্জীবিত হন। এই যুবতীর সঙ্গে তার সম্পর্ক-স্থাপনের সময় কাল তিন বছর। চিঠিপত্র ও মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে সেই সম্পর্ক তিনি আপন মনে লালিত করতে থাকেন। দেখা যায়, মেয়েটি বোম্বাই থেকে ফিরে আসবে বলে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্টেশনে আনতে যান। তবে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেলেও সেই মেয়েটা অর্থাৎ রীনার দেখা না পাওয়া যাওয়ায় তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দু ঃষহ যন্ত্রণার সঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে –"বোম্বের মত জায়গায় এতদিনে নিশ্চয়ই আরো দু-একজন বন্ধু রীনার দেহের সান্নিধ্যে এবং মনের উত্তাপ পেয়ে চরিতার্থ হচ্ছে। তারা হয়তো বয়সে নবীন আর অগাধ অর্থবান।"[৩৫৮] অর্থাৎ এই সম্পর্কটি নিয়ে প্রিয়রঞ্জনবাবুর মনে কতখানি আবেগ তথা অভিমান জড়িয়ে ছিল তা তাঁর ভাবনার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। আসলে রীনার আসার কথা ছিল পনের তারিখ কিন্তু প্রিয়রঞ্জনবাবু ভুল করে চৌদ্দ তারিখেই স্টেশনে উপস্থিত হন। এই ভুল তার মনে নতুন আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। তিনি আবার নতুন উদ্দীপনায় নিজেকে আবিষ্ট করে রাখেন। আসলে তরুণীটির প্রতি তীব্র আসক্তি, সম্পর্কটি ঘিরে তার মনের উত্তেজনা, আকাঙ্ক্ষাই আগামীকালকে আজ করেছে। মনের গরজে যেমন দিনকে রাত করা যায়, এ যেন তেমনই। তবে পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে আগামী কাল আবার সমস্ত বাধাবিপত্তি বন্ধন, শরীরের জরাকে গোপন করে আসতে পারবেন কিনা। এই কারণেই হয়তো প্রতি মুহূর্তে আশার সঙ্গে হতাশার, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের, বাসনার সঙ্গে অনুশোচনার সর্বোপরি নিজের সঙ্গে নিজের তার সংগ্রাম চলছে। কাজেই দাম্পত্য সম্পর্কে

ঘেরাটোপের বাইরে এই সম্পর্কটি প্রিয়রঞ্জনবাবুর জীবনে যে কতখানি ক্রিয়া করেছিল তা আমরা পাঠকেরা সহজেই অনুভব করতে পারি।

এরপর **'কুমারসম্ভব'** (১৩৪৯) গল্পে যদি আমরা আসি সেখানে মানব-মানবীর সম্পর্কের আর এক রূপ পরিলক্ষিত করব। যদিও এটি একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প তবুও তারই মধ্যে সম্পর্কের যে দিকটি উঠে আসে তা বিস্মিত করে। গল্পের কাহিনী এরূপ – ধাত্রী মা সারদা বালবিধবা। একবার বসন্তরোগ আক্রমণ করে তার রূপকে শুধু কুৎসিত করেছে তা নয়, সারদার একটি চোখও তাতে বিসর্জন দিতে হয়। এই সারদার হাতেই গাঁয়ের বেশিরভাগ শিশুর জন্ম। কাজেই সকল শিশুকেই সে মাতৃস্নেহে আদর-সোহাগ করে তার অতৃপ্ত মাতৃসত্তাকে সিক্ত করতে চায়। তবে এই কুৎসিত, অন্ধ ও অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিতা মহিলাকে শিশুরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে গালাগাল দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। তাতে সারদা আহত হয়। প্রতিক্রিয়ায় মাতৃত্বলাভের এক তীব্র বাসনা তার মধ্যে জেগে ওঠে। অপরদিকে গাঁয়ের এক কামার্ত পুরুষ ব্রজবল্লভ, যার পেশা ছিল গুরুগিরি করা, ঘটনাক্রমে তার লালসার দৃষ্টি সারদার উপর পড়ে। সারদাও তার মনের বাসনা পূর্ণ করতে ব্রজবল্লভের লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তার উদ্দেশ্য সাধন হয়। সে অন্তঃসত্তা হয়ে পড়ে। এমত পরিস্থিতিতে দেখা যায়, ব্রজবল্লভ তার নিজের গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে ধাত্রী সারদার কাছে এসে উদ্‌গ্রিবতা প্রকাশ করলে সারদার চোখ প্রবল ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে। তীক্ষ্ণ একটু হেসে সে জানায় –"ইস্ ভারি যে দরদ, ঐ সময় কষ্ট মেয়েমানুষ পায়ই। আমার কষ্টের সময় কি রাঙাঠাকুর দেখতে আসবেন ?"[৩৫৯] এখানে লক্ষণীয় বিষয়, সারদার ঈর্ষান্বিত হওয়ার দিকটি। ব্রজবল্লভ সারদার কথার ইঙ্গিত উপলব্ধি করে নিজের সংসার ও সমাজের বিধি-নিষেধের বিষয়টি ভেবে সে এর থেকে নিষ্কৃতি পেতে বিহ্বল হয়ে পড়ে। প্রতিক্রিয়ায় সারদা ব্রজবল্লভের নানা যুক্তিকে খণ্ডন করে জানায় – প্রয়োজন হলে সন্তানের এক চোখ সে নিজেই অন্ধ করে দেবে যাতে সারদাই যেন তার একমাত্র অবলম্বন হয়। যাতে তাকে ছেড়ে কখনো না যেতে পারে। লক্ষণীয়, এখানে সারদার মনের এই ঈর্ষা ও আক্রোশের দিকটি। আর এ যেব্রজবল্লভকে কেন্দ্র করেই বর্ষিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সারদার মনের এই অনুভূতি তার ওব্রজবল্লভের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে ভিত্তি করেই যে জন্ম নিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। গল্পে এই যে একজন নারীর বিশেষ একটি বাসনা ও আর একজন পুরুষের বিকৃত মানসিকতার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং একটা সময় মনেও সঞ্চারিত হয় তা

হয়তো সমাজ স্বীকৃতি দেয় না। তবে, সমাজ-সংসারে আবদ্ধ এমন বহু মানুষের জীবনেই এরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামাজিক পরিভাষায় এই পরকীয়া তথা অলিখিত সম্পর্কের বহু ইতিহাসই চাপা পড়ে থাকলেও এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার কোনও পথ থাকে না। জীবন এমনই। সেই জীবনেরই আর এক বাস্তব রূপ আলোচ্য গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

পাশাপাশি **'উল্টোরথ'** (১৩৫২) গল্পে নর-নারীর সম্পর্কের আর একটি রূপ আমরা খুঁজে পাই। বিবাহিত প্রিয়লাল কর্মসূত্রে কলকাতা শহরে এসে এক দরিদ্র বন্ধুর বাড়িতে টাকার বিনিময়ে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। সেই সূত্রেই বন্ধুর অবিবাহিত বোন সুবর্ণ-এর সঙ্গে তার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে সেই সম্পর্কে সবসময় যেন এক আলো-আঁধারের খেলা চলতে থাকে। কখনো আকর্ষণ কখনো বিকর্ষণ, কখনো চরম আঘাত, কখনো বা দুর্বার টান সেখানে ক্রিয়াশীল। এর কারণ হিসাবে বলা যায় – প্রিয়লাল ও সুবর্ণ দু'জনেই হয়তো জানে তাদের এই সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ককে কখনোই স্বাভাবিক পরিণতি দেওয়া সম্ভব নয়। আর তাই হয়তো তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের অধিকারী সুবর্ণের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে –"মানুষকে চিনতে তার আর বাকি নেই। 'আ তু' বললে তারা ঘাড়ের উপর চড়ে বসে। ফেরার সময় ঘাড়ে করে তারা নিয়ে যায় না, উল্টে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যায়।"[৩৬০] তবে এও দেখা যায়, প্রিয়লাল যখন সুবর্ণর মায়ের অনুপস্থিতিতে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে সুবর্ণর সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে তখন সুবর্ণ আরক্ত হয়ে ওঠে, আপ্লুত হয় কিন্তু পরক্ষণেই সে এর তীব্র প্রতিবাদ করে। এমন টানপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের সম্পক যখন চলতে থাকে প্রিয়লালই তখন চরিত্রে দোষ আছে জেনেও তার এক বন্ধুর সঙ্গে বিনা পণে সুবর্ণর বিয়ের বন্দোবস্ত করে। আসলে প্রিয়লালের পক্ষে যেহেতু সুবর্ণকে বিয়ে করে সুখী হওয়া সম্ভব নয় তাই সে সুবর্ণকেও সুখী হতে দিতে চায় না। এই কারণেই তার এমন নিষ্ঠুর আঘাত। মনস্তত্ত্বের এক নিগূঢ় দিক এখানে উন্মোচিত। অপরদিকে বিয়ের বছর দেড়েক পরে অন্তঃসত্ত্বা সুবর্ণ বহু অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করে মায়ের কাছে ফিরে এসে প্রিয়লালকে দেখাতে চায় সে কতখানি সুখী। শুধু তাই নয়, সে এবার কথার জালে অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত দিয়ে প্রিয়লালের মধ্যে ঈর্ষা সঞ্চারিত করতে চায়। এ ছিল প্রিয়লালের প্রতি তারই দেওয়া আঘাতের সুবর্ণর প্রত্যাঘাত। ভালোবাসার সম্পর্কে শুধুমাত্র প্রেম-প্রীতিই থাকে তা নয়, পরস্পরের প্রতি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই সেই ভালোবাসা কখনো কখনো প্রকাশিত হয়, এই দিকটিই আলোচ্য গল্পে প্রস্ফুটিত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে গল্পের দু'জন নারী-পুরুষের সম্পর্ক রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

আবার **'দোলা'** (১৩৬৫) গল্পে মানব সম্পর্কের ভিন্ন এক রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এখানে দেখা যায় – কাহিনীর কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র শান্তির বাবা মারা গেলে সমাজের কলুষদৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে ও আর্থিক দিক দিয়ে পাশে দাঁড়াতে এই পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল কাহিনীর প্রধান পুরুষ চরিত্র অতুল। এই অতুল একসময়ে শান্তির বাবার আশ্রয়ে ছিল, শুধু তাই নয়, বেকার জীবনে সে তার কাছ থেকে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্যও পেয়েছিল। কাজেই মানবিকতার একটা জায়গা থেকেই সে এই দরিদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়। আর এই আশ্রয়কে চিরস্থায়ী করতে শান্তিকে ভালোবেসে সে বিয়ে করে। পারিবারিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে শান্তির কাছে তখন অতুলই সর্বেসর্বা ছিল। কিন্তু আমরা জানি পরিস্থিতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও রূপান্তর ঘটে। তাই দেখা যায় অতুলের অর্থ, যশ বৃদ্ধি পেলে শান্তির চোখে অতুলের বয়সের দোষ ত্রুটিগুলি বড় হয়ে ওঠে। ফলে সে একসময় অতুলের অ্যাসিস্টেন্ট-এর সঙ্গে পালিয়ে যায়। দেখা যায় এই ঘটনার পর শান্তির মা তার বড় মেয়ের জায়গা পূরণ করবার আবদার অন্য মেয়েদের কাছে করলে তারা বিষয়টি থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়। অতুলের অনুপস্থিতিতে তারা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে থাকলেও অতুলকে দেখলেই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে। এই অতুল চরিত্রটিকে একদিকে তার বিপর্যস্ত দাম্পত্য জীবন বেদনাগ্রস্ত করে রাখে, অপরদিকে তার শান্তির প্রতি মা ও বোনেদের এমন আতঙ্ক, কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতির দিকটিও তাকে ভীষণভাবে আহত করে। শান্তির মা-বোনেদের সঙ্গে অতুলের এক ভিন্ন সম্পর্ক রচিত হয়। মানবিকতার খাতিরে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা অতুলের পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমন সেই সম্পর্কের অস্তিত্ব হৃদয়-যন্ত্রণায় তাকে ক্রমাগত বিদ্ধ করে চলে। সেই যন্ত্রণা শুধু তারই হৃদয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, আমাদের পাঠক চিত্তেও সঞ্চারিত হয়।

'একটি ফুলকে ঘিরে' (১৩৬৮) গল্পে আপাত দৃষ্টিতে মা ও মেয়ের মধ্যেকার এক দ্বন্দ্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বলে মনে হলেও আসলে এখানে অসম বয়সী দু'জন মানুষকে ঘিরে ভিন্ন এক সম্পর্কের সমীকরণ রচিত হয়েছে। কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছেন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিত্ব এবং তার এক প্রান্তে মা অপর প্রান্তে মেয়ে রিনি। মায়ের পুরুষ বন্ধু জিতেশবাবুকে রিনি পছন্দ করে না। মায়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা রিনির কাছে দুঃষহ হয়ে ওঠে। কাজেই এই বন্ধুকে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে রিনির মনে এক দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত কাজ করে চলে। তবে ঘটনাক্রমে এই জিতেশবাবু রিনিকে একটি রক্তগোলাপ উপহার দিলে জিতেশবাবুর এতদিনের আচার-আচরণের সাপেক্ষে

রিনি আবিষ্কার করে যে তার মা উপলক্ষ মাত্র, আসলে সে-ই জিতেশবাবুর মূল লক্ষ। এই আবিষ্কার তথা অনুধাবনের দিকটি রিনির মনে জয়ের আনন্দ বয়ে আনে। তার মনে হয় সে একদিন যেমন আদরে, সোহাগে, সেবায়, শুশ্রূষায় বাবাকে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তেমন আজও সে অনাগ্রহ, বিতৃষ্ণা, বিরূপতার মধ্য দিয়ে মা-এর একমাত্র বন্ধুকেও জয় করতে সক্ষম হয়। তবে মা-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করতে গিয়ে রিনি এক অসম বয়সী মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বার বিষয়কে সচেতনভাবেই গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব, সংশয়ও তার মধ্যে কাজ করতে থাকে। এই সম্পর্কের পরিণতি কী তা প্রশ্ন যোগ্য বিষয়। তবে এই সম্পর্কগুলি যে আমাদের চেনা গণ্ডীর চেনা মানুষের জীবনেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'মিসেস রায়'** (১৩৭১) গল্পটিকে মানব-মানবীর সম্পর্কের এক অন্য ধারার গল্প হিসাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই গল্পটিকে 'একটি ফুলকে ঘিরে' গল্পের 'ওপিঠ' বলেই ধরে নেওয়া যায়। মধ্যবয়স্ক একজন স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা কর্মসূত্রে কিংবা বিভিন্ন সূত্রেই নানা পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে তার এমন বন্ধুত্ব, সাহচর্যের বিষয়টিকে স্বাভাবিক সমাজ তীর্যক দৃষ্টিতেই দেখে। এক সময় এই গতানুগতিক জীবনও তার কাছে একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তাই তিনি এর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। যদিও এই সরে আসার মূলে আর এক প্রধান কারণ হল – তার যুবতী মেয়েও নিজের অগোচরে ঐ মহিলা অর্থাৎ মিসেস রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। সকল পুরুষের দৃষ্টি তাকে এড়িয়ে তার মেয়ের প্রতি-ই পড়ে। সে যাই হোক না কেন, ঘটনাক্রমে এই মেয়ে বিয়ে করে বিদেশে চলে গেলে একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা মিসেস রায়কে গ্রাস করে। এই পরিস্থিতিতে মেয়ের এক বন্ধু ফোন করলে তার সঙ্গে তিনি আন্তরিক হয়ে ওঠেন। একটি সম্পর্কের বাতাবরণ তৈরী হতে থাকে। তবে পরক্ষণেই এক বিবেকবোধ মিসেস রায়কে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। সেই সম্পর্কটি স্থাপিত হয়েছিল কিনা তার ইঙ্গিত গল্পে না থাকলেও এই যে মেয়ের বয়সী একজন পুরুষকে ঘিরে সম্পর্ক গড়ে তুলবার বিষয়টি মিসেস রায়ের মনে ক্রিয়া করে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার কোন উপায় মিসেস রায়ের কাছে নেই। মনের কামনা-বাসনা, আসক্তি আলোড়িত হতে থাকে।

এইভাবেই মানব-জীবনের নানা পর্বে বিভিন্ন লিখিত অলিখিত অবৈধ কিংবা বৈধ

সম্পর্কগুলি এসে ভিড় করে। এদের সামগ্রিকতাকে নিয়েই একটি জীবন পূর্ণতা লাভ করে। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মর্মভেদী দৃষ্টিতে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে, তা তিনি যেভাবে তাঁর বিভিন্ন গল্পগুলিতে প্রতিফলিত করেছেন সেগুলি সম্পর্কতত্ত্বের নতুন নতুন দিককে উন্মোচিত করে আমাদের এই বাস্তব জীবনকে নতুনভাবে জানতে, বুঝতে সাহায্য করে।

উল্লেখপঞ্জী

১। যৌথ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৪
২। ঐ, পৃ: ১৭
৩। ঐ, পৃ: ১৭
৪। ঐ, পৃ: ১৫
৫। ঐ, পৃ: ১৫
৬। ঐ, পৃ: ১৫
৭। ঐ, পৃ: ১৫
৮। ঐ, পৃ: ১৮
৯। শম্বুক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৪
১০। ঐ, পৃ: ১৪
১১। ঐ, পৃ: ১৩
১২। ঐ, পৃ: ১৪
১৩। ঐ, পৃ: ১৪
১৪। ঐ, পৃ: ১৪
১৫। ঐ, পৃ: ১৫
১৬। ঐ, পৃ: ১৬
১৭। ঐ, পৃ: ১৭
১৮। ঐ, পৃ: ১৭
১৯। প্রতিদ্বন্দ্বী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ১৯
২০। ঐ, পৃ: ১৮
২১। ঐ, পৃ: ১৮
২২। ঐ, পৃ: ১৮
২৩। ঐ, পৃ: ১৮
২৪। ঐ, পৃ: ১৯
২৫। ঐ, পৃ: ১৯
২৬। ঐ, পৃ: ২০
২৭। ঐ, পৃ: ২০
২৮। ঐ, পৃ: ২১
২৯। ঐ, পৃ: ২১
৩০। ঐ, পৃ: ২২
৩১। ঐ, পৃ: ২২-২৩
৩২। মদনভস্ম, গল্পমালা - ৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ২৭
৩৩। ঐ, পৃ: ৩০
৩৪। ঐ, পৃ: ৩১
৩৫। ঐ, পৃ: ৩১
৩৬। রোগ, গল্পমালা - ৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৯
৩৭। ঐ, পৃ: ২০
৩৮। ঐ, পৃ: ২০

৩৯। ঐ, পৃঃ ২১
৪০। ঐ, পৃঃ ২১
৪১। ঐ, পৃঃ ২২
৪২। ঐ, পৃঃ ২৩
৪৩। ঐ, পৃঃ ২৩
৪৪। ঐ, পৃঃ ২৩
৪৫। চোর, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ নং- ২৯
৪৬। ঐ, পৃঃ ২৯
৪৭। ঐ, পৃঃ ২৯
৪৮। ঐ, পৃঃ ২৯
৪৯। ঐ, পৃঃ ২৯
৫০। ঐ, পৃঃ ৩০
৫১। ঐ, পৃঃ ৩০-৩১
৫২। ঐ, পৃঃ ৩১
৫৩। ঐ, পৃঃ ৩৪
৫৪। ঐ, পৃঃ ৩৪
৫৫। ঐ, পৃঃ ৩৪
৫৬। স্বখাত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা - ২৭
৫৭। ঐ, পৃঃ ২৫
৫৮। ঐ, পৃঃ ২৬
৫৯। ঐ, পৃঃ ২৬
৬০। ঐ, পৃঃ ২৬
৬১। ঐ, পৃঃ ২৭
৬২। ঐ, পৃঃ ২৭
৬৩। ঐ, পৃঃ ২৭
৬৪। ঐ, পৃঃ ২৯
৬৫। ঐ, পৃঃ ২৯
৬৬। ঐ, পৃঃ ২৮
৬৭। সেতার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র - গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ ৪৫
৬৮। ঐ, পৃঃ ৪৫
৬৯। ঐ, পৃঃ ৪৬
৭০। ঐ, পৃঃ ৪৬
৭১। ঐ, পৃঃ ৪৬
৭২। ঐ, পৃঃ ৪৫
৭৩। ঐ, পৃঃ ৪৯
৭৪। ঐ, পৃঃ ৫১
৭৫। ঐ, পৃঃ ৫১
৭৬। পুনশ্চ, গল্পামালা-২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ২০
৭৭। ঐ, পৃঃ ২০
৭৮। ঐ, পৃঃ ২০
৭৯। ঐ, পৃঃ ২০
৮০। ঐ, পৃঃ ২১
৮১। ঐ, পৃঃ ২১
৮২। ঐ, পৃঃ ২১
৮৩। ঐ, পৃঃ ২২-২৩
৮৪। ঐ, পৃঃ ২৩
৮৫। ঐ, পৃঃ ২৪
৮৬। ঐ, পৃঃ ২৫
৮৭। কুলপী বরফ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ২৬
৮৮। ঐ, পৃঃ ২৮
৮৯। ঐ, পৃঃ ২৯

৯০। ঐ, পৃঃ ২৯
৯১। ঐ, পৃঃ ৩০
৯২। ঐ, পৃঃ ৩০
৯৩। ঐ, পৃঃ ৩১
৯৪। ঐ, পৃঃ ৩১
৯৫। ঐ, পৃঃ ৩২-৩৩
৯৬। ঐ, পৃঃ ৩৩
৯৭। ঐ, পৃঃ ৩৩
৯৮। চোরাবালি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৩২
৯৯। ঐ, পৃঃ ৩২
১০০। ঐ, পৃঃ ৩২
১০১। ঐ, পৃঃ ৩৩
১০২। ঐ, পৃঃ ৩৩
১০৩। ঐ, পৃঃ ৩৩
১০৪। ঐ, পৃঃ ৩৪
১০৫। ঐ, পৃঃ ৩৪
১০৬। ঐ, পৃঃ ৩৭
১০৭। দ্বিরাগমণ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৩৬
১০৮। ঐ, পৃঃ ৩৬
১০৯। ঐ, পৃঃ ৩৬
১১০। ঐ, পৃঃ ৩৬
১১১। ঐ, পৃঃ ৩৬
১১২। ঐ, পৃঃ ৩৬
১১৩। ঐ, পৃঃ ৩৫
১১৪। ঐ, পৃঃ ৩৫
১১৫। ঐ, পৃঃ ৩৫
১১৬। ঐ, পৃঃ ৩৭
১১৭। ঐ, পৃঃ ৩৯
১১৮। ঐ, পৃঃ ৩৯
১১৯। ঐ, পৃঃ ৩৯
১২০। ঐ, পৃঃ ৪০
১২১। ঐ, পৃঃ ৩৭
১২২। ঐ, পৃঃ ৪০
১২৩। ঐ, পৃঃ ৪০
১২৪। আতসকর, গল্পমালা - ৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ২৭
১২৫। ঐ, পৃঃ ২৭
১২৬। ঐ, পৃঃ ২৯
১২৭। ঐ, পৃঃ ৩০
১২৮। ঐ, পৃঃ ৩০
১২৯। ঐ, পৃঃ ৩১
১৩০। ঐ, পৃঃ ৩১
১৩১। ঐ, পৃঃ ৩২
১৩২। ঐ, পৃঃ ৩২-৩৩
১৩৩। চাঁদ মিঞা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৩৬
১৩৪। ঐ, পৃঃ ১৩৪
১৩৫। ঐ, পৃঃ ৩৯
১৩৬। ঐ, পৃঃ ৩৯
১৩৭। ঐ, পৃঃ ৩৯
১৩৮। ঐ, পৃঃ ৩৯
১৩৯। ঐ, পৃঃ ৪০
১৪০। ঐ, পৃঃ ৪০-৪১

১৪১। শুভদৃষ্টি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ,৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৬৪
১৪২। ঐ, পৃঃ ৬৪
১৪৩। ঐ, পৃঃ ৬৩
১৪৪। ঐ, পৃঃ ৬৩
১৪৫। ঐ, পৃঃ ৬৫
১৪৬। ঐ, পৃঃ ৬৫
১৪৭। একূল-ওকূল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৭৪
১৪৮। ঐ, পৃঃ ৭৪
১৪৯। ঐ, পৃঃ ৭৫
১৫০। ঐ, পৃঃ ৭৯
১৫১। ঐ, পৃঃ ৭৮
১৫২। ঐ, পৃঃ ৭৭
১৫৩। ঐ, পৃঃ ৭৭
১৫৪। ঐ, পৃঃ ৭৭
১৫৫। রস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৬৯
১৫৬। ঐ, পৃঃ ৭০
১৫৭। ঐ, পৃঃ ৭৭
১৫৮। ঐ, পৃঃ ৭৭
১৫৯। জৈব, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৫০
১৬০। ঐ, পৃঃ ৫২
১৬১। ঐ, পৃঃ ৫২
১৬২। ঐ, পৃঃ ৫২
১৬৩। ঐ, পৃঃ ৫৪
১৬৪। ঐ, পৃঃ ৫৪
১৬৫। ঐ, পৃঃ ৫৫
১৬৬। ঐ, পৃঃ ৪৮
১৬৭। ঐ, পৃঃ ৫৭
১৬৮। অবতরণিকা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১২৫
১৬৯। ঐ, পৃঃ ১২৫
১৭০। ঐ, পৃঃ ১২৫
১৭১। ঐ, পৃঃ ১৩২-১৩৩
১৭২। ঐ, পৃঃ ১৩৩
১৭৩। ঐ, পৃঃ ১৩৮
১৭৪। ঐ, পৃঃ ১৩৮
১৭৫। ঐ, পৃঃ ১৩৯
১৭৬। ঐ, পৃঃ ১৩৯
১৭৭। শাল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯ থেকে পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৮৪
১৭৮। ঐ, পৃঃ ৮৫
১৭৯। ঐ, পৃঃ ৮৫
১৮০। ঐ, পৃঃ ৮৫-৮৬
১৮১। হেডমিস্ট্রেস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১০৬
১৮২। ঐ, পৃঃ ১০৭
১৮৩। ঐ, পৃঃ ১০৭
১৮৪। দাম্পত্য, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৪৭
১৮৫। ঐ, পৃঃ ১৫১
১৮৬। ঐ, পৃঃ ১৪৮
১৮৭। ঐ, পৃঃ ১৫২
১৮৮। ঐ, পৃঃ ১৫১

১৮৯। ঐ, পৃ: ১৫৬
১৯০। ঐ, পৃ: ১৫৭
১৯১। অপঘাত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৫৯
১৯২। ঐ, পৃ: ১৬০
১৯৩। ঐ, পৃ: ১৬১
১৯৪। ঐ, পৃ: ১৬১
১৯৫। ঐ, পৃ: ১৬১
১৯৬। এক পো দুধ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৬৫
১৯৭। ঐ, পৃ: ২৬৫
১৯৮। ঐ, পৃ: ২৬৭
১৯৯। ঐ, পৃ: ২৬৭
২০০। ঐ, পৃ: ২৬৬-২৬৭
২০১। ঐ, পৃ: ২৬৮
২০২। ঐ, পৃ: ২৬৮
২০৩। ঐ, পৃ: ২৬৮
২০৪। ঐ, পৃ: ২৭০
২০৫। বিলম্বিত লয়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৮৫
২০৬। ঐ, পৃ: ১৮৫
২০৭। ঐ, পৃ: ২০৭
২০৮। ঐ, পৃ: ১৮৮
২০৯। ঐ, পৃ: ১৮৮
২১০। ঐ, পৃ: ১৯০
২১১। ঐ, পৃ: ২০৮
২১২। ঐ, পৃ: ২০৮
২১৩। চিহ্ন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-৫, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১১৯
২১৪। ঐ, পৃ: ১১৯
২১৫। ঐ, পৃ: ১১৯
২১৬। কন্যা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, অষ্টম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৩৫৬
২১৭। ঐ, পৃ: ৩৫৪
২১৮। ঐ, পৃ: ৩৫৩
২১৯। ছাত্রী, নন্দ্রেনাথ মিত্র, গল্পমালা - ২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৮৬
২২০। ঐ, পৃ: ১৮৭
২২১। ঐ, পৃ: ১৮৭
২২২। ঐ, পৃ: ১৮৭
২২৩। ঐ, পৃ: ১৮৭
২২৪। ঐ, পৃ: ১৮৭
২২৫। সুহাসিনী তরল আলতা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৪১
২২৬। ঐ, পৃ: ২৪১
২২৭। ঐ, পৃ: ২৪৩
২২৮। অঙ্গীকার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৪৭
২২৯। ঐ, পৃ: ২৪৮
২৩০। ঐ, পৃ: ২৫০
২৩১। ঐ, পৃ: ২৪৯
২৩২। ঐ, পৃ: ২৪৯
২৩৩। ঐ, পৃ: ২৪৯
২৩৪। ঐ, পৃ: ২৫০
২৩৫। ঐ, পৃ: ২৫৭
২৩৬। ঐ, পৃ: ২৫৯

২৩৭। ঐ, পৃ: ২৫৯
২৩৮। ঐ, পৃ: ২৬০
২৩৯। মর্যাদা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২১১
২৪০। ঐ, পৃ: ২১২
২৪১। ঐ, পৃ: ২০৯
২৪২। ঐ, পৃ: ২১৩
২৪৩। ঐ, পৃ: ২১৪
২৪৪। পাদপীঠ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা -৭, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৯৮
২৪৫। ঐ, পৃ: ১০০
২৪৬। ঐ, পৃ: ১০২
২৪৭। ঐ, পৃ: ১০৩
২৪৮। ঐ, পৃ: ১০৩
২৪৯। ঐ, পৃ: ১০৩
২৫০। ঐ, পৃ: ২৫০
২৫১। ঐ, পৃ: ১০৪
২৫২। ঐ, পৃ: ১০৪
২৫৩। স্বত্ত্ব, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৬৯
২৫৪। ঐ, পৃ: ২৭০
২৫৫। ঐ, পৃ: ২৭৬
২৫৬। ঐ, পৃ: ২৭৬
২৫৭। ঐ, পৃ: ২৭৬
২৫৮। সুধা হালদার ও সম্প্রদায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৩০৪
২৫৯। দম্পতি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৫, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৭৩
২৬০। ঐ, পৃ: ১৭৩
২৬১। ঐ, পৃ: ১৭৩
২৬২। ঐ, পৃ: ১৭৫
২৬৩। ঐ, পৃ: ১৭৫
২৬৪। ঐ, পৃ: ১৭৫
২৬৫। ঐ, পৃ: ১৭৬
২৬৬। ঐ, পৃ: ১৭৮
২৬৭। ঐ, পৃ: ১৭৯
২৬৮। ঐ, পৃ: ১৭৯
২৬৯। ঐ, পৃ: ১৭৯
২৭০। ঐ, পৃ: ১৮০
২৭১। ঐ, পৃ: ১৮০
২৭২। ঐ, পৃ: ১৮১
২৭৩। ঐ, পৃ: ১৮১
২৭৪। ঐ, পৃ: ১৮২
২৭৫। ঐ, পৃ: ১৮২
২৭৬। বিবাহ বার্ষিকী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৫, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৮৮
২৭৭। ঐ, পৃ: ১৮৮
২৭৮। ঐ, পৃ: ১৮৯
২৭৯। ঐ, পৃ: ১৯০
২৮০। ঐ, পৃ: ১৯৩
২৮১। ঐ, পৃ: ১৯৪
২৮২। ঐ, পৃ: ১৯৪
২৮৩। ঐ, পৃ: ১৯৫
২৮৪। ঐ, পৃ: ১৯৫
২৮৫। আঠারো আনা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৫, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২১৫

২৮৬। ঐ, পৃ: ২১৬
২৮৭। ঐ, পৃ: ২১৩
২৮৮। ঐ, পৃ: ২১৩
২৮৯। ঐ, পৃ: ২১৮
২৯০। ঐ, পৃ: ২১৮
২৯১। ঐ, পৃ: ২১৮
২৯২। ঘাম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৪৮০-৪৮১
২৯৩। ঐ, পৃ: ৪৭৯
২৯৪। ঐ, পৃ: ৪৮৬
২৯৫। সুখ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৫, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৩৫২
২৯৬। ঐ, পৃ: ৩৫২
২৯৭। ঐ, পৃ: ৩৫২-৩৫৩
২৯৮। ঐ, পৃ: ৩৫৩
২৯৯। ঐ, পৃ: ৩৫৩
৩০০। ফিরে দেখা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৭৭
৩০১। ফেরিওয়ালা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৭, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৪১১
৩০২। মালঞ্চ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৮৯
৩০৩। ঐ, পৃ: ৯১
৩০৪। ঐ, পৃ: ৯৩
৩০৫। ঐ, পৃ: ৯৩
৩০৬। ক্রোড়পত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৬২
৩০৭। ঐ, পৃ: ৬৫
৩০৮। ঐ, পৃ: ৬৬
৩০৯। চেক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৯৭
৩১০। অসবর্ণা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ২০৪-২০৫
৩১১। টর্চ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৮৭
৩১২। ঐ, পৃ: ৯২
৩১৩। ঐ, পৃ: ৯২
৩১৪। ঐ, পৃ: ৯৪
৩১৫। ঐ, পৃ: ৯৫
৩১৬। অমনোনীতা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৮৫
৩১৭। শুল্ক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১০৮
৩১৮। ঐ, পৃ: ১১১
৩১৯। দীপান্বিতা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ১৭৭
৩২০। দয়িতা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৮৪
৩২১। ঐ, পৃ: ১০০
৩২২। ছদ্মনাম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং-২২৭
৩২৩। ঐ, পৃ: ২২৭

৩২৪। সুপুরুষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা- ২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৩৮
৩২৫। ঐ, পৃ: ২৩৭
৩২৬। ঐ, পৃ: ২৩৭
৩২৭। ঐ, পৃ: ২৩৯
৩২৮। ঐ, পৃ: ২৪০
৩২৯। বসন্ত পঞ্চম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৩৭
৩৩০। ঐ, পৃ: ২৩৭
৩৩১। ঐ, পৃ: ২৩৮
৩৩২। স্মৃতিগন্ধ, নরেন্দরনাথ মিত্র, গল্পমালা-৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৫৩
৩৩৩। ঐ, পৃ: ১৫৩
৩৩৪। পত্রবিলাস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ৩৫০
৩৩৫। ঐ, পৃ: ৩৫৬
৩৩৬। পূর্বতনী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৫, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২০১-২০২
৩৩৭। ঐ, পৃ: ২০৩
৩৩৮। স্বরসন্ধি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২০২
৩৩৯। একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৪৮৬
৩৪০। ঐ, পৃ: ৪৯০
৩৪১। ঐ, পৃ: ৪৮৯
৩৪২। ঐ, পৃ: ৪৯৩
৩৪৩। অভিসার, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: – ৫২০
৩৪৪। ঐ, পৃ: ৫২১
৩৪৫। ঐ, পৃ: ৫২৩
৩৪৬। ঐ, পৃ: ৫২১
৩৪৭। ঐ, পৃ: ৫২৬
৩৪৮। চাকরি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ২১৫
৩৪৯। ঐ, পৃ: ২১৫
৩৫০। ঐ, পৃ: ২১৫
৩৫১। ঐ, পৃ: ২৩০
৩৫২। মহাশ্বেতা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র - গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ১৯
৩৫৩। ঐ, পৃ: ২৩
৩৫৪। ঐ, পৃ: ২৩
৩৫৫। পুনর্ভবা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৪৭
৩৫৬। ঐ, পৃ: ১৪০-১৪১
৩৫৭। অপরাহ্ন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৭২
৩৫৮। আগামীকাল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯২, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৩১২
৩৫৯। কুমারসম্ভব, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৪, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২০
৩৬০। উল্টোরথ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা -৭, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৩৬